সন্দেশ শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা

বইমেলা ১৪২০

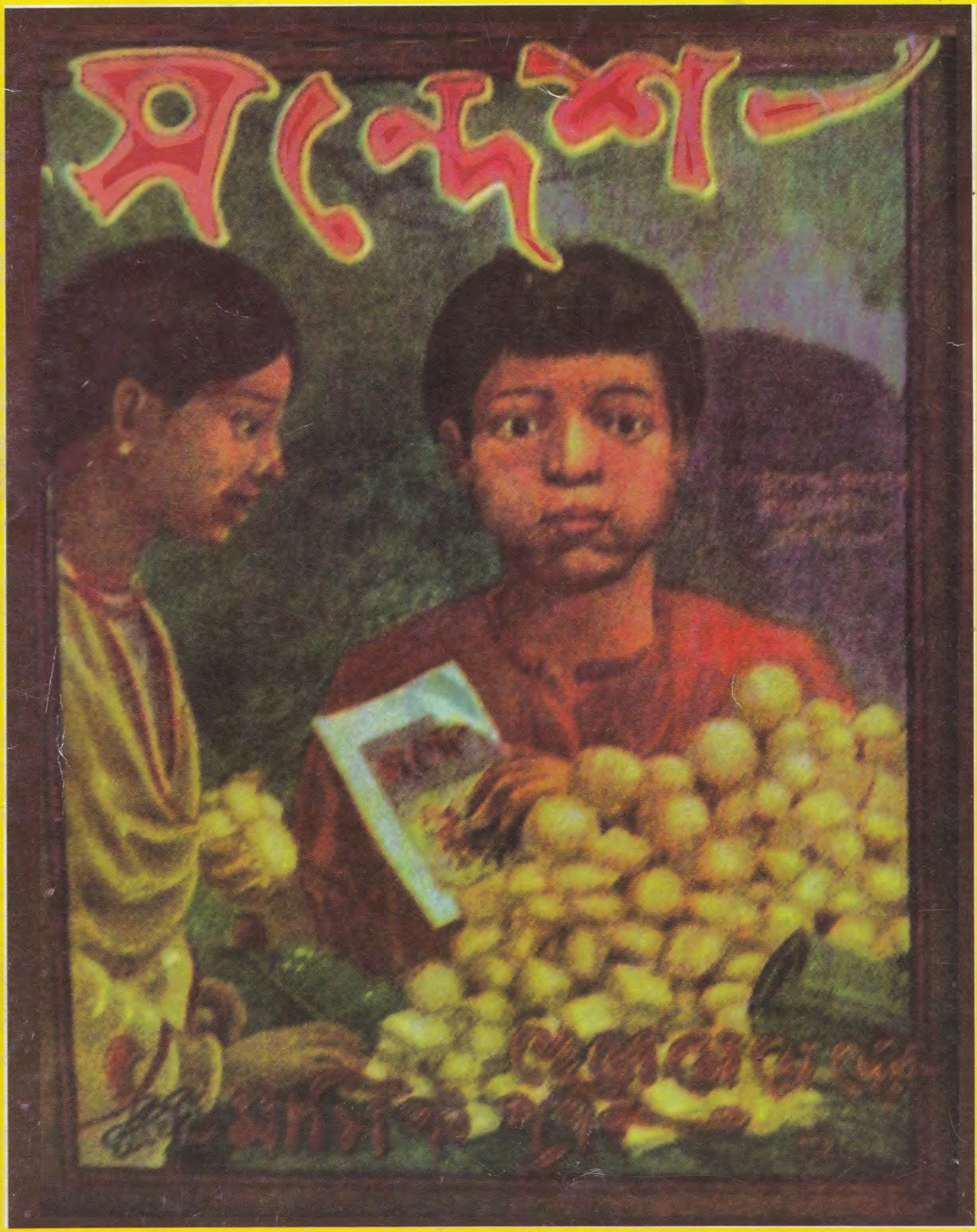

সম্পাদক সন্দীপ রায়

DSR

বইয়ের দুনিয়া

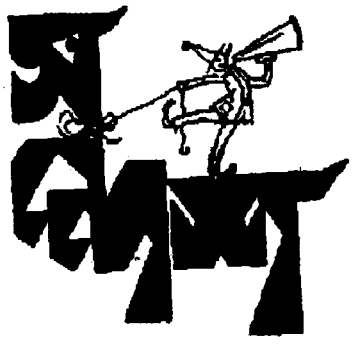

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৫৩
নভেম্বর-২০১৩-ফেব্রুয়ারি২০১৪ ● কার্তিক-মাঘ ১৪২০

সম্পাদকীয়

সন্দেশের কথা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩
সম্পাদকের চিঠি ৫২

গল্প

হাবুর বাবুগিরি/ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭
বেহদ্দ বোকা/শ্রীকুলদারঞ্জন রায় ১০
ভবম হাজাম/কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১২
সয়তানীর সাজা/শ্রীসুবিনয় রায় ১৫
পণ্ডিত বিদায়/ শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ১৮
ঠেকে শেখা/শ্রীসুবিমল রায় ২৫
খুকীর নাম/শ্রীবুদ্ধদেব বসু ২৭
পেঁচা কেন নিশাচর/শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ৩১
ঠিক দুপুর বেলা/শ্রীসুকুমার দে সরকার ৩৫
ষর্ণশের্ণ/শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮
বনের খবর/শ্রীপ্রমদারঞ্জন রায় ৪০
ময়ূরপঙ্খী/শ্রীবন্দেআলী মিয়া ৪৩
এপ্রিল—পয়লা ও দোসরা/শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ৪৮
লাগাও লাঠি/শ্রী সুধাবিন্দু বিশ্বাস ৫৩
দ্রিঘাংচু/শ্রী সুকুমার রায় ৫৯
মিষ্টি মুখ/ শ্রীসমর দে ৬২
হরু হরকরার এক গুঁয়েমি/লীলা মজুমদার ৭০
লালু আর নীলু/পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৭৫
সুজন হরবোলা/ সত্যজিৎ রায় ৭৭
বড়মামার দাঁত/সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৮৯
খুদে ডাকাত/মহাশ্বেতা দেবী ৯৬
ভৌত চশমা/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১০০
নাম রহস্য/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৪
মেহবুব টেলার্স ক্যালকাটা নাইন/ নবনীতা দেবসেন ১০৮
ইষ্টকুটুম/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১১৬
নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘ/নলিনী দাশ ১২১
বেটুদার ফেয়ারওয়েল/অজেয় রায় ১২৭
দাগী/শিশিরকুমার মজুমদার ১৩৪
সহাবস্থান/ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪২
ছত্রবর্ধন/তারাপদ রায় ১৫০
ক্যাপ্টেন মুকুন্দরাম/শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ১৫৭

কবিতা

কবিতা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪
ফের এলো/ সুনির্মল বসু ৬
প্রভাতী/ হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম ৯
আষাঢ়ে ছড়া/শ্রী প্রমথ চৌধুরী ১৪
সুখের চাকুরী/উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২২

বর্ণপরিচয়/শ্রী যোগীন্দ্রনাথ সরকার ২৬
ঝড়ের ছড়া/শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৩
বাতাসের গান/শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন ৫৮
ইডেনে মুস্তাক/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬৯
নির্ভীক/শঙ্খ ঘোষ ৭৬
বিচিত্র যান/অন্নদাশঙ্কর রায় ৮৮

প্রবন্ধ

জেনি মেমসাহেব নয়/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১১২
ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি/বিজয়া রায় ১১৪

নাটক

পেটুক ভজা/ শ্রীঅখিল নিয়োগী ২৩

ভ্রমণ

কপিলাশ/শ্রী সুখলতা রাও ৬৬

প্রচ্ছদ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছবি এঁকেছেন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সুকুমার দে সরকার, যতীন সাহা,
সত্যজিৎ রায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, সমীর দাশ, দেবাশীষ দেব

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

সহ-সম্পাদক
প্রণব মুখোপাধ্যায়

সন্দেশ কার্যালয়- ১৭২/৩ রাসবিহারি অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯ থেকে
সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন - ৯৮৩৬২৫০৮২৯
শ্রী সমীর রায়, নীলাঞ্জনা এন্টারপ্রাইজ কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত
সত্ত্বাধিকারী-সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

এই সংখ্যাটিতে মূল লেখার অলঙ্করণ এবং বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

সন্দেশের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

একটি বাঙ্গালিবাবু এলাহাবাদে ডাক্তারি করিতেন; তাঁহার একটি খোট্টা চাকর ছিল। চাকরটি সবে পাড়া-গাঁ হইতে আসিয়াছে, সহরের চালচলন এখনও ভাল করিয়া শিখে নাই, আর বাঙ্গালির রীতিনীতি কিছুই জানে না।

বাবু তাহাকে বলিলেন, "দেখ, দু, আনার সন্দেশ কিনিয়া আন ত।" চাকরটি দু আনার পয়সা লইয়া সন্দেশ কিনিতে বাহির হইল, আর ভাবিল সে কি বিপদেই পড়িয়াছে। "সন্দেশ" বলিতে তাহার দেশের লোক বুঝে সংবাদ; সে জিনিস যে আবার কি করিয়া পয়সা দিয়া কিনিতে পারা যায়, আর গেলেও, তাহা যে কোথায় মিলে, তাহা সে কোনো মতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। কাজেই বেচারা আর কি করে? সে পয়সা কটি হাতে লইয়া পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। যে আসে তাহাকেই বিনয় করিয়া বলে, "এ ভাইয়া! দো আনাকা সন্দেশ কাঁহা মিলি?"

এ কথা যে শোনে সেই হাসে। শেষে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে 'সন্দেশ' বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা নয়; বাঙ্গালিবাবুরা এক রকমের লাড্ডু খায়, তাহারই নাম 'সন্দেশ'। ময়রার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

তখন সে ভারি খুসী হইয়া ময়রার দোকান হইতে সন্দেশ কিনিয়া আনিল, আর মনে করিল খুব একটা কাজ করিয়াছে।

চাকর বেচারা লাড্ডুকে খবর ভাবিয়া ভাবনায় পড়িয়াছিল আমরাও যদি লাড্ডু বলিতে খবর বুঝিয়া লই, তাহাতে কাজের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু খবরকে যদি লাড্ডু মনে করা যায় তবে সেটা বোধহয় তেমন দোষের কথা হয় না।

লাড্ডু খাইবার জিনিস। সে জিনিস ভাল হইলে মিষ্টও লাগে, বলও বাড়ে; ভাল বস্তু খাইয়া যেমন শরীরে বল হয়, তেমনি ভাল কথা জানিয়া মনে বল হয়; উহাই মনের আহার। তাহা যদি মিষ্ট হয়, তবে তাহাকে মনের লাড্ডু বলিতে দোষ কি?

'সন্দেশ' বলিলেই যে আমরা সকলের আগে একটা খাইবার জিনিসের কথা ভাবি সে আমাদের অভ্যাসের দোষ। ঐ শব্দের আসল অর্থ যে 'সংবাদ' সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'সংবাদে'র অর্থ বদলাইয়া 'মিঠাই' হওয়া খুবই আশ্চর্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব নহে। আজকাল যেমন 'তত্ত্ব' পাঠান হয়, তেমনি আগে হয়ত লোকে 'সন্দেশ' পাঠাইত। তত্ত্ব, কিনা কুশল মঙ্গলের সংবাদ, সেইটিই আসল কথা; সঙ্গের মিষ্টান্ন এবং উপহার স্নেহের চিহ্নমাত্র। কথা এই বটে, কিন্তু কাজে এখন দাঁড়াইয়াছে—কেবল মিঠাই সন্দেশ; আসল খবরের কথা চাপা পড়িয়াছে। সে খবর না থাকিলেও কেহ কিছু মনে করে না, কিন্তু মিঠাই না থাকিলে হয়ত চটে। 'সন্দেশে'র বেলায়ও বোধহয় এমনিতর একটা কিছু হইয়াছিল; আর 'তত্ত্বে'রও হয়ত কালে 'সন্দেশে'র দশা হইয়া উহা ময়রার দোকানে সের হিসাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে,—অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।

(বৈশাখ-১৩২০)

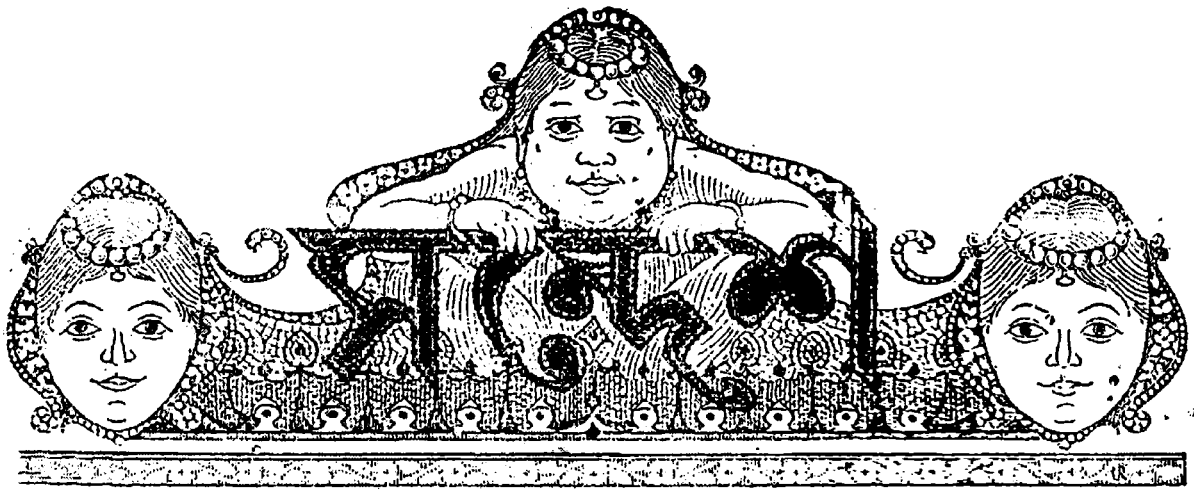

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন আমাদের এই ঘরে,
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে, ভাই, মনের মত করে'।
গান গেয়ে আনন্দমনে ঝাঁটিয়ে দে সব ধুলা,
যত্ন করে দূর করে দে আবর্জনাগুলা।
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ্‌ সাজিখানি ভরে',
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মত করে'।
দিন রজনী আছেন তিনি আমাদের এই ঘরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠি নয়ন মেলে চাই
খুসি হয়ে আছেন চেয়ে দেখতে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায় সমস্ত ঘর ভরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।

একলা তিবি বসে থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন ওরে কোথাও চলি কাজের তরে।
দ্বারের কাছে তিবি মোদের এগিয়ে দিয়ে যান,
মনের সুখে বাইরে পথে, আনন্দে গাই গান।
দিনের শেষে ফিরি যখন নানা কাজের পরে
দেখি তিবি একলা বসে' আমাদের এই ঘরে।

তিবি জেগে বসে' থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অচেতনে ঘুমাই অকাতরে।
জাগতে কেউ দেখতে না পায় লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে' জ্বালান সারারাতি।
ঘুমের মাঝে স্বপন কতই আনাগোনা করে,
অনুভবে হাসেন তিবি আমাদের এই ঘরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

(কার্ত্তিক, ১৩২৮)

ফের এলো

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

'সন্দেশ' এলো ফের, — মন খুশী খবরে—
সেই চিরপুরাতন—তবু অভিনব রে!
সন্দেশ, সন্দেশ,—
ছিলি তুই কোন্ দেশ?
এ যে রে মোহন বেশ
দেখি ফের তব রে!—

চিনি আর ছানা খাঁটি,—প্রাণ ওঠে মাতিয়া,—
ছেলেমেয়ে হুল্লোড়ে নাচে 'থৈ তাথিয়া',—
গুল্‌জার, সোর গোল,—
এই তুই দোর খোল,
চারিধারে ঘোর রোল—
শোন্ কাণ পাতিয়া।

লুটোপুটি খায় হেসে ছুটে যায় ও কারা?—
ছুটে যায় বাংলার খুকু আর খোকারা।
কি বাহার খোল্‌তাই,—
ওরা বুঝি বোল্‌তা-ই?—
আশে পাশে গোল্ তাই
করে ওই বোকারা।

সন্দেশ এলো আজ,—মন তাই নাচেরে,—
দারুণ ক্ষুধার কালে, ইস্, প্রাণ বাঁচেরে—!
আয় আয় বোস্ ভাই,
কি মধুর খোশবাই,
খেয়ে যাও দোষ নাই
থালা-ভরা আছে রে।

ব'সে যাও পাত পেতে, হাত নাও গুটিয়ে,—
টপাটপ্ গিলে খাও,—ভুলে যাও ত্রুটি হে।
মশ্‌গুল্ চারধার,—
অদ্ভুত কারবার,
পেট ভরে বার বার
খেয়ে নাও চুটিয়ে।
সন্দেশ এলো ফের,—হেসে পড়ি লুটিয়ে।

(আশ্বিন, ১৩৩৮)

হাবুর বাবুগিরি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক ছিল ধোপা তার নাম হাবু। তার ছিল এক গাধা। ধোপারা যেমন গাধার পীঠে কাপড়ের বস্তা দিয়ে নিয়ে যায় সেও তেমনি কর্‌ত। তাই নিয়ে তার গিন্নী কত ঠাট্টা কত বকাবকি কর্‌ত তার ঠিক নেই। বল্‌ত, "দেখ রাজবাড়ীর ধোপার কেমন সুন্দর ঘোড়া—সে ঘোড়ায় করে কাপড় নিয়ে যায়, তার ছেলেরাও কখন কখন তার উপর সওয়ার হয়ে বেড়িয়ে ব্যাড়ায় আর তোমার কিনা এই গাধা নিয়েই কারবার—তোমার হ'ল কি?" সে বেচারা গিন্নীর লাঞ্ছনায় তিতি বিরক্ত হয়ে স্থির কর্‌লে এবার যেন তেন প্রকারেণ একটা ঘোড়া কিরতে হবে। এক মাসে তার অনেক কষ্টে ৫টি টাকা জমেছিল সেই টাকা কটি হাতে করে বাজারময় ঘুরে ব্যাড়াতে লাগল। যার কাছে ঘোড়া কেনবার কথা বলে সেই তাকে হাঁকিয়ে দেয়—বলে, "৫ টাকায় আবার ঘোড়া কিন্‌তে এসেছে, মিন্‌সের রকম দেখনা?"

সে মুখ চুন করে বাড়ী ফিরছে এমন সময় একজন নাপিতের সঙ্গে দেখা হল। নাপিত জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কেন ভাই তোমার কি হয়েছে? অমন মুখভার করে চলেছ কোথায়?" হাবু বল্লে, "আর ভাই কি বলব—আমি একটা ঘোড়া কিনতে চাই—ঘোড়া না হলে গিন্নী আমাকে খেয়েই ফেলবে—আমি যার কাছে কিনতে যাই সেই আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আমি কত খেটে খুটে এই পাঁচ টাকা জমালুম—সবটাই কড়ায় গণ্ডায় দিতে প্রস্তুত তবু কেউ আমার কথায় কান দেয় না। কি করি বল দেখি নাপিত ভায়া?" নাপিত বল্লে, "তা ভাবনা কিসের? আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোমাকে ঘোড়া না দিতে পারি ঘোড়ার ডিম এনে দিচ্ছি—সে ডিম ফুট্‌লে এমন সুন্দর বাচ্ছা হবে যে, যে দেখবে তার তাক লেগে যাবে। তুমি একটু বস আমি এখনি তোমাকে এনে দিচ্ছি।"

কাছেই নাপিতের কুঁড়ে ঘর ছিল সেখানে গিয়ে বেস একটা বড় কুমড়ো বের কর্‌লে, তার উপর ভাল করে চুন মাখিয়ে ধোপার কাছে এনে হাজির, "এই দেখ ভাই তোমার জন্য ডিম এনেছি। এর দাম অনেক, কিন্তু বন্ধুতার খাতিরে তোমাকে সস্তা দিচ্ছি, আমাকে এই ৫ টাকা দিলেই হবে। এটা ৭,৮ দিন রদ্দরে রাখ্‌তে হবে তারপর ফুট্‌লে এর থেকে এমন ঘোড়ার বাচ্ছা বেরবে যে তুমি তখনি তার উপর চড়ে দৌড়ে ব্যাড়াতে পারবে।" এই বলে হাবুর কাছ থেকে পঞ্চমুদ্রা নিয়ে পিট্টান দিলে।

হাবু ত ভারী খুসী, সে তখুনি ডিম মাথায় করে নিয়ে চল্‌লো। যেতে যেতে তার মনে নানান্ খেয়াল উঠতে লাগল—কেমন সুন্দর বাচ্ছা হবে—যখন বড় হয়ে তার উপর চড়ে ব্যাড়াব আর যখন টক্ টক্ করে গিন্নীর সাম্‌নে দিয়ে চড়ে যাব, তাকে দেখে অবাক্ হয়ে যাবে। আর আমাকে খোটা দিতে পারবে না। বল্‌তে বল্‌তে সে সত্যই এমন দ্রুতবেগে ছুট্‌ল যে ডিমটা মাথা থেকে পড়ে ছরকুটে গেল।

সেই সময় কাছ থেকে একটা শেয়াল যাচ্ছিল। তাকে দেখে হাবু ভাব্‌লে, "এই বুঝি বাচ্ছা বেরিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে"—এই ভেবে তার পিছনে পিছনে ছুট্‌ল, এই ধরে আর কি। যখন ধর ধর হল তখন শেয়ালটা দুই পায়ের মধ্যে ল্যাজ গুটিয়ে দে ছুট। তাকে হাবু আর ধর্‌তে পারলে না। কাজেই খালী হাতে ঘরে ফিরে যেতে হল। মাথা হেট করে গিন্নীর কাছে গিয়ে উপস্থিত। বৃত্তান্তটা শুনে গিন্নী জ্বলে পুড়ে মরেন আর কি। "এই বুঝি তোমার ঘোড়া। ধিক্ তোমাকে! টাকা যা কিছু কষ্টে সৃষ্টে জমিয়েছিলে তাও জলে ঢেলে এলে। আমাদের এ মাস্‌টা চালানো ভার। হাবার গাধাই সাজে—ঘোড়া কিন্‌তে যাওয়া তার পক্ষে বামনের চাঁদে হাত বাড়াবার মতন। আমি আগেই জানতুম তুমি হাজার মাথা খুঁড়লেও তার কোন ফল হবে না।"

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

এদিকে শেয়াল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে তার বাড়ী পৌঁছল আর পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ধোপার কথা রাষ্ট্র করে দিলে। শেয়ালদের এক খণ্ড সভা বসল। পরে অনেক মন্ত্রণার পর শেয়ালের যুক্তিতে যা স্থির হল সভাপতি বলে দিলেন।

প্রথমে এই, যে দিনের বেলায় বেরতে হলে শেয়ালদের ন্যাজ গুটিয়ে ব্যাড়াতে হবে।

দ্বিতীয় এই, যে সকাল সন্ধ্যা যে যত পার চেঁচিয়ে ডাক ছাড়্‌বে আর যখনি হোক্ এক জনের ডাক শুন্‌লে দশজনে তাতে যোগ দিয়ে সকলকে সাবধান করে দেবে। এই নিয়মে না চল্‌লে ধোপার হাতে কোন দিন তোমাদের প্রাণটা খোওয়াতে হবে তা বলা যায় না। সেই অবধি শেয়ালদের মধ্যে এই নিয়মগুলি চলিত হয়ে গেল।

ধোপা যদিও আপনার ঘরে গিন্নীর কাছে অপদস্থ কিন্তু শেয়াল মহলে তার খুব মান, তার নামে সকলেই সশঙ্কিত।

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

With Best Compliments from :

OPTO MARKETING CO. PVT. LTD.

প্রভাতী

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হোলো দোর খোল খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে যুঁই শাখে ফুল-খুকী ছোট রে।
খুকুমণি ওঠ রে!
রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ।
দারোয়ান গায় গান শোন ঐ "রামা হৈ!"
ত্যজি নীড় ক'রে ভিড় ওড়ে পাখী আকাশে,
এস্তার গান তার ভাসে ভোর বাতাসে।
চুল্‌বুল্‌ বুল্‌বুল্‌ শীশ্‌ দ্যায় পুষ্পে,
এইবার এইবার খুকুমণি উঠবে।
খুলি' হাল তুলি' পাল ঐ তরী চল্‌লো,
এইবার এইবার খুকু চোখ খুল্‌লো!
আল্‌সে' নয় সে ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে।
উঠ্‌লো ছুট্‌লো ঐ খোকা খুকি সব,
"উঠেছে আগে কে" ঐ শোন কলরব।
নাই রাত, মুখ হাত ধোও, খুকু জাগো রে,
জয়গানে ভগবানে তুষি' বর মাগো রে!

(ভাদ্র-১৩২৮)

বেহদ্দ বোকা

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

বিদেশী এক গৃহস্থ, তার স্ত্রী, আর মেয়ে। মেয়েটি বড় হয়েছে, একজনের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হ'য়েছে। লোকটি প্রায়ই গৃহস্থের বাড়ী আসে, গল্প সল্প করে, রাত্রে খাওয়া দাওয়া ক'রে বাড়ী যায়। গৃহস্থের বাড়ীর তলায় মাটির নীচে ভাঁড়ার ঘর, তাতে প্রকাণ্ড পিপের মধ্যে মদ থাকে। জলের কল খুলে দিলেই যেমন জল পড়ে, তেমনি সেই বড় পিপেতেও কল থাকে, তাই খুলে মদ নিয়ে আবার কল বন্ধ করে দিতে হয়।

একদিন গৃহস্থের বাড়ী খুব ভোজ হ'য়েছে। ভোজের পর গৃহস্থের মেয়ে গিয়েছে মদ আনতে। সে মদের জন্য ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে কল খুলে হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে দেখে—কড়িকাঠে ঠিক তার মাথার উপরে একটা কুডুল ঝুলছে। কুডুলটা অনেক দিন থেকেই ওখানে দড়িতে ঝুল্‌ছিল, এতদিন তার চোখে পড়েনি। হঠাৎ সেটা দেখেই মেয়ে ভাবল—"তাইত! আমার বিয়ের পর যদি আমার ছেলে পিলে হয়, আর সেই ছেলে ক্রমে বড় হয়ে যদি মদ নিতে ভাঁড়ার ঘরে আসে, আর যদি দড়ি ছিঁড়ে কুডুলটা তার মাথার উপর পড়ে যায়! হায় হায়! তবেত সে মরে যাবে!" এই ভেবেই সেই মেয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বসল। এদিকে তার দেরী দেখে গৃহস্থের স্ত্রী ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে উপস্থিত! মদের পাত্র আর আলো মাটিতে রেখে মেয়ে বসে কাঁদছে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল—"কিরে, তোর হলো কি, কাঁদছিস কেন?" তখন কড়িকাঠে কুডুলটা দেখিয়ে মেয়ে বল্‌ল—"আমার বিয়ের পর তোমার নাতি হলে কোন দিন যদি সে মদ নিতে আসে আর কুডুলটা তার মাথায় পড়ে, তবেইত সে মরে যাবে! তাই ভেবে আমি কাঁদ্‌ছি।" একথা শুনেই 'ওমা তাইত! কি হবে গো!' বলেই মেয়ের পাশে বসে বসে মাও বিষম কান্না জুড়ে দিল।

খানিক বাদে গৃহস্থ এসে যখন সব ব্যাপার জান্‌তে পারল, তখন সেও স্ত্রী আর মেয়ের পাশে বসে কাঁদতে লাগ্‌ল! এদিকে বসে বসে হয়রান হয়ে, গৃহস্থের যে জামাই হবে সেই লোকটিও ভাঁড়ার ঘরে গেল। গিয়ে দেখে—স্বামী, স্ত্রী আর মেয়েতে কাঁদ্‌ছে আর খোলা কল দিয়ে মাটিতে মদ পড়ে পিপে প্রায় খালি হ'য়ে গেছে! তারপর কান্নার কারণ শুনে হাসতে হাসতে তার পেট ফাটবার জোগাড়! যাহোক্, তাড়াতাড়ি পিপের কল বন্ধ করে দিয়ে, একটানে দড়ি ছিঁড়ে কুডুলটাকে ফেলে দিয়ে সে গৃহস্থকে বল্‌ল—"অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু আপনাদের তিন জনের মত মূর্খ কোথাও দেখিনি। যাহোক্, এখন আবার দেশ ঘুরে বেড়াতে চল্লাম। যদি আপনাদের চেয়েও বোকা তিন জন লোক দেখ্‌তে পাই তবে ফিরে এসে আপনার মেয়েকে বিয়ে করব।"

এর পর ভাবী বর অনেক জায়গা ঘুরে এক বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত! বুড়ীর কুঁড়ের চালে একরাশ সুন্দর সবুজ ঘাস গজিয়েছিল। সে দেখ্‌ল—বুড়ী চালে মৈ লাগিয়েছে আর সেই মৈ দিয়ে চালে উঠবার জন্য তার গাইটার গলার দড়ি ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছে কিন্তু গাই বেচারি কিছুতেই মৈ বেয়ে উঠতে রাজি হচ্ছে না! গাইটাকে অমন ভাবে টানাটানি করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বুড়ী বল্‌ল—"দেখছ না, চালের উপর কেমন সুন্দর ঘাস গজিয়েছে? এই ঘাস খাবার জন্য গাইটাকে চালে তুলবার চেষ্টা করছি।" বর বল্‌ল—"কেন, গাসগুলো কেটে এনে গাইকে খেতে দাও না?" বুড়ী—"তার চেয়ে গাইটা চালে উঠে ঘাস খেলেই ত সোজা হয়!" একথা শুনে বর বুঝতে পারল—বুড়ী একের নম্বরের বোকা!

তারপর আবার চল্‌তে চল্‌তে অনেক দূর গিয়ে সন্ধ্যার সময় সে এক সরাইখানায় উপস্থিত। সেদিন সরাইয়ে বড্ড ভিড় হয়েছিল, প্রত্যেক ঘরে দুটি করে খাট পাতা হয়েছে, তা নইলে জায়গায় কুলায় না। রাত্রে বর দেখ্‌ল, তার ঘরের সঙ্গীটি বেশ আমুদে লোক। দুজনে অনেক রাত অবধি গল্প গুজব করে তারপর আরামে ঘুমাল। ভোরবেলা তখনও বর বিছানা থেকে উঠেনি, সে শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ল—সঙ্গীটি ঘরের এক কোণে তার পায়জামা ঝুলিয়ে, দৌড়ে লাফ দিয়ে তার

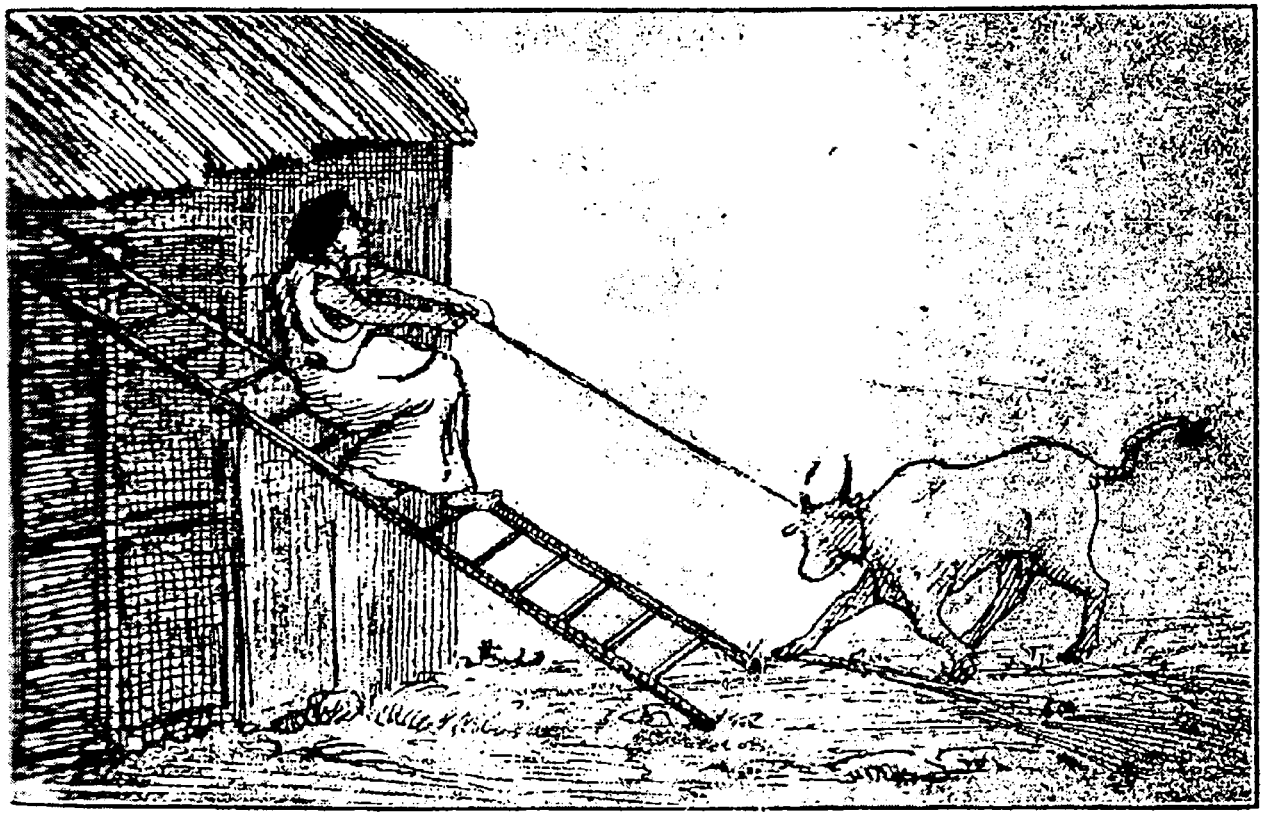

মধ্যে পা ঢুকাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠ্‌ছে না। এই ব্যাপার দেখে বর ভদ্রলোকটিত একেবারে অবাক্! সে বুঝতে পারল না সঙ্গীটি কেন এমন অদ্ভুত কাজ করেছে। তারপর শুন্‌ল খানিক লাফালাফি করে, ঘেমে ঝোল হয়ে, মুখ মুছতে মুছতে সে লোকটা বল্‌ছে—"বাবা! এই পায়জামার মত এমন বেখাপ্পা পোষাক আর নাই! কোন্ হতভাগা লোক না জানি এই পোষাকের সৃষ্টি করেছিল! প্রতিদিন সকাল বেলা এই বিট্‌কেল পোষাক পরতে আমার একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়— ঘেমে কাহিল হয়ে পড়ি, নাকালের একশেষ হই।" একথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বরের পেটে খিল ধ'রে গেল—সে উঠে পায়জামার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিল যে পোষাক পরার জন্য ছুটোছুটি ক'রে তার মধ্যে লাফিয়ে পড়বার দরকার হয় না—বেশ আরামে বসে বসেই পোষাক পরা যায়। তখন লোকটা বলল, "তাইত! এ ত বেশ উপায় বল্‌লেন! আপনার খুব বুদ্ধি যাহোক!" তখন বর ভাবল—এব্যক্তি দু নম্বরের বোকা!

তারপর আবার অনেক ঘুরে ফিরে সে এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত! সেখানে দেখ্‌ল—একটা পুকুরের ধারে চার পাঁচশ লোক—কারো হাতে ঝাঁটা কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে কাস্তে কোদাল—সকলেই যেন জল থেকে কি তুলবার চেষ্টা করছে। ব্যাপার কি? তখন জিজ্ঞাসা করবামাত্র সকলে চেঁচামেচি করে বল্‌তে লাগল—"মশায়! ভয়ানক কাণ্ড! আকাশ থেকে আমাদের চাঁদটি কখন জলে পড়ে গিয়েছে, কত চেষ্টা করেও তুলতে পারছি না।" একথা শুনে বরের ত চক্ষু স্থির! সে বল্‌ল—"হ্যাঁরে, তোদের গ্রাম শুদ্ধ সবাই কি হাঁদা বোকার দল রে? জলে যে ওটা চাঁদের ছায়া তাও কি তোদের হুঁস নেই? ঐ দেখ, আকাশের চাঁদ আকাশেই আছে।"

এরপর আর দেশ ঘুরবার দরকার কি? সুতরাং বর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে সেই গৃহস্থকে বলল, "না মশাই, আমার ভুল হ'য়েছিল'—আপনারা ত তেমন কিছু বোকা নন্। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে আর আমার কোন আপত্তি নেই।"

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(অগ্রহায়ণ-১৩২৫)

ভবম হাজাম

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা, সে এক ভারী প্রকাণ্ড রাজা। তাঁর হাতীশালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতী গোয়ালে গোরু আস্তাবলে ঘোড়া—কি? এ সব জান? এ সব তো সব রাজার আছে? তা একটু আবার শোননা—তাঁর ভাঁড়ার ভরা ইঁদুর পুকুর ভরা ব্যাং, আরো কত কিছু ছিল, আর মাথায় দুটো ছাগলের মত শিং। বেচারা রাজার ত শিং নিয়ে মহামুস্কিল, পাছে লোকে দেখে এই ভয়েই অস্থির। তাঁর মাথার চুল খুব লম্বা ছিল আর তার উপর প্রকাণ্ড এক মুকুট। কোন রকম করে শিংটা চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে বাঁচেন। কিন্তু চুল আর কত লম্বা রাখা যায়, তাতেও যে লোকে যা তা বল্‌তে আরম্ভ করে। কাজেই রাজা আর কি করেন মাঝে মাঝে চুল্ কাটান; কিন্তু যে নাপিত যায় সে আর ফিরে আসেনা; রাজা মশাই কোন একটা ছুতো নাতা করে তার মাথাটি উড়িয়ে দেন। কাজেই আর কোন নাপিত আস্‌তে চায়না, রাজার বাড়ি যাওয়ার হুকুম এলেই কোন রকমে খুর কাঁচি পুঁটলি পাঁটলা নিয়ে তাঁর দেশ ছেড়ে পালায়। শেষে এক ছোকরা নাপিত টাকার লোভে রাজার বাড়ি গেল। নাপিতের নাম ভবম্ হাজাম (হিন্দুস্থানি নাপিত কি না,—তারা নাপিতকে বলে হাজাম)।

ভবম্ এসে ত বেশ করে রাজার চুল কাট্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে কি না রাজার মাথায়—বাপরে—এয়া বড় দুই

শিং! সে ত তাই দেখে একেবারে হতভম্ব। তার পর সে কোন রকমে রাজার চুল কাটা সার্‌ল। কিন্তু বেচারার এই সব দেখে মাথা ঠিক ছিল না, সে রাজার মাথায় টিকি রাখ্‌তে ভুলে গেল। আর যায় কোথায়? রাজা বল্লেন, "তবেরে বেটা বেয়াদব, আমার মাথায় শিখা রাখিস্‌নি যে? এক্ষুনি তোর গর্দ্দান নেব।"

নাপিত ত ভয়ে কাঠ। সে বল্লে, "দোহাই হুজুর, এটা বড়ই ভুল হয়ে গেছে; তবে টিকি, বিশেষ করে রাজা লোকের টিকি, ও ফের খুব শিগ্‌গির গজাবে; কিন্তু হুজুর, আমি গরিব মানুষ, আমার মাথা গেলে আর গজাবে না"—কিন্তু সে আর কে শোনে? তার পর নাপিত অনেক হাতে পায়ে ধর্‌ল, শেষে বুঝিয়ে বল্ল যে তার মাথা কাটা গেলে আর কোন নাপিত কখনো রাজবাড়িতে আসবে না। তখন রাজা আর কি করেন, বল্লেন, "যা, কিন্তু খবর্দ্দার আমার শিঙের কথা কাউকে বলিস্‌নে, বল্লেই তোর দফা শেষ কর্‌ব।"

নাপিত ত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মেরে পালাল আর রাজার বাড়ির মুখোও হলনা।

এখন, নাপিতের পেটে কথা থাকে না। কাজেই এই রাজার শিংয়ের কথাও ভব্‌ম নাপিতের পেটে আর থাকতে চায় না। নাপিত প্রাণের দায়ে তাকে জোর জবরদস্তি করে অনেক চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু সে কিছুতেই চাপা গেল না, মাঝে থেকে এই ঠেলাঠেলির চোটে ভবমের পেটটা ফুল্‌তে লাগল। দিন যায়, নাপিতের পেটও যায় যায়।

সেটা ফুলে ফুলে ঢোল, ক্রমে ঢাকাই জালা হয়ে উঠ্‌ল। শেষে নাপিত তার এক নানির (দিদিমা) কাছে গেল। গিয়ে বল্লে, "নানি, টাকার লোভে এক জায়গায় গিছ্‌লাম, সেখানে একটা কথা জেনেছি; এখন তার চোটে মাথা যায় কি পেট যায়।"

নানি বল্লে, "কি হয়েছে খুলেই বলনা কেন?" ভবম্‌ বল্লে, "অত বলবার যো নেই আর না বল্লেও ত দেখ্‌ছ কি হচ্ছে।"

নানি তখন তাকে বলে দিল যে "সহরের মাঝে যে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে তা কোটরে ঢুকে তোর কথাটা বলে আয়গে।" ভব্‌ম তখন গাছের কোটরে ঢুকে চুপে চুপে ব'লে এল, "আরে বাস্‌রে, রাজার মাথায় এয়া বড় দুই শিং!!" আর অম্‌নি তার পেট ফাঁপাও সেরে গেল।

তারপর একদিন রাজার বাড়ি মহা ধুমধাম। রাজার মেয়ের বিয়ে। অনেক জায়গা থেকে কত ঢাক ঢোল কত বাজনা এসেছে। তার মধ্যে ছিল এক ঢোল সেটা সেই সহরের মাঝের বটগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। যখন বিয়ের আসর খুব জমেছে, বরযাত্রী এসে পড়েছে, চারিধারে লোকে লোকারণ্য, তখন সকলে শুন্‌ল, রাজার নহবৎখানায় শানাই কাঁসর আর ঢোল মিলে নানান্‌ সুরে কি যেন বল্‌ছে। শানাই তার মিহী সুরে তান ধরেছে, "রাজাকে দুই শিং! রাজাকে দুই শিং!" কাঁসর অমনি ক্যান্‌ ক্যান্‌ করে বল্‌ছে, "কিন্নে কহা? কিন্নে কহা?" (কে বলেছে, কে বলেছে), আর ঢোল গুরু গম্ভীর আওয়াজ করে বল্‌ছে, "ভবম্‌ হাজাম নে, ভবম্‌ হাজাম নে" (ভবম্‌ নাপিত বলেছে)!

আর কোথা যায়! চারিধারে হুলস্থূল—লোকে যা তা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। রাজা ত রেগে আগুন হয়ে নাপিতকে কাট্‌তে হুকুম দিলেন। কিন্তু নাপিত কি আর সেখানে থাকে? সে সেই সর্ব্বনেশে ঢোলের কাণ্ড দেখে আগেই কোথায় সরে পড়েছে। কাজেই, তাকে আর তখন ধরে কে? রাজা মশায়ের লম্ফঝম্প আর শিং নাড়াই সার হ'ল।

ছবি: সুকুমার রায়
(ভাদ্র-১৩২৫)

আষাঢ়ে ছড়া

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

এ বুঝি আষাঢ় মাস,
তাই ছুটে চারি পাশ
শুধু করে হাঁসফাঁস
পূবের বাতাস।

কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
জুড়িয়ে আকাশ।।

হাতির মতন ধড়,
নাহি তাহে নড় চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়,
চারিদিক ছেয়ে।

এত হল অন্ধকার,
দিবারাত্রি একাকার,
পাখী সব চিৎকার
করে ভয় খেয়ে।।

দু'হাত না চলে দৃষ্টি,
ধুয়ে পুঁছে সব সৃষ্টি
অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টি
ঝর ঝর ঝরে।

দেখে ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেঙ্‌চায় মুখ,
বিদ্যুতের সবটুকু
জিভ্ বার করে'।।

চিল খায় ঘুরপাক,
ডালে বসে' কাঁপে কাক্,
আকাশেতে বাজে ঢাক
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।

সারস মেলিয়া পাখা
নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা,
ময়ূর ধরেছে কেকা,
গায় কোলা ব্যাঙ।।

হাঁস, রাজ আর পাতি,
খালে বিলে সার গাঁথি,
ফুলিয়ে বুকের ছাতি,
হেসে ভেসে চলে।

ব্যাঙদের মক্‌মকি,
বিদ্যুতের চক্‌মকি,
দেখেশুনে বক বকি
এক পায়ে টলে।।

গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে,
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের।

শিউলি ভূঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকী ফুলের।।

মেঘেদের হুড়োহুড়ি
শুনে যত বুড়োবুড়ি,
জ্যেঠাজেঠি খুড়োখুড়ি
ভয়ে মরে আজ।

কখন সড়াৎ করে',
অথবা হড়াৎ করে',
বেজায় কড়াৎ করে'
শিরে পড়ে বাজ।।

ছেলেপিলে মহানন্দ,
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব,
মহা তাল ঠুকে।

পা ছড়িয়ে নারীকুল,
উনুনে শুকোয় চুল,
দু'নয়ন বাষ্পাকুল,
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে।।

মাতিয়া বরষা-রসে,
ভাঙা গলা মেজে ঘসে'
কোন যুবা ভাঁজে কসে'
সুরট-মল্লার।

কেহবা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে,
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদ-কহ্লার।।

বলি শুন, ওহে বর্ষা!
আবার যে হবে ফর্সা
এমন হয় না ভর্সা,
—না হয় না হোক।

তোমার ঐ রঙ কালো,
তোমার ঐ রাঙা আলো,
তার বড় লাগে ভালো,
যার আছে চোখ।।

(*আষাঢ়-১৩২১*)

সয়তানীর সাজা

শ্রীসুবিনয় রায়

পান্ত-ভূতের স্বভাবটা বড় ভাল। সে অনেক যাদু জানে, কিন্তু কখনও কারো অনিষ্ট করে না। এক হাত লম্বা তার শরীর, আর মেজাজটা ভারি ঠাণ্ডা। মিচ্‌কোপটাস্ কুম্‌ড়োপটাসের ছোট ভাই, মিচ্‌কে সয়তানের একশেষ। রাতদিনই কেবল সে একে খোঁচা দিচ্ছে, ওকে খোঁচা দিচ্ছে। আধ-হাত লম্বা তার চেহারা, ভুঁড়ো পেট, সরু ঠ্যাং।

একদিন পান্তভূত রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌তে পেল, একটা ছোট ঝোপের নীচে মিচ্‌কোপটাস্ লুকিয়ে আছে, তার হাতে একটা রামগরুড়ের পালক। সে পালক বড় মজার জিনিষ;—বাতাসের মত হাল্কা, কিন্তু যে জিনিষের নীচে রাখা যায়, সে জিনিষ যতই ভারী হোক না কেন, বাতাসে তাকে উল্টে ফেলে দেবেই।

মিচ্‌কোপটাস্ সেই পালকটা রাস্তার মাঝখানে রেখে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে রইল। খানিক বাদে আলুওয়ালী বুড়ী তার ঠেলাগাড়ী ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে সেখানে এসে হাজির হ'লো। বেচারা তো কিছুই জানে না;—একেবারে রামগরুড়ের পালকের উপর দিয়েই গাড়ী চালিয়ে দিয়েছে। অম্‌নি আর কোথায় যাবে, ধর্ ধর্ কর্‌তে না কর্‌তেই গাড়ী বোঁ ক'রে ডিগ্‌বাজী খেয়ে উল্টে গেল; আর আলুর যে কি দশা হ'লো তা' আর কি বলব! চারিদিকে খালি আলুই গড়াচ্ছে!

বুড়ী বেচারা ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগল; বেচারার হাটে যাবার তাড়া ছিল, কিন্তু আলুগুলো না তুলে সে যাবেই বা কি ক'রে, আর আলু তুলতে তুল্‌তেও তার হাটে যাবার অনেক দেরি হ'য়ে যাবে। সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দু'হাতে আলু তুল্‌তে লাগল। এদিকে পান্তভূত বেচারা বুড়ীর কষ্ট দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাকে সাহায্য কর্‌তে লাগল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব আলু তোলা হ'য়ে গেল, আর বুড়ীও হাটের দিকে চ'লে গেল।

মিচ্‌কোপটাস্ তো আলুর গাড়ী উল্টাতে দেখে হেসেই কুট্‌পাট। হাস্‌তে হাস্‌তে তার পেটে খিল ধ'রে গেল; মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল। তারপর সে ছুটে পালাল।

পান্তভূতের মনে ভারি রাগ হলো। সে মনে মনে বল্‌ল, "মিচ্‌কোপটাসের বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে! পরকে কষ্ট দিয়ে সে মনে করে ভারি তামাসা কর্‌ল! দাঁড়াও না! ওর সয়তানী ভেঙে দিচ্ছি!" এই ব'লে সে একটা যাদুর মন্তর তৈরী কর্‌ল। তার মধ্যে ছিল একটা আলু, এক ডেলা মাটি, তোষকের খানিকটা তুলো, একটা মুক্তো, আর একটা পুলি-পিঠে। সেই মন্তর ধোঁয়ার মধ্যে পুরে সে চুপি চুপি মিচ্‌কোপটাসের বাড়ীতে ফেলে এল।

মিচ্‌কোপটাস্ সারাদিন তার দুষ্টুমির কথা অন্য ভূতেদের কাছে ব'লে বেড়িয়েছে। অন্যেরা হাসুক আর নাই হাসুক, সে তার গল্প ব'লেছে আর হেসে গড়াগড়ি দিয়েছে। সব ভূতেদের কাছেই তার গল্প বলা হয়েছে—কেবল পান্তভূতের কাছে বলা হয় নি, কারণ সে তো সেখানে উপস্থিতই ছিল। বিকালবেলা মিচ্‌কোপটাস্ মুচ্‌কি হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে তার বাড়ীতে ফির্‌ল। তার বেজায় ক্ষিদে পেয়েছিল, তাই সে তখনই একটা মস্ত বড় পুলিপিঠে বানাতে আরম্ভ কর্‌ল। পুলি-পিঠে খেতে সে বড়ই ভালবাসত। এমন সময় হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, কিন্তু অমাবস্যার রাত্রের মত ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার হয়েছিল। মিচ্‌কোপটাস্ তাড়াতাড়ি পুলিপিঠেটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে, বাতি জ্বেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে কি তার দরজার সাম্‌নেই একটা প্রকাণ্ড আলুর গাছ হয়েছে; সেটা তার বাড়ীর চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। তখনি সে একটা কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়্‌তে আরম্ভ করে দিল। ওঃ, সে কি বিষম গাছ! খুঁড়েই যাচ্ছে খুঁড়েই যাচ্ছে, তবু তার শিকড়ই মেলে না। শেষটায় তার পিঠে ব্যথা হয়ে গেল, গা হাত ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, পা ধরে গেল, মাথা ঘুর্‌তে লাগল! তখন সে দেখ্‌তে পেল যে গাছটা শুখিয়ে

গেছে, আর একটা প্রকাণ্ড আলু সেখানে রয়েছে। সেই আলুটা তখনই তাকে বলল, "আলুবুড়ীর ঠেলাগাড়ী থেকে তুই আমাকে ফেলে দিয়েছিলি, তাই আমি তোর বাড়ীর সাম্‌নে মাটিতে ঢুকে মস্ত গাছ হ'য়ে গিয়েছিলাম। এখনই আমাকে আলুবুড়ীর কাছে নিয়ে যা; না হলে আমি আবার আরো বড় গাছ হয়ে তোর বাড়ীকে ঢেকে ফেলব।"

মিচ্‌কোপটাস্ বল্‌ল, "দোহাই আলুদাদা! আজ আর আমি পার্‌ছি না; কাল সকালে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বুড়ীর কাছে নিয়ে যাব।" এই কথা ব'লে সে আলুটাকে ঘরে তুলে রেখে পুলি-পিঠে খেতে গেল। তার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, আর পুলি-পিঠের গন্ধও বেরিয়েছিল চমৎকার; তাই খাবারের লোভে তার জিভ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগল। হাঁড়ি খুলেই সে পুলিপিঠে বের করতে গেল, কিন্তু বেরুল একটা মস্ত আলু! এবার বেচারা আর সহ্য করতে পারল্ না—সে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেল্‌ল। আলুর কিন্তু তাতে কিছু দয়া হ'লো না; সে বলল, "আলুবুড়ীর ঠেলাগাড়ী থেকে তুই আমাকে ফেলে দিয়েছিলি, তাই আমি তোর পুলিপিঠের মধ্যে ঢুকেছি। এখনই আমাকে বুড়ীর কাছে দিয়ে আয়; নইলে রোজ আমি তোর পুলি-পিঠের মধ্যে ঢুকে থাক্‌ব।" মিচ্‌কোপটাস্ বলল, "দোহাই আলুদাদা! আজকে আমাকে মাপ কর; কাল সকালে তোমাকে নিশ্চয়ই আলুবুড়ীর কাছে নিয়ে যাব।" এই বলে সে আলুটাকে তুলে রেখে দিল।

খাওয়া তো তার আর সে দিন হ'লই না। বেচারা আর কি করে? ঢক্ ঢক্ ক'রে দু'তিন ঘটি জল খেয়ে পেট ভরিয়ে বিছানায় শুতে গেল। কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্যি! তোষকের মধ্যে কি জিনিষ ঢুকেছে কে জানে? যেম্নি শক্ত সেটা, তেম্নি উঁচু। বেচারা একবার এ-পাশ, একবার ও-পাশ কর্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু ঘুম আর হয়ই না। শেষটায় তার গায়ে ব্যথা হ'য়ে গেল। শেষ রাত্রে সে বিছানা থেকে উঠে, তোষক কেটে ফেল্‌ল আর তার মধ্যে থেকে বের কর্‌ল—একটা মস্ত আলু! তখন তার যা কান্না!

আলুর কিন্তু একটুও দয়া হ'ল না। সে বলল, "আলুবুড়ীর ঠেলাগাড়ী থেকে তুই আমাকে ফেলে দিয়েছিলি,

তাই আমি তোর এই তোষকের মধ্যে এসে ঢুকেছি। এখনই যদি তুই আমাকে বুড়ীর কাছে দিয়ে না আসিস্ তবে আমি রোজ তোর তোষকের মধ্যে ঢুকে ব'সে থাক্‌ব।"

মিচ্‌কোপটাস কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "দোহাই আলুদাদা! আজ আমাকে মাপ করো ভাই। রাত্রে খাওয়া হয় নি, ঘুম হয় নি, আমি আর চল্‌তেই পার্‌ছি না। কাল সকালে নিশ্চয়ই তোমাকে আলুবুড়ীর কাছে পৌঁছে দেবো।" এই বলে সে আলুটা তুলে রেখে ঘুমোতে গেল।

কয়েক ঘণ্টা খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে, যখন তার ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন বেশ রোদ উঠেছে। বিছানা থেকে উঠেই, কিছু খেয়ে নিয়ে, সে ভাবল, "এই বেলা আলুগুলোকে একটা থলেয় ক'রে বুড়ীর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।"

থলে নামাতে গিয়ে দেখে, তার মধ্যে মুক্তো ভরা রয়েছে। হেঁই-হো রাক্ষস তাকে ব'লেছিল, "আমার হাতের এক-মুঠো ভর্‌তি মুক্তো যদি আমায় দিতে পারিস্ তবে আমার ছোট মেয়ে ছুঁচোমুখীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো।" তাই সে অনেকদিন ধ'রে মুক্তো জমিয়ে রাখ্‌ছিল। তখন সে মনে মনে ভাবল, "আগে হেঁই-হোকে মুক্তো দিয়ে আসা যাক্—সেটাই বেশী দরকারী কাজ। তারপর, থলে খালি হ'লে, আলুগুলো বুড়ীকে দিয়ে আসা যাবে এখন।" একথা ব'লেই সে থলে কাঁধে নিয়ে ছুট্টে একেবারে হেঁই-হোর বাড়ী গিয়ে হাজির। হেঁই-হোকে দেখেই সে বল্‌ল, "দেখি তোমার মুঠো! এই থলের মধ্যে এত মুক্তো আছে যে, দু'মুঠো ভ'রে যেতে পারে!"

হেঁই-হো হাত পেতে দিল; মিচ্‌কোপটাসও থ'লের সব জিনিষ তার হাতে ঢেলে দিল। কিন্তু, কি সর্ব্বনাশ! থলের মধ্যে যে কেবলই একটা আলু ছিল! সেটাই ধপাৎ ক'রে রাক্ষসের হা'তে পড়্‌ল।

রাগে দু'চোখ লাল ক'রে, দুহাতে ঘুঁসি বাগিয়ে, হেঁই-হো বলল, "ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাস্ নি! বেরো এখনি এখান থেকে! নইলে ঘুঁসির চোটে তোকে আলু-ভাতে বানিয়ে দেবো!"

মিচ্‌কোপটাস্ তখন আর কিছু ভাব্‌তে পার্‌ছে না; তার চোখ ঝাপসা হ'য়ে এসেছে, মাথা ঘুর্‌ছে, কাণ ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে! চারিদিকে সে কেবল আলু, আলু, আলু দেখ্‌তে পাচ্ছে! এই অবস্থাতেই সে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী এসে, এক দৌড়ে বুড়ীর কাছে আলু নিয়ে গিয়ে বল্‌ল, "দোহাই তোমার! আর আমি কখনও কারো সঙ্গে কোন দুষ্টুমি কর্‌ব না!"

(অগ্রহায়ণ -১৩২৫)

সন্দেশকে শতবর্ষে সেলাম

কিংবদন্তী

পণ্ডিত বিদায়

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

পদ্মলোচন পোষ্টাপিস থেকে ফিরছে, মানসের সঙ্গে দেখা হোলো পথে।

—তোর হাতে ওসব কি রে?

পদ্মলোচন বল্ল,—যত রাজ্যের খবরের কাগজ। ষ্টেট্‌সম্যান, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট্ এইসব। বাবা পড়েন। হ্যাঁ রে মান্‌কে, পণ্ডিতমশাই আমাদের খাতা দেখেছেন? কত নম্বর পেয়েছি আমি?

মানস গম্ভীর ভাবে জবাব দিল,—বোধ হয় এগারো।

—মোটে? আর তুই?

—পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে নেব 'খন। ভাগ্যিস্ এগারো পাই নি, তাহলে কি মুস্কিল যে হোতো। একশর মধ্যে একশ দশ তো আর পাওয়া যায় না!

—আর সব ছেলেরা?

—তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস্ পাঁচ, মাইনাস্ সাত পেয়েছে; তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েন্টে'—সব 'বিলো জিরো'।

পদ্মলোচন হাস্‌তে পারল না। —তোর আর কি, তুই পণ্ডিতের ছেলে; তোকে ত আর কিছু বল্‌বেন না। মার খেয়ে মারা যাব আমরা।

পদ্মলোচন বাড়ী ফিরে যেন ভাবনার অকূল পাথারে পড়ল। সংস্কৃতে মোটে এগারো পেয়েছে! তার ওপর পণ্ডিতমশা'র আবার সব চেয়ে বেশি রাগ তারই ওপর—তাঁর কথার চোট্‌পাট্ জবাব দেয় ব'লে। সেদিন তো বেঞ্চির নড়বোড়ে পায়াটা ভেঙে নিয়েই কয়েক ঘা তাকে কসাবেন এমনি প্রচন্ড উৎসাহ দেখিয়েছিলেন; পদ্মর সৌভাগ্যক্রমে বেঞ্চিটা তার পক্ষ নিয়েছিল তাই রক্ষা—অনেক টানাটানিতেও কিছুতেই পায়াটা ছাড়তে সে রাজি হয় নি। অবাধ্য বেঞ্চিটাকে পদচ্যুত করতে না পেরে সে যাত্রা তাদের দুজনকেই তিনি পরিত্রাণ দিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর যা রাগ সে দেখেছে, এর পরে আর ইস্কুলে গেলে কি তার নিস্তার আছে?

খবরের কাগজগুলো বাবাকে দেওয়া তার হোলো না, নিজের পড়ার টেবিলে ফেলে রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে সে ভাব্‌তে বসলো। ভাব্‌তে ভাব্‌তে সমস্ত যখন তার এলোমেলো হয়ে এসেছে এমন সময়ে হঠাৎ তার মনে হোলো একটা পথ যেন পাওয়া গেছে, পণ্ডিতমশাইকে জব্দ করার একটা উপায় যেন সে আবিষ্কার করেছে। সংবাদপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে সে হাসিমুখে টেবিল থেকে উঠ্‌ল।

ইস্কুলে গিয়ে শুন্‌ল, সংস্কৃত পরীক্ষায় তাদের নম্বরের বহর দেখে হেডমাষ্টার মশাই এমনই হতভম্ব হয়ে গেছেন যে তিনি স্বয়ং আজ পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে আস্‌বেন। খবর পেয়ে পদ্মলোচন খুসীই হোলো। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে—আজ একটা বিহিত সে করবেই; তাকে নাম পাল্‌টে ধূম্রলোচন ব'লে ডাকার, যখন তখন বেধড়ক্ পিটন দেওয়ার প্রতিশোধ আজ তাকে নিতেই হবে। ক্লাশে ঢুকে নাকে নস্যি গুঁজে চল্লিশ মিনিট তিনি ঘুমিয়ে সুখ করবেন, আর বাকি দশ মিনিট সুখ করবেন পড়া নেবার অছিলায় তাদের পিটিয়ে—এটি আর হচ্ছে না। পদ্মলোচন আজ মরিয়া।

হেড্‌পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে হেড্‌মাষ্টার মশাই ক্লাশে ঢুকলেন। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল্ করলে কি করে?

ছেলেরা নিরুত্তর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—তোমাদের কোন ষড়যন্ত্র ছিল না কি? পদ্মলোচন জবাব দিল—পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান না সার্।

পণ্ডিতমশাই চোখ পাকিয়ে বল্লেন—কি? অধ্যাপনা করি না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! হেডমাষ্টার মশাই পণ্ডিতকে বাধা দিলেন—আপনি থামুন। কি বলবার আছে তোমার বলো।

—সেদিন আমি পণ্ডিতমশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, অবশ্য পড়ার বইয়ের বাইরে। আনসীন্

প্যাসেজ্ তো আমাদের থাকে য়্যাডিশনালে। তা পণ্ডিতমশাই তার মানেই বল্লেন না।

পণ্ডিতমশাই রাগে ফুলতে লাগ্লেন—কি? কোন্ শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই? শ্লোকার্থ জানিনা—আমি!

দাঁত কিড়মিড় করে পণ্ডিতমশাই যেন ফেটে পড়তে চাইলেন—নিয়ে আয় তোর কোন্ শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই!

হেড্মাষ্টার আশ্বাস দিলেন—বলো, ভয় কি! তোমার মনে নেই বুঝি?

পদ্মলোচন ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ, আছে। এই শ্লোকটা সার্—

হবার্ত্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেডুয়ে।
আন্ডীবঃ অন্ডফ্রয়েণ মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ।।

শ্লোক শুনে পণ্ডিতমশায়ের চোখ কপালে উঠ্ল। ভুরু কুঁচকে ভাব্তে লাগ্লেন তাঁর সারা জন্মে এমন অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন কি না। পণ্ডিতকে নিঃশব্দ দেখে হেড্মাষ্টার মশাই বুঝতে পারলেন শ্লোকটা তেমন সহজ নয়; তাই তাঁকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন—একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন; উপনিষদ কিম্বা পাঁজির বোধ হয়, কি বলেন?

পণ্ডিতমশাই মাথা চুল্কাতে লাগ্লেন—কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্ম্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ ক'রে দেব, ও যেন মান্কের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ী যায়।

পদ্মলোচন বল্ল—না সার্, সাম্নে দুর্গাপূজা, আমি বিছানায় শুয়ে থাক্তে পারব না।

পণ্ডিতমশায়ের প্রহারের ভয়ানক প্রসিদ্ধি ছিল। হেড্মাষ্টার পদ্মলোচনের ভয় দেখে হাস্তে লাগ্লেন—পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি কাল স্কুলে বল্বেন তাহলেই হবে। আমারও জানার কৌতূহল হয়েছে। একটু ঘেঁটে দেখ্বেন, পাঁজির কিম্বা উপনিষদের হবে—ওই দুটাই ত যত রাজ্যের শ্লোকের আড়ৎ কি না!

পণ্ডিতমশাই গম্ভীর হয়ে বল্লেন—বেশ, আমার স্মরণে রইল।

বাড়ী ফিরে পণ্ডিতমশাই শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে পড়লেন; উদ্ভটসংগ্রহটাও পাতি পাতি ক'রে খুঁজলেন। কোনোদিকেই-শ্লোকটার কোনো সুরাহা হোলো না। নাকে এক টিপ্ নস্য দিয়ে তিনি দারুণ মাথা ঘামাতে লাগ্লেন—'হবার্ত্তাবা'? সংস্কৃত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এ শব্দ নাই। বার্ত্তা মানে তো সংবাদ কিন্তু 'হ...বা'র মাঝখানে পড়ে এতো বোধগম্য হবার বর্হিভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা?' হিপ্ত ছিল আশা হোলো হিপ্তাশা! কিন্তু হিপ্ত মানে কি? একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত? 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবন করা কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ'ই বা কি আর 'শকেডুয়ে...?'

পণ্ডিতমশাই অসুখের অজুহাতে তিন দিন ছুটি নিলেন—কিন্তু তিনদিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেল তবু ইস্কুলে তাঁর পদার্পণ নেই, তখনো তিনি শ্লোকটার কিনারা করে উঠ্তে পারেন নি। সেদিনও সকালে উদ্ভটকল্পতরু নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ কানে যেতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠ্লেন—কে যাচ্ছিস্ ওখান দিয়ে? টেটো?

—উঁহু।

—মান্কে নাকি? টেটোকে তামাক দিতে বল্ত। কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।

মানস বল্ল—টেটো এখন কোথায় টো টো করছে কে জানে।

—তবে তুই সাজ। গড়্গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্রলোচনকে ডেকে আন্ একবার।

—সে আস্বে না।

—বলিস্, মাভৈঃ। আমি অভয় দিয়েছি। কোনো ভয় নেই।

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগলে কিছু সুবিধা হবার আশা করেছিলেন কিন্তু ক্রমশঃই তাঁর কাছে সমস্ত ধোঁয়াটে ঠেকতে লাগ্ল। "আন্ডীবঃ অন্ডফ্রয়েণ" এ যে কি বস্তু তার রহস্য ভেদ করা দূরে থাক্ অনুমান করতেও তিনি অপারগ!

—এই যে ধূম্রলোচন, এসেছ? বাবা পদ্মলোচন, আর প্রণাম করতে হবে না, বোসো। তুমি কি শ্লোকটার অর্থ জানো? জানো না কি?

—জান্লে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার্?

—তাত বটে, তাত বটে। আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আন্ডীব, গান্ডীব নয়? গান্ডীব কথার অর্থ হয়;

গান্ডীবী মানে অর্জ্জুন, সব্যসাচী।

—কথাটা আন্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।

পণ্ডিত মশাই ঘন ঘন তামাক টান্‌তে লাগ্‌লেন,—সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও ভুল করো নি? তাই ত—তবে,—তাইত!

পদ্মলোচন চলে গেলে পণ্ডিতমশাই এবার বৃহৎ শব্দার্থসংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। মানস সাহস সঞ্চয় ক'রে বল্‌ল—আমি ওর একটা লাইনের মানে করতে পারি।

বাবা অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুল্লেন—কোন্ লাইনের?

—দ্বিতীয় লাইনের, যদি 'আন্ডীব'-এর জায়গায় হয় আন্ডিল আর 'শিবাঙ্গব'-এর জায়গায় হয় গবাংগব।

পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রইল না, তিনি মহোপাধ্যায় হ'য়ে হিম্ সিম্ খেয়ে গেলেন আর কিনা এই দুগ্ধপোষ্য বালক—মূঢ়তা দেখ! আগে হলে তিনি মেরেই বস্‌তেন, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা মজ্জমান লোকের মত, তাই কুটো হলেও মানসকে তিনি আশ্রয় করলেন।

—কি শুনি? মানস তথাপি ইতস্ততঃ করতে থাকে—বলব?

—বল্‌তেই ত বল্‌ছি।

—আন্ডিল! মানে এক আন্ডিল্, কিনা এক গাদা, অন্ডফ্রয়েণ অর্থাৎ অন্ড মানে ডিম্ব, ফ্রয়েণ মানে ফ্রাই করে অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে..., মানষ্টেটঃ মানষ্টেটঃ...

—ওইখানে ত আমারও আট্‌কাচ্ছে রে! পণ্ডিতমশাই বিজ্ঞের মত এক টিপ্ নস্য নিয়ে বল্লেন,—ওই মানষ্টেটই হলো মারাত্মক।

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি বাবা! মানষ্টেট...বলব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে, অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।

—বটে? গম্ভীরভাবে পন্ডিতমশাই বল্লেন—সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হোলো তবে?

—অর্থাৎ কিনা, এক গাদা ডিম ভেজে মানস আর টেট গবাংগবঃ—গব্ গব্ ক'রে গিল্‌ছে। বোধ হয় ও দেখেছিল।

পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লেন— কি? আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোদের এই জঘন্য কীর্ত্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস্? হংসডিম্ব কি কুক্কুটান্ড কে জানে!

বলেই তিনি মানসের পৃষ্ঠ-পোষকতার মৎলবে তাঁর পাদুকা উত্তোলন করলেন। মানস নিরাপদ ব্যবধানে স'রে গিয়ে বলল—ওই জন্যেই তো আমি বল্‌তে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল বলেই ত বল্লাম।

—মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল! এখন যে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হোলো, তার কি!

পণ্ডিত মশায়ের আস্ফালন কানে যেতেই পণ্ডিতগৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। তিনি যে ভাবে ও যে ভাষায় মানসের পক্ষ সমর্থন করলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে অন্ড-ফ্রয়েণের ব্যাপারে কেবল তার সহানুভূতিই নয়, দস্তুরমত সহযোগিতাও আছে। অগত্যা মানসকে মার্জ্জনা ক'রে দিয়ে পণ্ডিত মশাই আবার শ্লোকে মনোনিবেশ কর্‌তে বাধ্য হলেন।

ইস্কুল থেকে হেড্‌মাষ্টার মশাই লোক পাঠিয়েছিলেন, পণ্ডিত মশায়ের খবর নিতে। আটদিন হয়ে গেল, কেন তিনি ইস্কুলে আস্‌ছেন না—তাঁর কি হয়েছে?

পণ্ডিতমশাই উত্তর দিলেন—সমস্তই হয়েছে, কেবল বাকি আছে 'শকেডুয়ে'; ওইটা হলেই হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে হেড্‌মাষ্টার হতভম্ব! শ্লোকটার কথা তিনি কবে ভুলে গেছলেন; আর তাছাড়া সংস্কৃত তাঁর আদপেই মনে থাকে না— তা উপনিষদেরই কি আর পাঁজিরই কি! তিনি ভাব্‌লেন—পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেল না ত? কাল নিজে গিয়ে দেখ্‌তে হবে।

পরদিন পন্ডিতের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লেন, সদর দরজায় তালা লাগানো, তারই ওপরে ঝুলছে— To LET। পণ্ডিতের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেছেন কেউ জানে না, বাড়ীওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে, প্রতিবেশীদের কিছু না বলে রাতারাতিই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

পদ্মলোচন পোষ্টাপিস থেকে ফির্‌ছে, সরিতের সঙ্গে পথে দেখা হোলো। যত রাজ্যের খবরের কাগজ তার হাতে। সরিৎ বল্ল—আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েছিলি ভাই! পন্ডিত বেচারা পালিয়ে বাঁচ্‌ল।

পদ্মলোচন শুধু হাসে।

—দারুণ শ্লোক বাবা! পণ্ডিত মশাই একেবারে 'টজেগেণঃ'! লাভের আশা ত্যাগ করে উধাও হলেন!

পদ্মলোচন তবু হাসে।

—অবশ্যি মান্‌কে একটা মানে করেছিল বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করে ওটা বেঁধেছিস্।

পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না।—মান্‌কের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে!

উৎসুক হয়ে সরিৎ জিজ্ঞাসা করে—তবে আসল মানেটা কি ভাই? আমাদের বল্‌বিনে?

—মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে।

—ও তো সব খবরের কাগজ।

—আরে, এই নামগুলোই তো ওলোট্ পালট্ করে দিয়েছি! উল্টো দিক থেকে একটু এদিক ওদিকে করে পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, বঙ্গবাসী, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ আর ফ্রেন্ডস্ অব্ ইন্ডিয়া।

মাঘ-১৩৩৬

Adamas Knowledge City A Landmark Education Hub Under RICE GROUP

Adamas Knowledge City, Barasat, Barasat-Barrackpore Road, Barbaria, P.O.- Jagannathpur, Kolkata, Pin : 700126, Phone : 033-25241817

Adamas HIGHER SECONDARY MODEL SCHOOL
AFFILIATED TO W.B.C.H.S.E

Admission Details:
Enquiry - January 2014.
Registration forms will be distributed - Early February 2014, Monday to Friday (10:00 AM To 3:00 PM) from Adamas Knowledge City, Admin block.
Admission will be for XI (Science).
Eligibility for Admission Test - Passed or appearing class X under any board. Average of 75% in pre-board exam & 75% in Science Subjects.
Selection will be based on Written Test & Interview.
9836226110, 9830946062, 033 - 6540 0549 / 6541 3112.

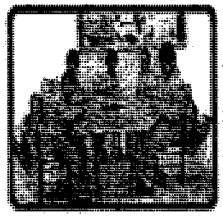

Adamas INTERNATIONAL SCHOOL Affiliated to ICSE & ISC, New Delhi.
The School is also an affiliate of the Cambridge International Primary Programme (CIPP).

Admission Details:
Enquiry - September 2013.
Admission forms will be distributed - End of October, Monday to Friday (9:00 AM To 12:00 Noon) from School Office.
Admission will be for Toddlers, Nursery, KG and for senior classes (if vacancies arise).
Selection will be based on Written Test & Verbal Interaction.
Age Group for Toddlers : 3+ as on 31st March of that year.
· For detailed information see the school notice board or log on to the school website www.adamas.co.in).

ADDRESS: 58,4 M. M. FEEDER ROAD, RATHTALA, BELGHARIA, KOL-700 056.
PHONE : (033) 2544 3401 / 02 / 03, 9830444749, 9830444759.

Adamas WORLD SCHOOL
A PROPOSED C.B.S.E SCHOOL

Admission Details:
Enquiry - September 2013.
Admission forms will be distributed - End of October 2013, Monday to Friday (10:00 AM To 3:00 PM) from Adamas Knowledge City, Admin block.
Admission will be for Toddlers, Nursery, KG and for senior classes (if vacancies arise).
Selection will be based on Written Test & Verbal Interaction.
Age - Toddlers : 3+ as on 31st March of that year.
033 - 6450 0503 / 6519 9978

Adamas Knowledge City A RICE GROUP initiative

সুখের চাকুরী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মনিব মিলেছে মোর মনের মতন,
বছর তিনের সে যে রমণী রতন।
ননীর শরীরে তার লাঠিমের লীলা,
বদনে চাঁদের আলো, কণ্ঠে কোকিলা।
সে যে হাসে খল্ খল্
সে যে নাচে থই থই,
তার চোখে ছোটে বিজলী,
মুখে ফোটে খই।
জবর জুটিল যে রে নোকরী নূতন,
বেতনের নাহি নাম, না মিলে ভোজন।
'উপরি' আছে চুমু, চলে শুধু তায়
কৃপণার ধন তাও, না হয় আদায়!
সে যে দাড়ি দেখে চটে,
সে যে থাকে চোখ বুঁজে
পড়ে শয্যায় লজ্জায়
মুখখানি গুঁজে।
কি করিতে হয় মোর, চাহ সে খবর?
সে বড় মাথার কাজ, ভার গুরুতর!
সুর অ-সুরের, তাল বে-তালের খেলা,
যে খেলেছে, সেই জন জানে তার ঠেলা!
আমি নাচি ধিন্ ধিন্,
আমি গাই তান ধ'রে
সে যে শোনে সুখে বসি
মোর শিরো'পরে!

শ্রীদাদা মশাই।

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(পৌষ-১৩২১)

পেটুক-ভজা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

কর্ত্তা। ওরে ভজা—ব্যাটা ঘুমুলি নাকি? ওরে ভজহরি—

ভজা। এঁজ্ঞে—

কর্ত্তা। শিগ্‌গীর আমার দুধ নিয়ে আয়—এক্ষুনি আবার বেরুতে হ'বে!

ভজা। এই যে বাবু দুধ ত' জ্বালই দিয়ে রেখেছি —

কর্ত্তা। জ্বালই দিয়ে রেখেছি!—এই তোর দুধ জ্বাল দেওয়া হ'য়েছে? আজ তোর একদিন, কি আমার একদিন—

ভজা। কেন বাবু, বেশ ত' ঘন সর পড়িয়ে রেখেছি। চিড়ে দিয়ে দিব্যি—

কর্ত্তা। বটে! তোকে একশ' দিন বলেছি না যে, আমার দুধ পাত্‌লা ক'রে জ্বাল দিয়ে রাখ্‌বি?

ভজা। আজ্ঞে কর্ত্তা, তা কি পারি? আপনি হ'লেন মনিব —আপনার দুধ হ'বে বটের আঁটার মতো ঘন। এ তো আমাদের নয়, আমাদের কি আর ও দুধ সইবে?

কর্ত্তা। ওরে বেটা! তোর সইবে না, অথচ তাই খেতে দিচ্ছিস্ আমাকে? তোকেই ও দুধ খেতে হবে।

ভজা। আজ্ঞে কর্ত্তা, ও কথা বল্‌বেন না। ও দুধ কি চাকরের পেটে সয়?

কর্ত্তা। (রাগিয়া) বল্‌ব না! বেটা বল্‌ব কি রে? হুকুম করবো। আমি বল্‌ছি—ও দুধ তোকে খেতেই হবে। বেটা আমাকে মেরে ফেলবার মতলব? খা—শিগগীর খা—! ওঠ!

ভজা। আজ্ঞে, যখন আপনি এত করে বল্‌ছেন, তখন খেতেই হবে। কিন্তু বাবু দোহাই আপনার! এর মধ্যে আর সরু চিঁড়ে দিতে বলবেন না।

কর্ত্তা। বল্‌ব না? বল্‌ব কি রে?—হুকুম করবো। ও দুধ তোকে চিড়ে দিয়েই খেতে হ'বে।

ভজা। আমার সর্ব্বনাশটা না করে আর ছাড়বেন না বাবু? চিড়ে দিয়ে ঐ সর-পড়া দুধ খেলে কি আমি আর প্রাণে বাঁচবো?

কর্ত্তা। ব্যাটা, এখন ন্যাকামো হ'চ্ছে? প্রাণে বাঁচবো না! তবে আমায় কি মনে করে ঐ দুধ খেতে দিয়েছিলি শুনি! আমি বল্‌ছি—তোকে খেতেই হ'বে।

ভজা। আজ্ঞে কর্ত্তা, আপনি মুনিব। আপনি যদি হুকুম করেন ত' মরি বাঁচি আমায় খেতেই হ'বে। কিন্তু দোহাই আপনার। ওতে পাকা মর্ত্তমান কলা দিলে আমি একেবারে গেছি—

কর্ত্তা। কী! আমার সঙ্গে চালাকি? পাকা মর্ত্তমান কলা ওতে পুরো একটি গণ্ডা মাখ্‌তে হ'বেই।

ভজা। (ক্রন্দন) হুজুর তা হ'লে আমি আর প্রাণে বাঁচলাম না, দোহাই হুজুর! না হয় আমার দেশে একবার খবর পাঠান—ছেলেপুলেকে একবার শেষ দেখা দেখে যাই! ওহো—হো—! আমি গেলে তাদের কি দশা হ'বে হুজুর? আজ আমি সত্যি মরলাম!

কর্ত্তা। মরবি বেটা মর্। আমায় যখন ঐ দুধ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে চেয়েছিলি, তখন তোর মরা-কান্না ছিল কোথায়?

ভজা। হুজুর মনিব। মনিবের কথায় প্রাণ দেওয়া আমার ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস। যখন হুকুম করেছেন—মরি বাঁচি একবার খেয়েই দেখ্‌ব। কিন্তু দোহাই আপনার, মরবার সময় আমায় আর যন্ত্রণা দেবেন না! যদি ফের এর মধ্যে দোবারা চিনি দিতে বলেন ত' ব্রহ্মার ভাই বিষ্ণু এসেও আমায় বাঁচাতে পার্ব্বে না।

কর্ত্তা। খুব যে ব্যাটা ব্রহ্মা-বিষ্ণু শোনাচ্ছিস। দোবারা চিনি যদি ওতে না দি' ত আমার নাম কৈলাশ বাঁড়ুয্যেই নয়।

ভজা। ওহো—হো—! বিদেশে বিভূঁয়ে আমার প্রাণটা বুঝি এমনি করেই বেরিয়ে গেল। কর্ত্তা, আপনি এক্ষুনি আমার দেশে একখানা তার করে দিন—খোকার মা আর খোকা এসে একবার শেষ দেখা দেখে যাক্—। হায় হায় হায়—কি কুক্ষণে

আজ দুধ জ্বাল দিতে বসেছিলাম।

কর্ত্তা। বেটা দুধ জ্বাল দেবার সময় এ সুবুদ্ধি তোর ছিল কোথায়? যা-যা বল্লুম সব দিয়েই তোকে এই একবাটী দুধ আমার সমুখে বসে খেতে হবে।

ভজা। (ক্রন্দন)—বাবু, এদ্দিন আপনার গোলামী করলুম, কিন্তু কখনো এমন শাস্তি আপনি দেন নি। হুজুর বল্‌লে কি সে কথা আমি অমান্য করতে পারি? কিন্তু মরবার আগে আপনার পায়ে ধরে শুধু বল্‌ছি—এর পরও যেন আর এতে আমসত্ত্ব দিতে বল্‌বেন না—তা'হলে নির্ঘাত আজ যম আমার শিয়রে, কেউ আর আমায় ফেরাতে পারবে না যে, —ওহো—হো—

কর্ত্তা। কি যমের নাম করে আমায় ভয় দেখাচ্ছিস? ও আমসত্ত্বও বাদ যাবে না—! মেজখুড়ি পাঠিয়েছে দেশ থেকে। অসুখের ভয়ে একটুকরোও মুখে দিইনি, সেটা—

ভজা। ওহো—হো—! তবে ত' আমি আর নেই! একে ঘন দুধ, তার ওপর সরু চিড়ে, তার ওপর একগন্ডা মর্ত্তমান, তার ওপর দোবারা চিনি, আবার সবার ওপর আমসত্ত্ব! —বাবু বাবু! আমি গেলে আমার ছেলেপুলের সব ভার আপনি নেবেন! নইলে তারা একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে!

কর্ত্তা। ব্যাটা! আমার সঙ্গে চালাকি? আমি আজ নিজে চল্লুম বাজারে—সব কিনে নিয়ে আসব—আমার নাম কৈলাশ বাঁড়ুয্যে! (দ্রুত প্রস্থান)

ভজা। (ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া গান ধরিল)—

আজি মোর খুল্‌ল বরাত—খুল্‌ল বরাত—বরাত ক্রমে!
বটের মতন সরেশ দুধে—ধীর বাতাসে সর যে জমে!
সাথে তার মর্ত্তমান আর—
মর্ত্ত হ'বে স্বর্গ আমার—
দোবারায় খুল্‌বে বাহার, জম্‌বে আহার বাবুর ভ্রমে!
যদি আমসত্ত্ব মেলে, সর্ত্ত করে থাক্‌বো গোলাম্!
মুখের পরে পড়লে ওটা মখ্‌মলেরও চাইতে মোলাম্!
আজি প্রাণ রয় না বসে
বদন আমার ভরল রসে
হাসি আজ রাখ্‌তে নারি—রাখতে নারি—বরাত ক্রমে,
সর যে জমে!

(পৌষ-১৩৩৯)

একশো বছরের ঐতিহ্যবাহী

সন্দেশ-এর সঙ্গে আছি

সুখচর পঞ্চম

ঠেকে শেখা

শ্রীসুবিমল রায়

একজন ভদ্রলোকের একটা বদ্ অভ্যাস ছিল; তিনি রোজ আফিসে যেতে দেরী কর্তেন। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে বিছানা থেকে সহজে উঠ্তে চাইতেন না। এক ঘন্টা কেবল এপাশ ওপাশ করতেন, তারপর গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে কুড়ি মিনিট কেবল হাই তুলতেন। কোন কোন দিন এত দেরীতে উঠ্তেন যে, স্নান করবার সময় পেতেন না, কোন মতে চারটি ভাত মুখে গুঁজে আফিসে দৌড়াতেন। তার জন্য ভদ্রলোকের শরীরও খারাপ হচ্ছিল, আফিসের কাজেরও ক্ষতি হচ্ছিল, কিন্তু তিনি তবু ঘুম থেকে উঠ্তে দেরী করতেন।

একদিন তিনি উঠে দেখেন যে, ভাত খাবার আর সময় নাই, আফিসে যাবার বেলা হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পথের একটা দোকান থেকে কয়েকটা কচুরি আর একটা রসগোল্লা কিনে নিয়ে, তাই খেতে খেতে আফিসের দিকে ছুট্ দিলেন। একটু দূর যেতেই একটা চীল ছোঁ মেরে কচুরির ঠোঙাটি নিয়ে গেল; তিনি একরকম না খেয়েই আফিসে গেলেন। আফিসে গিয়েই তাঁর মনে হ'ল—ঐ যা! তিনি কচুরিওয়ালাকে একটা টাকা দিয়েছিলেন, খাবারের দাম ত হয়েছিল মোটে ছয় পয়সা, কিন্তু আফিসে যাওয়ার তাড়ায় বাকী পয়সা ত ফেরত নেওয়া হয়নি! সুতরাং ভদ্রলোকের খাওয়াও হ'ল না, অথচ টাকাও গেল—অচেনা দোকানদার টাকার কথা কিছুতেই স্বীকার কর্ল না। তিনি সেদিন ঠিক কর্লেন যে আর ঘুম থেকে উঠ্তে দেরী কর্বেন না।

কিন্তু পরদিনও তিনি উঠ্তে এত দেরী কর্লেন যে, ভাত খাবার আর সময় পেলেন না, তাড়াতাড়ি শুধু একটু দৈ খেয়ে আফিসে ছুট্লেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একটা ষাঁড়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে, তিনি রাস্তায় পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুটতে লাগ্লেন। খানিকদূর গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখ্তে পেলেন। তিনি ভাব্লেন যে গাড়ীতে গেলে অল্প সময়ের ভিতর আফিসে পৌঁছাতে পারবেন, তাই ছুটে গাড়ী ধর্তে গেলেন। কিন্তু গাড়ী ধরবার আগেই একটা আমের খোসায় পা পড়াতে পা পিছ্লিয়ে গেল। নিজেকে সামলাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি পাশের একজন কাবুলীওয়ালার জামা খাম্চিয়ে ধরলেন। হঠাৎ জামায় টান পড়াতে কাবুলীওয়ালা একপাশে কাৎ হয়ে পড়্ল আর নিজেকে বাঁচাবার জন্য পাশের এক পুলিশের পাগড়ীতে খাম্চিয়ে ধর্ল। পুলিশের মাথা থেকে পাগ্ড়ী তখনি খুলে এল, তাই কাবুলীওয়ালা সেই ভদ্রলোকের উপর প'ড়ে গেল। ভদ্রলোকটি কাদাটাদা মেখে অনেক কষ্টে উঠে, কাবুলী আর পুলিসকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে একটা গাড়ী ধর্লেন। ততক্ষণে আফিসে যাবার সময় অনেকক্ষণ হ'ল পার হ'য়ে গিয়েছে।

গাড়ী আফিসের কাছে এসে থামবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামতে গিয়েছেন, আর অমনি গাড়ীর দরজার এক পেরেকে জামার পকেট আট্কিয়ে গিয়ে, প্রায় আধ হাত জামা ফ্যাঁস্ ক'রে ছিঁড়ে গেল। তারপর গাড়োয়ানকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখেন যে তাড়াতাড়িতে পয়সার ব্যাগ্ বাড়ীতে ফেলে এসেছেন। তারপর আফিসে যেই ঢুকেছেন অমনি আফিসের লোকেরা তাঁকে দেখেই 'একি মশাই! একি ক'রেছেন!' বলে চীৎকার ক'রে উঠেছে। তিনি ব্যাপার বুঝ্তে না পেরে আয়নার সাম্নে গিয়ে দেখেন যে, বাড়ী থেকে দৈ খেয়ে আসবার সময় তাড়াতাড়িতে ভাল ক'রে মুখ মুছতে পারেন নি, তাই সমস্ত দাড়িতে আর গোঁফে দৈ লেগে রয়েছে। নিজের দই মাখা চেহারা দেখে সেদিনই তিনি প্রতিজ্ঞা কর্লেন যে, আর কখনও ঘুম থেকে উঠ্তে দেরী কর্বেন না। তখন থেকে তিনি প্রতিদিন সকালে উঠ্তেন আর আফিসে যেতেও দেরী হ'ত না।

(আষাঢ়-১৩২৬)

বর্ণপরিচয়

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার

স্বরবর্ণ

অ আ দুভাই অজ বেয়াকুব
আসল কুঁড়ের ধাড়ি
গোঁফ দাড়ী সব পাক্‌লো তবু
বগলে পাত্‌তাড়ি!

হ্রস্ব ই সে ইস্কুলেতে
ইংরাজি কয় তেড়ে
দীর্ঘ ঈ কয় "ঈস্! কি গরম"
রুমাল খালি নেড়ে।

(হ্রস্ব) উ পালের গোদা
ডালের উপর থাকে,
(দীর্ঘ) ঊ 'ঊকু' 'ঊকু'
ঊল্‌লুক-ডাক ডাকে।

ঋ ৯ দুভাই ভিজে বেড়াল
ঋষির মত সাজ
পরের গাছে ৯চু চুরি
করতে না হয় লাজ!

এ ঐ এল চোর ধরতে
এইসা লাঠি ঘাড়ে
মুখ শুকালো, ভয়েতে ঐ
লুকায় পুকুর পাড়ে।

ও ঔ দুই টুকটুকে বৌ
ওরাই ঘরের আলো
ও ঘর থেকে ঔষধ এনে
আমার টাকে ঢালো।

(বৈশাখ- ১৩২৩)

খুকির নাম

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

দিদির এক খুকি হয়েছে; বয়েস তা'র সাতদিন হ'তে চল্‌লো।

বাড়ীতে খুকী নামের আর একটি যে মানুষ আছে, তা'র বয়েস তেরো, গোখ্‌লে মেমোরিয়েলে সে পড়ে। সে বল্‌লে, 'তোমরা আর কেউ ওকে খুকি বল্‌তে পারবে না—এখন থেকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে শেষটায় ওর নাম খুকিই হ'য়ে যাবে। খুকি —কী ভীষণ হোপ্‌লেস্‌ নাম!'

তা'র নিজের খুকি নামের বিরুদ্ধে যে বড় হ'য়ে অবধি প্রাণপণে প্রতিবাদ ক'রে এসেছে, ফল হয়নি কোনো। তা'র যে আর একটা নাম আছে, আভা, তা যেন ভুলে'ই গেছে সবাই; সব চেয়ে ভুলেছেন তাঁরা, যাঁরা ও-নাম রেখেছিলেন। অবিশ্যি আভা নামটাও যে তা'র খুব পছন্দ হয়, তা নয়—আভা, কেমন যেন সেকেলে গন্ধ! মানুষ কেন বড় হ'য়ে তা'র নিজের নাম বদ্‌লে রাখ্‌তে পারে না ইচ্ছেমত!

যা-ই হোক্‌, নিজের নাম তো যা হবার হয়েছে, এখন দিদির মেয়েকে নিয়ে ভাবনা। বাড়ীর লোকগুলো এমন—হয়-তো ওর নাম সুরমা কি বিমলাই রেখে বস্‌লো!

আভা—আমরা তাকে আভাই বল্‌বো—মনে-মনে যুদ্ধঘোষণা কর্‌লে বাড়ীর লোকের বিরুদ্ধে। বল্‌লে, 'আমি রাখ্‌বো খুকির নাম'।

কোত্থেকে মাণিক বলে উঠ্‌লো ফট্‌ ক'রে, 'তা হ'লেই হয়েছে!'

মাণিক দস্তুরমত বড় হয়েছে; বালিগঞ্জ ইস্কুল থেকে সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে সাম্‌নের বার। আভাকে সে মনে-মনে জানে ছেলেমানুষ।

আভা মনে-মনে জানে তা'র ছোড়্‌দা, এই মাণিক নির্ব্বুদ্ধিতার একটি গৌরীশঙ্কর। সে ভুরু বাঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, 'তুই এ-সব বিষয়ে কথা বলতে আসিস কেন? যা, ফুটবল খেল্‌ গে।'

মাণিক সে-কথা কিছুমাত্র গায়ে মাখ্‌লে না; একজন শিশু কি বলে আর না বলে, তা আমরা আমলেই আনি নে। সে গম্ভীরমুখে বল্‌লে, 'আমি একটা চমৎকার নাম ভেবে রেখেছি খুকির জন্য।'

আভা বেণী দুলিয়ে বল্‌লে, 'হ্যাঁঃ, তোর আবার চমৎকার!'

'দেখ্‌বি?'

'কী আর দেখ্‌বো! পারুলবালা কি সুরকুমারী কি কনকলতা কি ঐ গোছের একটা হবে আর কি! তোর যা!'

'আর তোর যত বীণা আর মীরা আর ললিতা আর লতিকা—তা-ই খুব ভালো তো? এক-একটা নাম শুন্‌লে ইচ্ছে করে ম'রে যাই।'

'ওমা', আভা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো, 'আমি বুঝি তাই বল্‌তে যাচ্ছি! ও-সব নাম তো আজকাল একেবারে প'চে গেছে।'

মাণিক বল্‌লে, 'আমি যা একটা ভেবেছি, তা একেবারে আশ্চর্য্য! তাক্‌ লেগে যাবে তোর শুন্‌লে।'

'ছাই! হতো যদি কুকুরের নাম, তা হ'লে অবিশ্যি তুই—'

'বেশি তড়্‌বড়্‌ করিস্‌ নে— বুঝলি? এ-সব পুতুলের নাম রাখা নয়, মনে রাখিস্‌।'

পুতুলের কথা তোলায় আভা ভীষণ অপমানিত হলো। হবারই কথা; বেশিদিন নয়, সে পুতুলখেলা ছেড়েছে, সেইজন্য এখন তা'র চোখে ও-সব ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষি। লাল হ'য়ে উঠে সে বল্‌লে, 'আর তুই তো সেদিনও লাট্টু ঘোরাতিস বোঁ-বোঁ ক'রে। আর মার্বেল ভেঙ্গে ফেলে যে দু' ঘন্টা কেঁদেছিলি ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ ক'রে, মনে নেই?'

'যা-যাঃ, অঙ্কে লাড্ডু পাস্‌ আবার কথা বল্‌তে আসিস্‌!'

'আর তুই যে একদিন জিওগ্রাফির ক্লাসে দাঁড়িয়ে ছিলি

বেঞ্চের উপর—জানিনে বুঝি!'

'ভাগ্ এখান থেকে রাক্ষুসি।'

'তুই তো কুলির দলের সর্দ্দার, জন্মে সাবান মাখ্‌বি নি গায়ে।'

আলাপের বিষয়টা ক্রমেই খুকির নাম থেকে দূরে স'রে পড়্‌ছিলো; এবং আরো নানারকম সব কথা উঠ্‌তে পার্‌তো, যা শুন্‌তে মোটেও ভাল নয়—এমন কি, কথা-কাটাকাটি থেমে গিয়ে খানিকটা হাতাহাতিও হ'তে পার্‌তো, যদি না ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আভা হঠাৎ আবিষ্কার কর্‌তো যে এক্ষুনি স্নান কর্‌তে না গেলে সে ইস্কুলের বাস্ ফেল কর্‌বে।

*　　*　　*　　*

কমল, ওদের মেজ-দা, এবার সেকেন্ড্ ইয়ারে উঠ্‌লো; মাসিকপত্রে তা'র কবিতা বেরোয়। সম্প্রতি সে চুলের চর্চ্চা কর্‌ছে; আর চাদর জড়াচ্ছে অগোছাল ক'রে—যেন এক্ষুনি খ'সে পড়্‌বে গা থেকে।

সে বল্‌লে, 'খুকির নামের জন্য ভাবনা কী, রবীন্দ্রনাথকে আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি একটা নামের জন্য।' সে একবার তা'র অটোগ্রাফের খাতায় দু'লাইন পদ্য লিখিয়ে এনেছিলো রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে; আর-একবার এম্পায়ারে কী-এক পালা হচ্ছিলো, ভাঙ্‌বার সময় সে দাঁড়িয়ে ছিলো দরজার এক পাশে, রবীন্দ্রনাথ কাছে আস্‌তেই টিপ্ করে' এক প্রণাম করেছিলো আর তিনি তাকে বলেছিলেন, 'ভালো আছো?' সেই থেকে—তা'র কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা তুল্‌তে কেউ যেন আর সাহস না পায়!

আভা ঠোঁটের একটা ভঙ্গী ক'রে বল্‌লো, 'রবিবাবুর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তিনি গেছেন তোমার ভাগ্‌নির নাম কর্‌তে!'

'আন্দাজে বকবক করিস্ নে।' কমল দিলে এক ধমক, 'জানিস্, উনি কত ছেলেমেয়ের নাম রেখে দিয়েছেন! আমি চিঠি লিখ্‌লে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন একটা নাম।'

'তা কেন? আমরা নিজেরা বুঝি একটা নামও বা'র কর্‌তে পারি নে ভেবে।'

'করো তোমাদের যা খুসি, কমল গম্ভীর হ'য়ে গেলো, 'ভালো কথা বল্‌লে তো শুন্‌বে না।'

'এমন একটা নাম চাই', আভা বল্‌লে, 'যা এর আগে কেউ কখনো শোনে নি। যা এক্কেবারে নতুন।'

'সেইজন্যই তো বল্‌ছিলুম, রবীন্দ্রনাথকে লিখি। তাঁর অত বড় প্রতিভা, তিনি কোত্থেকে একটা আশ্চর্য্য নাম খুঁজে বা'র কর্‌বেন, দেখ্‌বি হাঁ হ'য়ে যাবি তোরা সবাই। আর তাঁর দেওয়া নাম—এ কি কম ভাগ্যের কথা! খুকি বড় হ'য়ে লোককে বল্‌তে পার্‌বে না!'

'ভারি তো!' রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আভার মনে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। সে শুধু জান্‌তো, রবিবাবু বুড়ো গোছের এক ভদ্রলোক, যিনি অনেক গান তৈরি করেছেন, আর যাঁর হাতের লেখা অনেকটা তা'র দাদার লেখার মত। তাই, 'ভারি তো!' সে বল্‌লে।

কমল কিন্তু মর্ম্মাহত হলো। 'তোমরা যা খুসি করো', অমাবস্যার মত মুখ ক'রে সে বল্‌লে, 'আমাকে কেন ডেকেছো এর মধ্যে?'

সত্যি বল্‌তে, কেউ তা'কে ডাকে নি। আভা একবার রঙিন পেন্সিল দিয়ে একটা নদী আঁকবার চেষ্টা করেছিলো; মেজ-দা তা দেখে বলেছিলো 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে মাঠটা।' সেই থেকে মেজ-দার বুদ্ধিসুদ্ধির উপর আভার কোনো আস্থা ছিলো না।

আভা বল্‌লে, 'আহা, রাগ করো কেন?' ইস্কুলে তা'র সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু মীরার সঙ্গে দু'দিন তা'র কথা বন্ধ ছিলো, আজ ঝগড়া শেষ হয়েছে—তা'রা প্রতিজ্ঞা করেছে, আর কক্‌খনো কক্‌খনো...

থাক্ সে-কথা। মোট কথা, সেই কারণে আভার মেজাজটা ভালো ছিলো; সে বল্‌লে, 'এসো সবাই মিলে একটা নাম ঠিক করা যাক্।' অবিশ্যি তা'র মনে-মনে সন্দেহ ছিলো না যে সে যা বল্‌বে, সেটাই সব চাইতে ভালো হবে, এবং সেটা মেনেও নেবে আর সবাই। 'মাণিক, তুই আগে বল্।'

মাণিক ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌লো, 'আমাকে তেম্‌নি বোকা পেয়েছিস্ কিনা! আগে ব'লে দিই, আর তুই তক্ষুনি সেটা নিয়ে নে! বল্‌লেই হলো—আমিও ওটাই ভেবেছিলুম।'

আভা একবার তাকালো মাণিকের দিকে—এমনভাবে, যেন তা'কে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে। তারপর শান্তভাবেই বল্‌লে, 'আচ্ছা, চঞ্চুলিকা কেমন নাম?'

কমল বল্‌লে, 'চঞ্চুলিকা—তা'র মানে কী?' আর মাণিক উঠ্‌লো হেসে; 'চঞ্চুলিকা—হাঃ-হাঃ! তা'র চাইতে গড্ডলিকা

কি অট্টালিকা রাখ্ না কেন?'

'কি, ধর্', কমল এবার তা'র প্রতিশোধ নিলে, 'করকমলিকা, কি শ্যামকদলিকা, কি নীলোৎপলিকা?'

আভা একেবারে নিবে গেলো। সে কাঁদ্বে না ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে, না মা-র কাছে গিয়ে নালিশ কর্বে, খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্তে পার্লে না। এমন যে হবে, সে কখনো ভাব্তেও পারেনি। অবিশ্যি চঞ্চুলিকার চেয়ে অনেক ভালো নাম ছিলো তা'র মনে, তবে সে সেগুলো বল্বে, না খুকিকে ফেলে রাখ্বে তা'র অদৃষ্টের হাতে?—না বলাই বোধ হয় ভালো। ছেলেরা, সে বরাবর লক্ষ্য করেছে, এক-একটি জন্তুবিশেষ; কোনো কথা যদি তা'দের কাছে বলা যায়।

কমল একটু ভেবে বল্লে, 'আমার তো মনে হয় বনশ্রী নামটি বেশ মিষ্টি।'

আভা ফস্ ক'রে ব'লে উঠ্লো, 'ভারি একটা বল্লে! বল্লেই বিশ্রী আর মিছ্রি মনে পড়ে।'

কমল বল্লে, 'তা হ'লে, ধর্, জয়তী।'

'ওমা, জয়তী যে আমাদের ক্লাশের একজন মেয়ে আছে।'

'এমন নাম তুই কোথায় পাবি, যা আর একজনেরও নেই? বাঙ্লা দেশের সব মেয়ের নামই তুই জানিস্ নাকি?'

'বয়ে গেছে জান্তে। বেশির ভাগ মেয়ের নামই তো রমা আর ছায়া আর মায়া আর বেলা আর রেবা আর বীণা আর লীলা। এমন নাম সহজেই বা'র করা যায়, যা আর কারো নেই।'

'তুই-ই বল্।'

'আমি বল্ছি', মাণিক হঠাৎ ব'লে উঠ্লো, 'সোনালি'।

'সোনালি! এ আবার নাম হয় কবে!'

এবার আভার পালা হাসবার।—'তার চেয়ে বল্ না চৈতালি কি হরিতালি কি করতালি। রূপালি কি তামালিই বা মন্দ কী?'

'কেন হবে না', মাণিক তীব্রস্বরে বল্লে, 'তোমাদের রবিবাবু যদি পদ্যে লিখতে পারেন খেয়ালী আর কাকলি আর ঝামরী—তা হ'লে সোনালিই বা হবে না কেন?'

'দ্যাখ্ বোকারাম', কমল তক্ষুনি ব'লে উঠ্লো, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তুই কিছু বলিস্ নে। চুপ ক'রে থাক।'

'ভারি সব দিগ্গজ পন্ডিত এসেছেন এক-একজন। আমি, দেখে নিয়ো, ওকে সোনালি বলেই ডাক্বো।'

'তুই মহাকালী ব'লে ডাক্লেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওর নাম হবে মঞ্জুভাষা।'

কমল বল্লে, 'ভারি বল্লি। সবাই ডাক্বে তো মঞ্জু ব'লে, আর মঞ্জু নামের হাজারখানেক মেয়ে বোধ হয় আছে দেশে।'

'তাও তো বটে! তা হ'লে রাগিণী—'

'দূর', মাণিক বল্লে, 'শুনলেই মনে হয় রেগে আছে।'

'বিম্ববতীটা কেমন? বেশ গম্ভীর আওয়াজ।'

'ঠিক জাম্বুবতীর মত।'

'দ্যাখ্ মাণিক, তুই যদি সব সময় ও-রকম ফাজ্লেমি কর্বি—'

'হ্যাঁ, ফাজ্লেমিই তো! আর তোমরা যখন করো, খুব ভালো।'

'তুই এখান থেকে যা।'

'কক্ষনো যাবো না।'

'নিশ্চয়ই যাবি।'

'ইস্! তোর কথায় নাকি?'

আচ্ছা, যা'র কথায় যাবি, তাকে ডাক্ছি।' আভা চ্যাঁচাতে আরম্ভ কর্লে, 'মা, মা—'

পাশের ঘর থেকে মা এলেন।—'কী হয়েছে?'

'দ্যাখো তো, মা, মাণিকটা কি কর্ছে।'

'কী করেছিস্ তুই, মাণিক?'

'কী আবার কর্বো!'

'তোরা জট্লা বেঁধে এখানে কর্ছিস্ কী? পড়াশুনো নেই কারো?'

আভা তাড়াতাড়ি বল্লে, 'খুকির একটা নাম ঠিক কর্ছিলুম, মা।'

'খুকির নাম? খুকির নাম আমি সীতা রাখ্বো। তোরা যা-ই বলিস, সীতার মত মিষ্টি নাম কি আর আছে।'

আকাশ ভেঙে পড়্লো আভার মাথায়। 'কিন্তু, মা, ওতো একটুও আজকালকার মত হলো না। ছি, ছি, ও-নাম তুমি কিছুতেই রাখ্তে পার্বে না।'

মাণিক সুযোগ পেয়ে বল্লে, 'কেন আমার তো বেশ ভালোই লাগ্ছে।'

আভা ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠ্লো, 'ইস্, ওর আবার

একটা ভালো লাগা!'

'থাক্, এখন আর তোদের এ নিয়ে ঝগড়া কর্‌তে হবে না', ব'লে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আভা খানিকক্ষণ ব'সে রইলো হতভম্ব হ'য়ে। শেষটায়, সীতা! আভার সব চেয়ে সখের শাড়ীটা কেউ কেড়ে নিলেও সে এর চেয়ে দুঃখিত হ'তে পার্‌তো না। তারপর সে ভাব্‌লে, মা বল্‌লেন আর অম্‌নি সবাই নামটা মেনে নিলে, তা'র তো কোনো মানে নেই। যে নামটা সব চেয়ে সুন্দর, সেটাই শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌বে। তখন সে বল্‌লে, 'আচ্ছা মেজ-দা, দীপা নামটা কারো আছে বলে জানো?

কমল একটু ভেবে বল্‌লে, 'কই, মনে তো পড়্‌ছে না।'

মাণিক বল্‌লে, 'ও-নামে কি কেউ কাউকে ডাক্‌তে পারে? ডাকবার জন্যে দেখ্‌বি ঝন্টু কি হাসি কি ছবি ঐ গোছের একটা নামই হবে।'

আভা ক্লান্তসুরে বল্‌লে, 'তা-ই যদি হয়, তা হ'লে এত ভেবে-চিন্তে নাম রাখাই বা কেন? একটা বিশ্রী, বিদ্‌ঘুটে নামে না ডাক্‌লে কারো যদি ভালো না লাগে—'

'দ্যাখ্', কমল হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, 'নাম তো ডাকবারই জন্যে। ডাক্‌তে সুবিধে, এমন নামই ভালো। আর তেমন একটা অসাধারণ নাম তুই পাবিই বা কোথায়? আমি বলি কী, বেশ ছোট-খাটো একটা মিষ্টি নাম রাখা যাক।'

'যেমন?'

'যেমন ধর্ কমলা'

'ক্ষেপেছো? আমাদের অঙ্কের টিচারের নাম কমলা—আর তাঁর যা মেজাজ।'

মাণিক বল্‌লে, 'অরুণা তো বেশ নাম।'

'না, না, অরুণা-বরুণা-তরুণা ও-সবের কাজ নয়। শুন্‌লেই মনে হয় নভেল।'

'মালতী?' কমল বল্‌লে, 'বেশ ঠান্ডা নাম।'

'কচু! ঐ তো ও-বাড়ীতে এক মালতী আছে—কী বিশ্রী দেখ্‌তে।'

'রাণী? যে যা-ই বলুক্, রাণীর মত নাম আর নেই।'

'ঐ একটা নাম শুন্‌লেই আমার গা জ্বালা করে। যদি ওর নাম ঊর্ম্মিলাও হ'তে হয়, তবুও রাণী নয়।'

'ঊর্ম্মিলাই বা মন্দ কী, ডাক্‌বে ঊর্ম্মি ব'লে।

'নাঃ', আভা হতাশভাবে মাথা-ঝাঁকুনি দিলে, 'এমন বিপদে কে কবে পড়েছে! একটা নাম পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে!'

'দ্যাখ্, নাম একটা হ'লেই হয়। শুন্‌তে-শুন্‌তে, ডাক্‌তে-ডাক্‌তে সব নামই মিষ্ট শোনায়।'

'নাম রাখো সুধা,' মাণিক অনেকক্ষণ পরে বল্‌লে, 'শুন্‌লেই মনে হয় লক্ষ্মী মেয়ে।'

'মনে হয় ছিঁচ্‌কাদুনে।'

'না-হয় নিরুপমা—একটু সেকেলে অবিশ্যি, কিন্তু বেশ—মোটেও ফাজিল গোছের নয়।'

'কী-রকম যেন মোটা-মোটা নামটা।'

'নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেলোনা। তোর যা খুসি রাখ্, আমরা হার মান্‌লুম।'

আভা চুপচাপ খানিকক্ষণ ভাবলো—প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা কর্‌লো। তা'র নীচের ঠোঁটটা কাম্‌ড়ে-কাম্‌ড়ে সে আর কিছু রাখ্‌লে না, ঘাম দেখা দিল কপালে।

* * * *

ঘন্টা দুই পরে আভা তা'র দিদির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

'কী রে?'

'দিদি, তোমার খুকির জন্য একটা নাম...।'

'কী, বল্?'

'বনশ্রী। চমৎকার নাম—না? আর একেবারে নতুন।'

'চমৎকার। এ নিয়ে পাঁচটা হলো।'

'পাঁচটা?'

'হ্যাঁ—মা বলেছেন সীতা, বাবা বলেছেন মৃন্ময়ী, কমল—'

'মেজ-দা?'

'হ্যাঁ — কখন্ বল্‌লে?'

'এই তো একটু একটু আগে এসে বলে' গেলো। আর মাণিক —'

'মাণিক কী বলেছে?'

'মাণিক বলেছে রাগিণী। তোরা সবাই মিলে ওর নাম রাখ্‌ছিস্, আর খুকি এদিকে কী সুন্দর হাস্‌ছে, দ্যাখ্। দুষ্টু মেয়ে, এখনই এত হাস্‌তে শিখেছে। এই খুকি, খুকি — তোমার মাসি এসেছে, খুকি। খুকি, তোমার মাসিকে একটু হাসি দেখিয়ে দাও তো।'

(আশ্বিন-১৩৪০)

পেঁচা কেন নিশাচর

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

এক সময় পাখীরা মস্ত একটা মিটিং করে ঠিক করল তাদের মধ্যে একজনের রাজা হওয়া নিতান্ত দরকার, নয়ত আইন কানুন কিছুই নেই, বড়ই বে-বন্দোবস্ত, যা'র মন যা চায় তাই করে—ঝগড়া ঝাঁটি বচসা লড়াই লেগেই আছে। চড়াই, শালিখ, কাক, কোকিল, কাঠ-ঠোক্‌রা, হাঁড়ি-চাঁচা. মাছরাঙা, কা'র নাম করি? সবাই সমান।

সভায় ঠিক্ হ'ল সবাইকে আপন আপন বুদ্ধি-বল ও দেহ-বল দুয়েরি পরীক্ষা দিতে হবে, তার পর যিনি সবারই উপর জয়ী হবেন তাঁকেই রাজা করা হবে।

পেঁচা-রামের যেমন বা হাঁড়ী-মুখ, গোল গোল চোখ, নাকটি চেপটা, গম্ভীর মূর্ত্তি—তাঁকেই লড়াই-এর জজীয়তী করার অনুরোধ করা হ'ল; তিনিও রাজী হয়ে ডানা ঝাপটে চলে গেলেন। ডানা ঝাপটান হাত তালির সামিল, তাই দেখে সবাই ডানা নেড়ে সোরগোল করে সাধুবাদ দিয়ে সভা ভঙ্গ করল।

লড়াইএর দিনটি হ'ল চমৎকার,—আকাশে মেঘ নেই, চারিদিক রোদে জমকাল, একেবারে ঝলমল করছে। পাখী-পকালি যে যেখানে ছিল, মাঠে, ক্ষেতে, পুকুর পাড়ে, বনে জঙ্গলে, নদীর জলে, কিনারায়—সবাই সত্বর এসে সভায় হাজির হ'য়ে গেল। সে কি একটা আধটা? —হাজারে হাজারে। তবে একটা কথা বল্‌তেই হবে, সভায় তারা সবাই সভ্য ভব্য হয়ে বসে ছিল; আঁচড়া-আঁচড়ি, ঝগড়া-ঝগড়ি করেনি।

সবারি আগে এল ভরত-পক্ষী, সে খুব ভোরে ভগবানের নাম গান গায়, কারো সাতে পাঁচে থাকে না; তারপর এল কাক,—বাকচতুর; অতঃপর একটু যেতে না যেতেই গম্ভীর-মূর্ত্তি লাল পোষাক-পরা মার্কিন দেশের ধার্ম্মিক পাখী, (যার ইংরাজী নাম Cardinal Bird); কিছু পরে সবুজ-পোষাক, রাঙা চেপটা-নাক তোতা;—এরাই ক'জন সকাল সকাল ওঠে। তার পরে এল মুর্গি-ছানা, বেচারী বেশী উঁচুতে উড়তে পারে না, তবুও পড়ি মরি করে এসে উপস্থিত। সব্বাই এলো—দয়েল, শ্যামা, কোয়েল, 'চোখ গেল', 'বউ কথা কও', 'খোকা-হোক' আর ঘুঘু—কেবল গরহাজির হাঁড়ী-মুখো পেঁচা। পাখীরা বসে বসে হয়রান, বেলা বাড়ল, ভোরে কিছু খাওয়া হয়নি, পেট চোঁচো কর্‌ছে, কত আর মুখ বুজে বসে থাকা যায়! দেখতে দেখতে মাঠ হ'ল হাট, চেঁচানীতে কাণে তালা ধ'রে গেল, কেউ কারো কথা শুন্‌তে পায় না তবুও বক্-বকানি থামে না—পেঁচাকে গাল মন্দ করাই তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কথা।

তখন বাধল ঝগড়া, প্রত্যেকেই রাজ-অধিকার চায়। শিকারী বাজ-পাখী বল্লে, "আমার নামই যখন 'বাজ', দেবরাজের বজ্রের মত আমি জবর, তখন আমিই হব রাজা।" অন্যরা কিন্তু তাতে রাজী হ'ল না, তখন সে চটে মটেই চলে গেল। সেই থেকে আর আর পাখীদের পিছনে লেগে শত্রুতা করতে লাগ্‌ল। অনেক বচসা, বহুতর বাক্য ব্যয়, আর ঝগড়ার পর সাব্যস্ত হ'ল ভোট রংঙ্গের ব্যবস্থা। সবাই একটা জায়গায় নুড়ি পাথর জমা করতে লাগল—যার নামে বেশী নুড়ি জমবে সেই হবে রাজা। ভোট যখন গণতি করা হ'ল, জানতে পারা গেল হেঁড়ে-গলা হাঁড়ী-চাঁচার নামেই নুড়ি পড়েছে বেশী—তার সাজ পোষাকও ভাল,

লেজটি লম্বা, চাল চলনও রাজকীয় চালের, মাথার পাগড়ীটা কালো হ'লেও সুশ্রী। তখন সবাই সমস্বরে তাকেই রাজা বলে ঘোষণা করল। বাস্ রে, সে কি বিশাল "জয়" "জয়" ধ্বনি! এখনও কোন জন-নেতার ভাগ্যে সে রকমটি হয় কিনা সন্দেহ। ধন্যবাদাদি দেবার পর, পেঁচার অবহেলার জন্যে পক্ষী-সঙঘ মত প্রচার করল—সে যদি সময় মত, আর কথামত এসে উপস্থিত হ'ত তবে কোন গোলই হ'ত না। এমন একটা জরুরি সভায় কথা দিয়ে না আসা শুধু যে জবরদস্তি তা না, একেবারে বড়ই অন্যায়। তাহলে ত বাজ পাখীর সঙ্গে ঝগড়াই হ'ত না, সেও পক্ষীসমাজের দুষমন্ শত্রু হয়ে দাঁড়াত না; সে শিকারী, এখন সবারি তার ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হবে; সব নষ্টের মূল ঐ পেঁচাটা। ওকে শাস্তি দিতেই হবে। এ প্রস্তাব এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করে নিয়ে আপন আপন বাসায় চলে গেল। সেই হ'তে পেঁচা হলেন নিশাচর। সাধ্যি কি তিনি দিনে মুখ দেখান্—তবেই তো ঠোকরাণীর চোটে আক্কেল গুড়ুম, কোথায় লুকোবেন পথই পান না।

(মাঘ-১৩৩৯)

● *মালয় দ্বীপের কথা*

Jadavpur University

Kolkata, India

www.jaduniv.edu.in

- **National Assessment and accreditation Council (NAAC) reaccredited Jadavpur University with grade A and CGPA 3.61 in a scale of 4.**
- **University Grants Commission recognized as one of the top five Universities in the country with potential to develop into a Centre for Excellence.**
- **Jadavpur University is the first Indian University recognized by the Nippon Foundation as a SYLFF (Sasakawa Young Leader Fellowship Fund) institute to promote research by young leaders in the social sciences and humanities.**
- **Jadavpur University received the prestigious PURSE grant from DST, GoI as it ranked 4th on the basis of research performance in Science and Technology.**

ঝড়ের ছড়া

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঝড় ধায় ফোঁস্ খুব
রুষিয়ে ঢুসিয়ে ফুঁসিয়ে হুঁশিয়ার!

ডাল এক ফুল সব
মট্‌কায় ঝট্‌কায় চট্‌কায় দুনিয়ার।

পাখ্- ঝাঁক খালি গাছ-
পাখালির আছড়ায়, আঁচ্‌ড়ায় গাছ্‌ড়ায়;

বট, প্রায়, ভেঙে ঢালি-
পাকাটির ধাক্কায় খাম্‌খাই পাক খায়!

জোর হাল ভুরু মাঝি,
হ্যাঁচ্‌কায় মচ্‌কায়, কোঁচ্‌কায় হায়, হায়;

মন মেঘ আল্- বন্- নয় তবু ক্ষেত করে আঁব বুক দ্যায় হাড় সব চোখ্ ভরে ঝরে
কাৎরায়, সাঁৎরায়, কাৎরায়— বরা নয়, নয় মোষ,— ভারি রোষ, ভারি আক্রোশ; ধাম্‌সায় ধান সায় ধ্বংসায় হায় আফ্‌শোষ! ধ্বসিয়ে বসিয়ে,— খসিয়ে পাঁজ্‌রার; পাকলায়, গাঁজ্‌লায়; ওর গায় মোতি কাজ্‌লার!

(ভাদ্র-১৩২৫)

লা ল মা টি র ব ই

সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কারপ্রাপ্ত নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স-সমগ্র

৮০

১০০

৬০

১৫০

১৫০

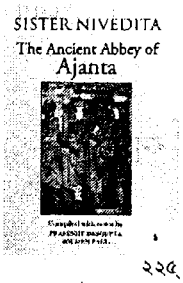

২২৫

১০০

৮০

৫০০

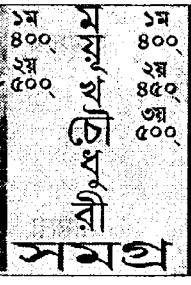

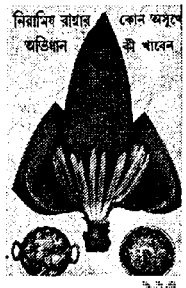

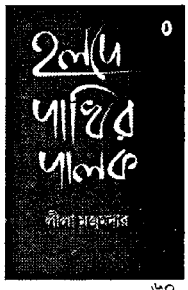

১০০

৪০

৪০

৩০০

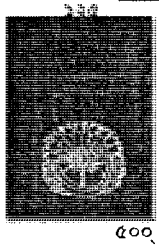
৫০০

৫০০

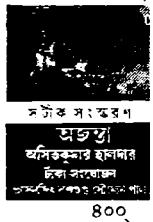

৫০০

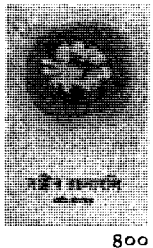
৪০০

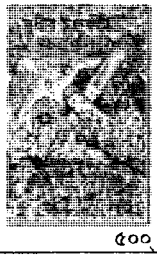
৫০০

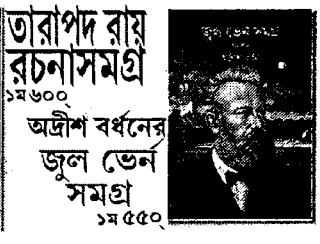

৪০০

লা ল মা টি
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩ Email : lalmatibooks@gmail.com
ফোন ৯৮৩১০২৩৩২২ / ২২৫৭ ৩৩০০

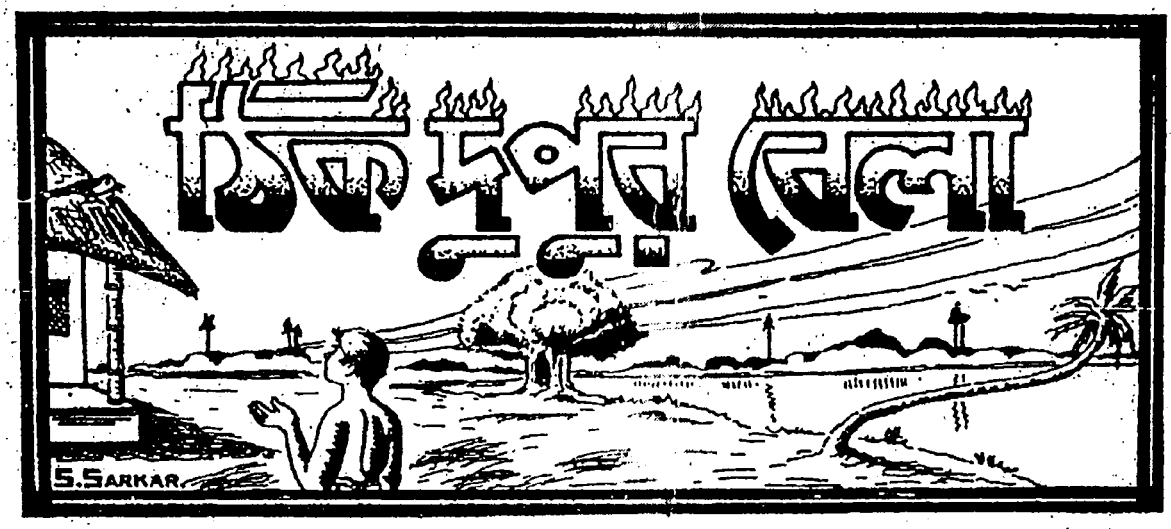

শ্রীসুকুমার দে সরকার

বেলা প্রায় বারোটা, সকাল বেলাটা গড়িয়ে এসে দুপুরবেলার সঙ্গে মেশবার জোগাড় করছিল। রবিবারের আকাশে খটখটে অলস রোদ, বাতাসে ঘুমপাড়ানি ক্লান্তি। রায়েদের বাড়ীর দাওয়া থেকে যে তাল গাছটা দেখা যায়, তার পাতাগুলো ঝিলমিল করে একবার উঠছে আবার নুয়ে পড়ছে, যেন ঘুমের ঘোরে গাছটা ঢুলছিল।

রায়েদের বাড়ীর খাওয়া দাওয়া সব চুকে গেছে। পটলার বাবা শনিবার বাড়ী এসেছেন। সঙ্গে কিছু তপ্‌সে মাছ এনেছিলেন, তাই খাওয়াটা আজ জোর হয়েছে। পাতের পাশে মেনী বেড়ালটা এখনও মিউ মিউ করে ঘুরছে। বেচারীর ভাগে কাঁটা ছাড়া কিছু জোটেনি; কিন্তু বোকাটা তাই সাবাড় করেছে, আবার গোঁফ চাটার কি কায়দা! পটলার সে কথা মনে পড়ে ভারি হাসি এল।

সবাই একটু গড়িয়ে নিতে গেছে, খালি পিসীমা কানে এক সুতো বাঁধা চশমা এঁটে সুর করে পড়ছিলেন, আর মাঝে মাঝে ঢুলছিলেন।

মুনি বলে অত্যাশ্চর্য্য শুন জন্মেজয়—
করে যে অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুন-তনয়,
তিন কোটী রথীবৃন্দ পড়িল সমরে,
ছয় বৃন্দ মদমত্ত.....

এই অবধি প'ড়ে পিসীমার স্বর জড়িয়ে গেল, চিবুকটা এসে বুকে ঠেকল—ঠক! পটলা দেখল পিসীমা ঘুমিয়ে পড়েছে

—"ও পিসীমা, তারপর কি হোল?"

—"এই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ....

ছয় বৃন্দ মদমত্ত পড়ে করিবরে।
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার।।
শোণিতে সাঁতার.....", —ঠক!

দূর ছাই! সবে জমে এসেছে, অভিমন্যু ভীষণ যুদ্ধ করছে, কর্ণ দ্রোণ সবে পালাচ্ছে, আর পিসীমাটা—হ্যাঁঃ, আবার নাক ডাকতে সুরু করেছে দেখনা। গোঁ গোঁ গো—যেন ভীমের গদা ঘুরছে। পটলা ভাবল, দেব নাকি একটা কিছু দিয়ে নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি? না, কাজ নেই, বাবা বাড়ী রয়েছে! কিন্তু অমন পালাটা..।—হ্যাঁ, বীর বটে অভিমন্যু!

পটলা আবার ডাকল,—"ও পিসীমা?"

—"উঁ"

—"তা'পর কি হোল?"

—"উঁ—অ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ..."

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন—
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন,

—"ওকি পিসীমা?"

—"ওমা তাইত, পাতাটা কখন উল্টে গেছে রে! আবার বৌমাকে বলতে হবে খুঁজে রাখতে। তা শোন্ না পেল্লাদের কথা..."

রাগে পটল কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বাবা আজ না থাকলে...!

—"হুঁঃ পেল্লাদ! তোমার পেল্লাদ যুদ্ধু করতে পারে? যাও শুনব না। কক্খনো না।" রাগ করে পটলা ছুটে বেরিয়ে গেল।

পিসীমা একবার ডাকলেন, "পটল, অ...পটলা!" ঠক্—পিসীমার আবার নাক ডাকতে সুরু হোল—গোঁ গোঁ..।

কৈবত্তদের দামু লোকটাকে সবাই বোকা বলে; কিন্তু তা' হলে কি হয়, পেটে পেটে তার সয়তানী বুদ্ধি গজ গজ কর্‌ছে। লোকটাকে বল দিকিনি যে, "দামু ষষ্ঠীতলায় পুজোটা দিয়ে আসবি বাবা?" হতভাগা এমন বোকার মতন তাকাবে যে ষষ্ঠীতলাটা লন্ডনে কি প্যারিসে সে খুঁজে বার করবার জন্যে যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু এদিকে লোকের বাগানের কলাটা, মূলোটা তার জ্বালায় আর থাকবার জো নেই।

সেদিন চুপুরে দামু চুপি চুপি চলেছে,—বোসেদের বাঁশঝাড় পেরিয়ে, পদ্মদীঘির ধার দিয়ে, শিবতলার পাশ দিয়ে—চলেছে চুপি চুপি ধার্ম্মিক বকের মত, ঠ্যাং বাড়িয়ে বাড়িয়ে। মুখটা রোদে পুড়ে ঘামে কালো হয়ে উঠেছে, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ী, কতকালের তেলচিটে কাপড় পরা—চলেছে দামু চুপি চুপি! এমন আস্তে আস্তে যে বাঁশতলার ফোক্‌লা শেয়ালটা কিছু টের পেলনা, তেঁতুল গাছের ওপরে কাগটাও একবার ডাকল না, পদ্মদীঘির ধারে ঢোঁড়া সাপ শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল সেও সর্ সর্ করে জলে নেমে পড়ল না। চলেছে দামু চুপি চুপি। আজ রায়েদের বাগান সাবাড় করতেই হবে। কাল রাতে পট্‌লার পিসীমা বেজায় তাড়া লাগিয়েছিল, ভাগ্যিস চিনতে পারেনি। কিন্তু আজ আর বাগানে কিছু থাকবে না—লাউ দুটোও নয়, আনারসটাও নয়, আমের বোলগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে, কচি বেগুন গাছগুলোর ঘাড় মটকে দিতে হবে। দামু ভাবল, চালাকি আমার সঙ্গে!—লোকটার মাংসহীন বুকের পাঁজরগুলো রাগে ফুলে উঠল।

এদিকে পটলা তো বেরিয়ে পড়ল। নাঃ, বাড়ীতে আর থাকা নয়! অমন পালাটা কি না পিসীমা...হুঁ, ঘুম পেয়েছে বললেই হ'লো? পটলা সিন্দুরে আমগাছটার গুঁড়িতে বসে হাতের উপর মাথা রেখে হেলান দিয়ে পড়ল। আজ সে বাড়ী যাবে না; পিসীমা এসে খেতে ডাকলেও না—এমনকি বাগানের আনারসটা কেটে খেতে ডাকলেও...। তাইত, সে হলে কি করা যাবে? পটলা দাঁত কড়মড় করে ভাবল,—না, তাহ'লেও না। ছেলেমানুষ পেয়েছে আমাকে? অমন অভিমন্যুর পালাটা শেষ না করেই...না, আজ আর বাড়ী নয়! হাতের কাছে একটা কঞ্চি পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে ঘাসের উপর মারতে মারতে পটলা বলল, আপন মনে,—কেমন যুদ্ধ হচ্ছিল...! না, পিসীমাটার খালি ঘুম!

ওঃ, অভিমন্যু কি যুদ্ধটাই না করছিল! এই হাজারটা সৈন্যের মুন্ডু কেটে ফেলল, এই অগ্নিবাণ ছেড়ে সব আগুন জ্বালিয়ে দিল, এই আবার একশোটা লোক এসেছে। হঠাৎ পটলা লাফিয়ে উঠে কঞ্চিটা ঘুরাতে সুরু করে দিল—বোঁ বোঁ বোঁ!

এই একশোটা লোকের মুন্ডু কাটা গেল,—পটলার কঞ্চিটা একদল বুনো গাছের ওপর সপাং করে গিয়ে পড়ল, গাছগুলো মাথা-কাটা হয়ে লুটিয়ে গেল। আবার পটলার কঞ্চি ঘুরছে। সে সামনে দেখ্‌ছে একাদশ অক্ষৌহিনী কৌরব সৈন্য! ঐ মাথা উঁচু ভেরেন্ডার চারাটা কর্ণ, দড়ীর মত শক্ত অশথের চারাটা দ্রোণ। শন্ শন্ করে বাণ আসছে! পটলা কঞ্চি ঘোরাচ্ছে বোঁ বোঁ, আর লাফাচ্ছে তড়াং তড়াং, আর মুখে শব্দ করছে—হিস্-ঘ্যাঁচ ঘ্যাচাং-হিস্!

বোসেদের গরুটা জামতলায় দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল। সে হঠাৎ দেখল, একটা মানুষের ছ্যানা লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। ভারী মজা ত! গরুটার কি মনে হোল, সেও হঠাৎ ল্যাজ তুলে চার ঠ্যাং ছুঁড়ে শিং নেড়ে লাফাতে সুরু করে দিল। পট্‌লার ভ্রুক্ষেপও নেই, সে তখন যুদ্ধ করতে ব্যস্ত।

ধান-কাটা ক্ষেতের আলের ওপর একটা বেতো ঘোড়া শুকনো শুকনো হলদে ঘাস ছিঁড়ে চিবোচ্ছিল। সে হঠাৎ দেখল, একটা মানুষের ছ্যানা আর একটা গরু নাচ্‌ছে। সে চিঁ-হি-হি-হি করে বলে উঠল, বাহাবা বাহাবা। তারপর একটা বেতো ঠ্যাং মাটিতে ঠুকে তাল দিতে লাগল আর লেজ নেড়ে মাছি তাড়াতে লাগল।

তেঁতুল গাছের ওপর কাগটা ডেকে উঠল, কা-আ-ক্কঃ! বাঁশ ঝোপ থেকে ফোকলা শেয়ালটা বেরিয়ে এসে সব দেখে

শুনে আমীরি চালে বলল,—হুয়া হুয়া হুয়া! পদ্মদীঘির সাপটার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সে রেগে গিয়ে সরসর করে জলে নেমে গেল।

দামু তখন সবে রায়েদের আনারসটা কেটে কোঁচড়ে পুরেছে, হঠাৎ সে নানা রকম শব্দে চমকে উঠল। সামনে ধূ ধূ করছে রোদ, আর তারি মাঝে সে দেখল,—রায়েদের পটলা কঞ্চি হাতে লাফাচ্ছে, বেতো ঘোড়াটা লেজ নেড়ে পা ঠুকে ঠুকে নাচছে, আর ভুঁড়ী ফুলিয়ে বসে এক শেয়াল বাহবা দিচ্ছে,—হুয়া হুয়া হুয়া! ও বাবা, সব ভূতে পেল নাকি? ও পাশের ঝোপে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, টিক্ টিক্ টিক্! বোকা দামু আর দাঁড়াল না, বেড়াটা ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। ভাবল, আজ তো প্রাণে বাঁচি! কিন্তু পাকা আনারসটা হতভাগা কোঁচড়ে সামলে নিতে ভুলে নাই।

হঠাৎ দামু পেছনে আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো। পেছন ফিরতেই দেখল, একটা গোভূত লেজ তুলে, শিং নেড়ে, চার ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে তেড়ে আস্‌ছে! ওদিকে চেয়ে দেখে, পটলারও নজর পড়েছে তার দিকেই; বোঁ বোঁ ক'রে কঞ্চি ঘোরাতে ঘোরাতে সে এগিয়ে আস্‌ছে। দামুর তখন আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! —দৌড়, দৌড়, দৌড়! কাপড় গেল ছিঁড়ে, কোঁচড় থেকে আনারস পড়ল গড়িয়ে; কিন্তু সেখানে কি আর সে দাঁড়ায়; দৌড় দৌড়!

আনারসটা কুড়িয়ে নিয়ে পটলার মনে হ'ল যেন বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে। ঘন্টা দুই আগেই খেয়েছে তাতে কি? অত লড়াই করে অভিমন্যুর কি আর ক্ষিদে পায় নি? পেয়েছিল কি না ততদূর অবশ্য গল্পটা তার শোনা হয় নি। কিন্তু পেয়েছিল নিশ্চয়, পটলা কি আর জানে না? সাবধানে আনারসটা বগলে পুরে পটলা বাড়ী ফিরে চলল।

ছবি: এস. সরকার

(আষাঢ়-১৩৪১)

স্বর্ণশেণ

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এক দেশে মস্ত এক পণ্ডিত ছিলেন। পৃথিবীর যত ভাষা সব তিনি বুঝতেন, যত রকম বিদ্যে আছে তাঁর জানা ছিল। স্বর্গে-মর্ত্তে-পাতালে, আকাশে-বাতাসে-জলে, আলোয়-আঁধারে যে কেউ আছে, যত কিছু আছে, সকলপ্রকার খবর তাঁর নখদর্পণে ছিল। মানুষদের ত তিনি চিন্‌তেনই ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব যক্ষ-রক্ষ কিন্নর-গন্ধর্ব এদের সকলকার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল। এত জিনিষ তো মনে রাখা যায় না, কাজেই লোহার সিন্ধুকের মতন মস্ত একটা খাতা তৈরি করে এই সব খবর, এদের সব ঠিকানা, সাটে লিখে রাখতেন। তবু এত লিখতে হয়েছিল যে অত বড় খাতা খানা ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল। আকাশের মধ্যে কিম্বা বাতাসের মধ্যে যারা আছে তাদের কাউকে ডাকতে হলে কিম্বা কিছু খবর পাঠাতে হলে কিম্বা মন্তর টন্তর পড়ে জাদু করবার দরকার হলে তিনি এই খাতা খুলতেন, নইলে আর সব সময় লোহার শিকলে বাঁধা সোণার তালা-চাবি দিয়ে সেটা বন্ধ থাকত—পাহাড়ের গুহার মত অন্ধকার একটা ছোট্ট চোর-কুটুরির মধ্যে। তাঁর বিদ্যার বলে তিনি লোহাকে সোণা মানুষকে ভেড়া করতে পারতেন; যখন খুসী ভূত-প্রেত দৈত্য-দানাদের ডেকে সৃষ্টিছাড়া কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু কাউকে তিনি এ বিদ্যা শেখাতেন না। কত লোক তাঁর পায়ে ধরে কাঁদাকাটি করত, তবু তিনি এই সব বিদ্যার একটি ফোঁটাও কাউকে দিতেন না। পাছে কেউ খাতা থেকে তাঁর বিদ্যা চুরি করে নেয়, এই ভয়ে খাতা কোথায় লুকোন আছে কাউকে জানতেও দিতেন না। জানত শুধু তাঁর ক্ষুদে চাকর।

পণ্ডিত যখন সেই অন্ধকার চোর কুঠুরির মধ্যে বসে বসে নানা রকম অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা করতেন, তখন ওই ক্ষুদে সেই সব দেখে অবাক হয়ে যেত। সে ছিল ভারি গরীব। তার মনিব বড় বড় কালো কালো লোহার চাঁই গুলোর উপরে মন্ত্র পড়া জল ছিটিয়ে চক্‌চকে সোণার চাঁই করে ফেলতেন তাই দেখে তার ভারি লোভ হত। তার মনে হ'ত ওই মন্তর পড়া জল যদি একটু খানি পাই তাহলে—উঃ কি যে হয়! কিন্তু কিছুতেই তার ভগ্যে ওই জলের এক ফোঁটাও জোটে না। যখনই সে জল পড়ার বাটির খোঁজ করত, সে দেখত বাটির গায়ে একটি ফোঁটাও জল নেই—সেটা যেন একটা খটখটে মরু ভূমির মতো শুকিয়ে আছে। এমন তাপ যে তার গায়ে হাতই দেওয়া যায় না, তখন তার কেবলই মনে হত যদি ওই বইখানা একবার খোলা পাই তাহলে লোহাকে সোণা করবার মন্তরটা বার করে নি। কিন্তু সে বই লোহার শিকল দিয়ে এমন আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা যে খোলে কার সাধ্য। আর তার চাবি তার মনিব যে ফুস্‌-মন্তরে কোথায় উড়িয়ে দিত খোঁজ পাওয়া যেত না। কাজেই খুব ইচ্ছে হলেও ক্ষুদের লোহা থেকে সোণা করা হয়ে উঠল না। তার দিন যেমন দুঃখে যাচ্ছিল তেমনি দুঃখে যেতে লাগল।

একদিন হল কি, ক্ষুদের মনিব-ঠাকুর তাড়াতাড়ি কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে কি কাজে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সেই খাতার চাবি বন্ধ করা হল না—খাতা খোলাই পড়ে রইল। ক্ষুদে গিয়েছিল বাজারে। ফিরে এসে দেখে এই ব্যাপার! তার ভারি ফুর্ত্তি হল। সে ছুটে খাতা খানার কাছে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তার পাতা উল্টাতে লাগল—কি জানি দেরি হলে যদি মনিব ফস্‌ করে এসে পড়ে। কোথায় আছে সোণা করবার মন্তর তাই সে মহা ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগল। সোণা, সোণা, সোণা—পাতাই উল্টে যাচ্ছে কিন্তু কোন পাতাতেই সোণার নাম গন্ধও নেই—যা একটু আছে তা কেবল অক্ষরের গায়ে সোণার কালিতে। খুঁজতে-খুঁজতে যতই সময় যায় তার মন ততই ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে। তার মনে হচ্ছিল অনেক কষ্টে অনেক হেঁটে হেঁটে সে সোণার পাহাড়ের কাছে প্রায় এসে পড়েছে—কিন্তু এই বুঝি গেল ফস্কে! এক একবার যেই মনে হয় সিঁড়িতে ঐ বুঝি পায়ের শব্দ—অমনি তার বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে—হায়, হায়! হল না, হল না!

সে খুব তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টাতে লাগল, কিন্তু যতই সে পাতা উল্টোয় ততই যত সব বিদঘুটে কথা তার চোখে পড়ে। তার একটি কথাও তার জ্ঞানে সে শোনেনি। এমনি

করে অনেক পাতা ওল্টাবার পর হঠাৎ এক জায়গায় থেমে তার মনে হল এইবার বুঝি সোণার সন্ধান পেলুম! পাতার মাথায় বড় বড় সোণার অক্ষরে লেখা রয়েছে—"স্বর্ণশের্ণ"। সে শুনত পণ্ডিতমশাই সোনাকে 'স্বর্ণ' বল্‌তেন। মনের আনন্দে সে চীৎকার করে উঠল—"স্বর্ণশের্ণ"। অমনি এই কথার শব্দ মিলতে না মিলতেই বাড়ী কাঁপিয়ে সেই অন্ধকার চোর-কুঠুরির লোহার দরজা মড় মড় করে ভেঙ্গে এক প্রকাণ্ড কালো মূর্ত্তি ক্ষুদের সামনে এসে হাজির হল। ক্ষুদে ত দেখেই ভয়ে প্রায় অজ্ঞান। হাত থেকে খাতার খোলা পাতাগুলো খসে গেল। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কট্‌মট্ করে বিকট চীৎকার করে উঠল—"কি চাই? কেন আমায় ডাকলি?" ক্ষুদে কাঁদো কাঁদো হয়ে মুখ ফুটে বল্‌তে না পেরে মনে মনে বিড় বিড় করে বল্লে—"কখন তোমায় ডাকলুম?" সেই ভীষণ মূর্ত্তি দাঁত কড় মড় করে বলে উঠল—"আমি দৈত্যরাজ স্বর্ণশের্ণ। শীগ্‌গির বল্ কি চাই।" ক্ষুদে ভয়ে কিছুই বল্‌তে পার্‌ল না।

দৈত্য আরো রেগে বলে উঠল—"হুকুম দে বলছি, নইলে এখনি তোর গলা টিপে মেরে ফেলব।" ক্ষুদে এমন ভেবড়ে গেল যে কি হুকুম দেবে কিছু মনেই আনতে পারল না। দৈত্য আবার চীৎকার করে উঠল—"হয় কাজ দে, নয় তোকে খেয়ে ফেলে আমার কাজ চুকিয়ে যাই!" বলতে বলতে তার লম্বা নখওয়ালা আঙুলগুলো তার গলার কাছে এগিয়ে এল। ক্ষুদের মনে হল, ব্যাস্ গেলুম এইবার। কথা বলতে গেল কিন্তু ভয়ে গলা শুকিয়ে এমন কাঠ হয়ে গেছে যে একটি কথাও বার হল না। একটুখানি জল পাবার জন্যে তখন তার প্রাণ ছটফট কর্‌তে লাগল। তারপর যখন দৈত্যের আঙুলগুলো তার টুটি চেপে ধরে ধরে এমন সময় তার গলা ফেটে শব্দ উঠল—"জল! জল!"

হুকুম পেয়ে দৈত্য তখনি ছুটল জল আনতে। জলের পর জল—ঘড়া ঘড়া জল জালা জালা জল এনে ঘরের মধ্যে ঢালতে লাগল। জল আনা তার আর তার থামে না। জল আনার হুকুম পেয়ে সে কেবল জলই আনতে লাগল। দেখতে দেখতে জলে ঘর ভেসে গেল। এক হাঁটু জল, এক কোমর জল, এক গলা জল,—তার ভাববার শক্তিও ছিল না। কাজেই দৈত্যের জল আনাও থামল না। ক্ষুদে প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে এল। দেখলে আর তার নিস্তার নেই। মনে মনে তার দুঃখ হতে লাগল—হায় হায়! কেন সোণার লোভ করলুম, শেষে যে প্রাণে মলুম!

দেখতে দেখতে জল এসে ক্ষুদের নাকের ডগায় এসে ঠেকল—দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। ক্ষুদে হাঁপাতে লাগল। ঠিক এই সময় তার মনিব এলেন ফিরে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল—ঐ যাঃ খাতার চাবিটা কি হ'ল? খাতাখানা কি বন্ধ করতে ভুলে গেলাম? তাই তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখেন এই কাণ্ড—বাড়ি জলে জলময়! প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না; শেষে ধ্যানে বসে যখন সব জানতে পারলেন তখুনি তিনি মন্ত্র পড়ে সব জল শুষে দৈত্যকে তাড়িয়ে ক্ষুদের প্রাণ রক্ষা করলেন। ক্ষুদে রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু পণ্ডিতের সেই অতদিন ধরে অত কষ্টে লেখা খাতাখানি জলে ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। সেই দুঃখে পণ্ডিত যে কোথায় কোন্ বনে চলে গেলেন তাঁর আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। ক্ষুদের সোণার লোভও সেই বানের জলে ভেসে গিয়েছিল, কাজেই সেও মনিবের সঙ্গে সঙ্গেই বনে চলে গেল।

ছবি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(আষাঢ়-১৩২৬)

বনের খবর

শ্রীপ্রমদারঞ্জন রায়

যারা জরীপের কাজ করে, তাদের অনেককে ভারী ভয়ঙ্কর সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সে সব জায়গায় হাতী, মোষ, ভালুক আর গণ্ডার চলা ফেরা করে; যেখানে সে সব নাই, সেখানে তাদের চেয়েও ভয়ানক মানুষ থাকে। প্রায় চৌদ্দ বছর এ সকল জায়গায় থেকে, কত ভয়ই পেয়েছি কত তামাসাই দেখেছি। তার কথা তোমাদের কিছু কিছু বল্‌ব।

সরকারী জরীপের কাজে অনেক লোককে দলে দলে নানান জায়গায় যেতে হয়। এক এক জন কর্ম্মচারীর উপর এক এক দলের ভার পড়ে; তার সঙ্গে জিনিস পত্র, গরু, ঘোড়া, খচ্চর, খালাসী, সার্ভেয়ার, চাকর বাকর বিস্তর থাকে। থাক্‌তে হয় তাঁবুতে। লোক জনের বাড়ীর কাছে থাকা প্রায়ই ঘটে না, আবার সময় সময় ঘটেও। এক এক সময় এমন হয় যে, কুড়ি পঁচিশ মাইলের ভিতরে আর মানুষ নাই। বন এমনি ঘন আর অন্ধকার যে, তার ভিতর দিয়ে চলবার পথ গাছ কেটে তয়ের করে নিয়ে তবে এগুতে হয়। জানোয়ার চলবার পথ যদি পাওয়া যায়, সেটা সুবিধার কথা বলতে হবে।

এমনি ত জায়গা। প্রথমে সে সব জায়গায় গিয়ে একটু সহজেই ভয় হত। আমার মনে আছে, একদিন রাত্রে আমার তাঁবুর সামনে বসে ফোঁস্ ফোঁস্ করে একটা বাঘ নিশ্বাস ফেলছিল, আমি তা শুনে ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। তারপর এর চেয়ে কত বড় বড় ঘটনায় পড়েছি, তাতে তেমন ব্যস্ত হইনি। সেই সব ঘটনার কথাই তোমাদের বল্‌তে এসেছি; আশা করি, তোমরা শুনে আমোদ পাবে। আজ তবে আমার সঙ্গের এক বুড়ো সার্ভেয়ারের দুই চাকরের কথা বলি।

সার্ভেয়ারটি ব্রাহ্মণ; বাড়ী অযোধ্যায়। চাকর দুটি তারই দেশের লোক,—সুচিৎ আর বেণী। তারাও দুজনেই ব্রাহ্মণ। বেণী বুড়ো, বেঁটে, রোগা, কালো আর হিংসায় তার পেটটি ভরা। সুচিৎ লম্বা, মোটা, ফরসা আর সাদা সিদে মানুষ। দুজনে মিলে সেই সার্ভেয়ারটির রান্না বান্না, কাজ কর্ম্ম সব করে। সার্ভেয়ার তাদের দুজনকেই খেতে দেয়, কিন্তু বেণীর তা সহ্য

হয় না। সুচিৎ কেন বাবুর খাবে? আর খাবে যদি, তবে অত খাবে কেন? সুচিতের শরীরটি যেমন, আহারটিও তেমনি— সে বেণীর ডবল খায়। কাজও করে সে বেণীর চেয়ে বেশী; কিন্তু তা হলে কি হয়? বাবু যে সুচিৎকে খেতে দেয়, বেণী তা সইতে পারে না। সুচিৎও যতটা খায়, সব সময় তা হজম করতে পারে না, তাইতে তাকে কাজ কর্‌তে কর্‌তে অনেক সময় ঘটি হাতে ছুট্‌তে হয়। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় বাবুর চায়ের জল গরম কর্‌তে গিয়েও তাকে তেম্‌নি ছুট্‌তে হল।

চারিদিকে ঘোর জঙ্গল, বাঘের ভয় খুবই আছে, কাজেই সুচিৎ বেশী দূরে যায় নি। অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে দেখে খচ্চরওয়ালারা খচ্চর সব বেঁধে চারদিকে ধুনি জ্বালাবার যোগাড় কর্‌ছে। এমন সময় তাদের একজন দেখ্‌ল, ওরে বাবারে! কি বড় বাঘ আস্‌ছে, গুড়ি মেরে! এ ঝোপ থেকে ও ঝোপের আড়ালে, সেখান থেকে আরেক ঝোপের পিছনে, এমনি করে ঠিক সুচিৎকে গিয়ে ধর্‌বার চেষ্টা। দেখেই ত সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "পালাও, পালাও! বাঘ এসেছে, ধর্‌লে!" সে কথা শুনবামাত্র সুচিৎ যে কি রকম প্রাণপণে ছুটে ছিল, বুঝ্‌তেই পার। কোথায় বা রৈল তার লোটা, কোথায় বা রৈল তার জল; সে দুই লাফে একেবারে তাঁবুর ভিতরে এসে হাজির। ভয়ে বেচারার প্রাণ শুকিয়ে গেছে; মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্চে না। বাবুর চা সে রাত্রে উনুনের উপরেই রইল, বাঘেরও সুচিৎকে না খেয়েই ফিরে যেতে হল। তার অনেক পরে চার পাঁচজন মিলে মশাল নিয়ে, সুচিৎকে নদী থেকে স্নান করিয়ে আন্‌ল। সেই পৌষ মাসের শীতে বেচারা কি কষ্টই পেলে। তা দেখে কিন্তু বেণীর মুখে হাসি আর ধরে না।

বেণীরও যে সকল দিন এমনি হেসেই কেটেছিল তা নয়। এমনি আর এক জঙ্গলে ঐ সার্ভেয়ারের তাঁবু পড়েছে। বেণী এখন রান্না করে। তাকে তাঁবুতে রেখে সার্ভেয়ার অন্য লোকদের নিয়ে কাজে চলে গিয়েছিল; খেটে খুটে কাহীল হয়ে সন্ধ্যা বেলা ফিরে আস্‌তে আস্‌তে সে ভাব্‌ছে, তাঁবুতে এসেই রান্না তৈরী পাবে, আর হাত পা ধুয়ে খেয়ে দিব্যি ঘুমটি দেবে। তাঁবুতে এসে কিন্তু দেখে, রান্না কর্‌বে কে, বেণী তাঁবুতেই নাই। এদিক ওদিক চারদিক খুঁজে তাদের বড় ভাবনা হল, বুঝি বেণীকে বাঘে নিয়ে গেছে। সঙ্গের শান কুলিরা কিন্তু সবদিক ভাল করে দেখে বল্লে যে, বাঘ ওদিক পানে আসে নি,—বাঘের কোন চিহ্নই নাই।

তখন সবাই মিলে খুব চেঁচিয়ে বেণীকে ডাক্‌তে লাগল। অনেক ডাকাডাকির পর খানিক দূর থেকে ভাঙ্গা গলায় উত্তর এলো, "আমি এখানে!" সকলে আলো নিয়ে সেই দিক পানে ছুট্‌ল। সেখানেও তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে আবার ডাক্‌তে লাগল। তখন গাছের উপর থেকে বেণী বল্লে, "আমি গাছে, নাম্‌তে পার্‌ছিনা!' তা শুনে শানেরা তাড়াতাড়ি গাছে উঠে দেখে, বেণী তার পাগড়ি খুলে তাই দিয়ে নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে বসে আছে! সেইখান থেকে তার বাঁধন খুলে তাকে নামিয়ে আনা হল।

বেচারা অনেক কষ্ট করে গাছে উঠেছিল। গায়ের অনেক জায়গা ছড়ে গিয়েছে, কাঁটার খোঁচাও নিতান্ত কম খায়নি। সবাই জিজ্ঞাসা কর্‌লে "তোর এমন দশা কি করে হল রে?"

বেণী বড় বড় চোখ করে বল্লে, "বা-ঘ এসেছিল! নালার ধারে এসে এমনি গড়্গড়িয়ে উঠলো যে আমি তখনি ছুটে চলে এলাম; তাতেই গা ছড়ে গিয়েছে আর কাঁটার খোঁচা লেগেছে। বাঘটা আবার ডাক্‌তে ডাক্‌তে উপরে উঠে আস্‌তে লাগল, কাজেই আমিও গাছে উঠে গেলাম। কি করে যে উঠ্‌লাম, জানি না, আর কখ্‌খনো গাছে উঠিনি। উঠেই পাগড়ি খুলে ডালের সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে বেঁধে নিয়েছিলাম; তারপর শীতে হাত পা অবশ হয়ে গেছে, নাম্‌তে গিয়ে আর নাম্‌তে পারিনি।" শীতে অবশ হওয়ার কথাই বটে, সেটা ছিল জানুয়ারি মাস।

শানেরা কিন্তু বল্লে, "বাঘ এসেছিল, আর তার পায়ের দাগ নেই, তা কি হতে পারে?" বেণী তাতে ভারী চটে বল্লে, "ব্যাটাদের চোখ নেই, তাই বল্‌ছে বাঘ আসেনি। রাত্রে এসে যখন ধর্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে!" বল্‌তে বল্‌তেই নালার ধারে গম্ গম্ করে একটা শব্দ হল, আর বেণীও অমনি একেবারে লাফিয়ে উঠে বল্লে, "ঐ শোন, বাঘ এসেছে কিনা!" তা শুনে সকলে ত হেসে গড়াগড়ি। সেটা ছিল একটা হরিণ (barking deer)!

শেষে আমি এলে পরে আমাকে যখন সার্ভেয়ার সব বল্লে, তখন আমি বেণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "বেণী, তুমি পশ্চিমের লোক, সিপাহীর জাত হয়ে, একটা হরিণের ডাক শুনে অমন কর্‌লে?" তাতে সে বল্লে, "হুজুর, দিনের বেলায় ওটা বাঘই ছিল। রাত্রে আমার ভুল হয়েছিল। তখন মেজাজটা ঠিক ছিল না, তাই বুঝ্‌তে পারিনি।"

যা হোক, বেণীর বাঘের কথা নিয়ে সকলে মিলে তাকে কিরকম ক্ষেপিয়েছিল, তা বোধ করি আমি বলে না বুঝালেও চল্‌বে।

ছবি : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(শ্রাবণ- ১৩২০)

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর বই

জীবনী গ্রন্থ

● আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৭৫.০০
● " জগদীশচন্দ্র	১২০.০০
● রাজর্ষি রামমোহন	১৮০.০০
● বিজ্ঞানে বাঙালী	১২০.০০
● ব্যায়ামে বাঙালী	৮০.০০
● বীরত্বে বাঙালী	৪০.০০
● বাংলার ঋষি	১০০.০০
● বাংলার বিদুষী	১৫০.০০
● বাংলার মনীষী	১৫০.০০
● আর্থার কোন্যানডয়েল	২৭৫.০০
● পরমাণু বোমা	৯০.০০
● সরল প্রাণীবিজ্ঞান	১৫৫.০০
● রূপকথা পশুকথা	৬০.০০
● একগুচ্ছ গল্প	৭০.০০
● চেকদেশের রূপকথা	২৫.০০
● স্বপনবুড়োর ছড়া	২৫.০০
● সরল যোগব্যায়াম	৬০.০০
● যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে রোগ নিবারণ	৮০.০০

আরো অন্যান্য বই

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ফোন : ২২৪১-৬১৩৮

email : presedencylibrary@gmail.com

Website: www.presedencylibrary.com

ময়ূর পঙ্খী

শ্রীবন্দে আলী মিয়া

এক দরজী। তার খুব নাম ডাক, এমন কি বাদশার দরবারেও খুব খাতির। বাদশার যত পোষাক আষাক সেই তোয়ের করে।

তার এক কামার বন্ধু আছে। সে রাতদিন লোহা পেটে আর কাস্তে কোদাল গড়ায়। দুই জনে খুব ভাব।

একদিন দুইজনে তর্ক লেগেছে। দরজী বল্‌ছে, "আমি বড়ো।" কামার বল্‌ছে, "আমি বড়ো।" কিছুতেই আর এর মীমাংসা হয় না। খাঁটি বিচার পেতে হলে বাদশার কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেই শেষকালে তারা চল্‌লো বাদশার কাছে। বাদশা বল্‌লেন, "তোমরা দু'জনেই বল্‌ছো, নিজে বড়ো। এর মীমাংসা তো শুধু কথায় হয় না, কাজে দেখাতে হবে। তোমরা কে কি কাজ কর্‌তে পারো তার প্রমাণ দেখাতে হবে, তবেই বিচার চল্‌বে।"

দুজনেই রাজি হয়ে ঘরে ফিরে এলো।

উজির নাজির পাত্র মিত্র নিয়ে মস্ত সভা করে বাদশা বসেছেন। কামার আর দরজীও এসেছে। তাদের কাজের পরীক্ষা হবে। কামার একটা লোহার শাল মাছ আর তার ছোটো ছোটো পোনা তোয়েরি করে এনেছিলো। সেগুলো একটা চৌবাচ্চার মধ্যে ছেড়ে দিলে। কি আশ্চর্য্য! ছেড়ে দিতেই সেই লোহার মাছগুলো চুলবুল করে বেড়াতে লাগ্‌লে। বাদশা উজির নাজির সভাসদগণ তো অবাক্! সকলে হাজার মুখে তার তারিফ কর্‌তে লাগলেন।

তারপর, এবার দরজীর পালা। দরজী কাপড়ের একটা ময়ূর তোয়েরি করে এনেছে—এমন সব রঙ বেরঙের কাপড়, যে নকল ময়ূর বলে ধর্‌তে পারা যায় না। দরজী তখন ময়ূরকে ছেড়ে দিল। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! ময়ূরটা পেখম মেলে নাচ্‌তে লাগ্‌ল; তারপর গিয়ে ডানার ঝাপটা দিয়ে শাল মাছটাকে ওপরে তুলে খেয়ে ফেলল। আর পোনাগুলোকে তো খুঁজেই পাওয়া গেল না। পাত্র মিত্র উজির নাজির সকলে জয় জয়কার দিয়ে উঠল।

বাদশা কিন্তু প্রশংসা কর্‌লেন না। বল্‌লেন, "কাপড়ের ময়ূরের প্রাণ হয়েছে লোহার শাল মাছেরও তো প্রাণ ছিলো, সুতরাং দু'জনেই সমান গুণী। এতে দরজী প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়।" সকলে বল্‌লেন, "ঠিক ঠিক।"

দরজী বলল, "বাদশা নামদার, আমার ময়ূরের আরো একটা ক্ষমতা আছে। — বারো দিনের ছেলে যদি কোথাও পাওয়া যায়, আমায় আনিয়ে দিন, ময়ূর পিঠের ওপরে নিয়ে উড়ে যাবে।"

বাদশার হুকুমে তখনই সিপাই পাইক ছুট্‌লো। খোঁজ খোঁজ সারা রাজ্য তোলপাড় করে ফেলল, কোথাও বারো দিনের শিশু ছেলে পাওয়া গেল না। সিপাই পাইক এসে সে কথা বাদশাকে খবর দিল। বাদশা বল্‌লেন, "আমার ঘরে বারো দিনের ছেলে আছে; তাকেই নিয়ে এসো।"

আঁতুড় ঘরে বারো দিনের বাদশাজাদা বেগম সাহেবার কোল আলো করে আছে! সিপাই পাইকরা এসে বাদশার হুকুম জানিয়ে তাকে নিয়ে গেল। দরজী হাত পেতে তাকে কোলে নিয়ে ময়ূরের পিঠে শুইয়ে দিল। বাদশাকে বলল, "শাহানশাহ্, গোলামের বেয়াদবি মাফ কর্‌বেন। ময়ূর এই শিশুকে নিয়ে উড়ে যাবে— কিন্তু যদি ফিরে না আসে— তাতে আমার কোনো কসুর নেই।"

বাদশা খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লেন। তারপর বল্‌লেন, "বেশ, তাই।"

দরজী তখন ময়ূরকে ইঙ্গিত কর্‌তেই ময়ূরটা উড়ে উঠে সাতবার সেখানেই ঘুর্‌ল, তারপর প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে কোথায় যে উড়ে চলে গেল তার আর দিশে পাওয়া গেল না।

বাদশা বল্‌লেন, "দরজীর ক্ষমতাই বেশী, সুতরাং সে-ই

বড়ো।" নিজের পরাজয়ে কামার বেচারীর মুখ কালো হয়ে গেল। দরজী খুশী মনে বাদশাকে কুর্ণিশ জানাল।

(২)

এক মালিনী। তার মালঞ্চ শুকিয়ে গেছে। বারো বৎসর তা'তে ফুল ফোটে না—দোয়েল শ্যামা শীষ দেয় না। মালঞ্চে কত আগাছা জন্মেছে, কাঁটায় পথ ঢেকেছে। সাপ শিয়ালের বাসা। বারো বৎসর সেখানে মানুষের পা পড়ে না। বাদশার মহলে মালিনী ফুল জোগাতে পারে না। সুতরাং কষ্টে তার দিন যায়।

সে দিন ভোর হতে না হতে হাজার মৌমাছি আর ভ্রমরের গুঞ্জনে তার ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার কী! মালিনী ধড়মড় করে কবাট খুলে বাইরে এসে একেবারে অবাক্! রঙ বেরঙের লাখো ফুলের আভায় মালঞ্চ উজ্জ্বল। তার মুখে হাসি, চোখে হাসি,—কি কর্‌বে ভেবে পায় না। পরশীদের ডেকে দেখাতে লাগ্‌লে। পরশীরা বলল, "মালিনী, তোর বরাত ফিরেছে।"

ধূলোয় ভরা মাকড়সার বাসা ফুলের সাজিটা ঝেড়ে মুছে এনে ফুল তুল্‌তে লাগ্‌ল। এ গাছের একটা ও গাছের দুটো—সাজিটা প্রায় ভরে ভরে, এমনি সময়ে তার নজর পড়্‌লো—এক সোনার চাঁদ শিশু এক ময়ূরের বুকের কাছে শুয়ে হাত পা নেড়ে খেলা কর্‌ছে। এত রূপ যে তার দিকে চাইলে চোখ ধেঁধে যায়। কোন্ দেবতা না পরী তার সাথে ছলনা কর্‌ছে। মালিনী ফুলের সাজিটা এক পাশে ফেলে দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ময়ূরটাকে সাথে করে ঘরে এলো।

পর্‌শীরা সুধাল, "এ ছেলে কার, কোথায় পেলি?" মালিনী মিথ্যা কথা বলল, "এ আমার বোন পো। সাতকূলে তো কেউ নেই; বোন মারা যাবার সময়ে একে আমায় দিয়ে গেছে।"

মালিনীর আর কোন কষ্ট নেই। বাদশার মহলে রোজ রোজ ফুল যোগায়। ঘি খায় আর দুধ দিয়ে হাত ধোয়।

বাদশাজাদা মালিনীর আদর যত্নে ষোল কলার চাঁদের মতন দিন দিন বাড়্‌তে থাকে। মালিনী সোহাগ করে তার নাম রাখ্‌লে 'রাফান'! ছ' সাত বছর যেতে না যেতে মালিনী তখন রাফানকে লিখ্‌তে পড়্‌তে পাঠাল।

(৩)

রাতের পর দিন, আর দিনের পর রাত, এমনি করে প্রায় কুড়ি বাইশ বছর। রাফান লেখা পড়া শিখে রূপে গুণে বড় হয়ে উঠ্‌লো।

সেই দেশের বাদশার মেয়ে শাহাজাদী তুলাবতী পরম সুন্দরী। মেয়ের বয়স হয়েছে তবু তার বিয়ের কথা বাদশার মনেই নেই। রঙ-মহলের সাত দেউড়ীর পর যে মহল—সেই মহলের সাত তলায় দাসী বাঁদী নিয়ে সে থাকে। চাঁদ সূর্য্য ছাড়া অপর কারো মুখ তার দেখবার উপায় নেই। বাদশার হুকুম—কোনো পুরুষ মানুষ সে মহলে গেলে বিনা বিচারে তার শিরচ্ছেদ।

বাদশীজাদী তুলাবতীকে মালিনী ফুল জোগায়। মালিনীর কাছে তুলাবতীর রূপ গুণের কথা রোজ রোজ রাফান শুন্‌তে পায়। একদিন সে একটা বিনি সূতার মালা গেঁথে মালিনীকে বলল, "মাসি, এই মালাটা তুমি আজ বাদশাজাদীকে দিয়ে এসো!" মালিনী মালা দেখে মনে মনে খুশী হলো, কিন্তু মুখে বলল, "তুই কি মালা গাঁথতে জানিস? এ কি মালা হয়েছে না কিছু! ও আমি পারবো না। শেষে বাদশা অসন্তুষ্ট হোক আর আমার চাকরীটা যাক!"

রাফান বল্‌লে, "না, কিছু বলব না মাসি, তুমি নিয়ে যাও।" তার পীড়াপীড়িতে মালিনী আর কি করে, অগত্যা অন্যান্য ফুলের সাথে সেই মালা গাছটাও বাদশাজাদীকে দিয়ে এলো।

পরদিন আবার মালিনী ফুল নিয়ে যেতেই বাদশার মহলে তার ডাক পড়লো। মালিনী যেতেই বাদশা বল্‌লেন, "মালিনী, বল্‌তো এ মালা কে গেঁথেছে?" বলে রাফানের গাঁথা গত কালকার সেই মালাটা বের করে তাকে দেখালেন।

মালা দেখেই মালিনীর মুখ শুকিয়ে গেল। না জানি কি অপরাধ—কি ত্রুটি বা হয়েছে। সে থতমত খেয়ে ভয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মালিনীর ভয় দেখে বাদশা তাকে অভয় দিয়ে বল্‌লেন, "তোর কোনো ভয় নেই মালিনী, আমি কিছু বল্‌বো না। তুই আজ তেরো বছর আমাকে ফুল যোগাচ্ছিস, ফুলের মালা গাঁথছিস, কিন্তু এমন করে যিনি সূতায় মালা গাঁথতে তো তোকে কোনো দিন দেখিনি। এ ক্ষমতা তোর হবে না। বল্‌

সত্যি করে, কে গেঁথেছে—আমি তোকে বক্‌শিস দেবো।"

পুরস্কারের লোভে মালিনীর মাথা বিগ্‌ড়ে গেল। সে শেষ অবিধি গোপন কর্‌তে পার্‌লে না! বলল, "আমার এক বোন পো আছে, তার নাম রাফান—সেই গেঁথেছে।" বাদশা বল্‌লেন, "তাকে এক দিন নিয়ে এসো, আমি দেখ্‌বো।"

পরদিন রাফানকে আর ময়ূরকে সাথে করে মালিনী বাদশার দরবারে এসে সেলাম দিল। রাফানের দিকে চেয়ে বাদশা অবারক হয়ে গেলেন। এত সৌন্দর্য্য মালিনীর বোন-পোর কি করে হয় তাই তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর মালিনীকে বিদায় দিয়ে রাফানকে বাদ্‌শা নিজের খাশ্‌কামরায় নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মালিনী কি তোমার আপন মাসি?"

রাফান বলার আগেই ময়ূর তার জবাব দিল। বলল যে, সে সত্যি সত্যিই মালিনীর বোন-পো নয়, পূব দেশের বাদশার ছেলে। সেখান থেকে কপাল দোষে কি করে সে মালিনীর মালঞ্চে এলো—সব কাহিনী ময়ূর একে একে বলে গেল।

বাদশা সব কথাই খুব গম্ভীর হয়ে শুন্‌লেন। শুনে খুবই খুশী হলেন। তিনি মালিনীর বাড়ীতে রাফানকে আর যেতে দিলেন না, নিজের প্রাসাদেই খুব খাতির যত্ন করে রেখে দিলেন। তারপর বাদশা আর বেগম দু'জনে অনেক ভাব্‌লেন—অনেক চিন্তা কর্‌লেন। তারপর, খুব ধূমধাম আমোদ আহ্লাদ করে রাফানের সাথে তুলাবতীর বিয়ে দিলেন।

দিন যায় দিন আসে। বাপ মা'র কথা শুনে অবধি রাফানের মনটা তাঁদের দেখ্‌বার জন্য ছট্ ফট্ করে। একদিন কথাটা সে ময়ূরের কাছে পাড়ল। ময়ূর অম্‌নি রাজী হয়ে গেল। একদিন শ্বশূর আর শ্বাশীড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে সে ময়ূর চ'ড়ে রওনা হলো।

(৪)

এত উঁচু দিয়ে ময়ূরটা উড়ে চলেছে যে, মেঘ এসে গায়ে লাগ্‌তে লাগ্‌ল। এই সব দেখ্‌ছে আর বাদশাজাদী আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠছে। কিন্তু তার আবার ভয়ও কর্‌ছে—কি জানি হঠাৎ যদি ময়ূরের ওপর থেকে নীচের মাটিতেই পড়ে যায়, তা হলে হাড় গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

যেতে যেতে একটা চর। সেই চরের ওপরে এসে ময়ূরটা

নাম্‌ল। সে চরে না আছে লোকজন না আছে কিছু। মানুষজন কেউ কোনোদিন এসেছে কিনা তারও কোন চিহ্ন নেই। যে দিকে তাকানো যায়—সুধু বালি আর বালি, তার পরে সমুদ্দুরের নীল জল চারিদিকে থৈ থৈ কর্‌ছে। সেই চরে তুলাবতীর দুটি যমজ ছেলে হলো।

আহা! ছেলে তো নয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ! তুলাবতী ছেলে দুটোর চাঁদ মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গেল।

কিন্তু খাবার দাবার তো কিছুই নেই। সেই জনশূন্য চরে কেই বা দানা পানী দেয়—আর কেই বা তাঁদের পানে ফিরে তাকায়। রাফান তুলাবতীকে বলে কয়ে বুঝিয়ে ময়ূরে চড়ে গ্রামের দিকে গেল—একটু দুধ টুধ, একটু খাবার আন্‌তে পারে কিনা।

ময়ূর যেখানে এসে নামল, সে গাঁয়ে এক গেরস্থের

বাড়ীতে সে দিন খুব ভোজ হচ্ছিলো। রাফান পাড়াময় ঘুরে ফিরে, কোথাও কিছু না পেয়ে সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। ময়ূরটাকে একটা বট গাছের ওপরে বসিয়ে রেখে গেল। মনে ভাবল, চেয়ে চিন্তিয়ে কিছু সংগ্রহ করে সেই বটগাছ তলায় এসে ময়ূরে চড়ে ফিরে যাবে।

এমন সময়, সেই বটগাছতলার পথ দিয়ে এক তীরন্দাজ শিকারী চলেছে। সে ময়ূরটাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়্‌লে। তীর লাগ্‌তেই ময়ূরটা নীচে পড়ে গিয়ে ছট্‌ফট্ করে মরে গেল। শিকারী ময়ূরটাকে আর নিলে না, সে তাকে অমনি অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে গেল।

ওদিকে খাবার দাবার নিয়ে এসে রাফান ময়ূরটাকে মৃত অবস্থায় দেখ্‌তে পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লো। সে বুক চাপ্‌ড়ে হাপুস নয়নে কাঁদত লাগ্‌লে। সেই সাত সমুদ্দুরের চরায় সে ফিরবে কি করে! খাবার দাবার সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে পাগলের মতন হয়ে ছুটে চল্‌লো। কোথায় বা তার স্ত্রী, কোথায় বা ছেলে দুটো, আর কোথায় বা সে!

এক প্রহর যায়, দুই প্রহর যায়—তুলাবতী স্বামীর পথের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু স্বামী তো আর আসে না। মাথার ওপরে রোদ্দুর আগুন ঢাল্‌ছে আর ও-দিকে ক্ষিদেয় পেট চাঁ চাঁ কর্‌ছে। সে আর কি কর্‌বে? অনেকক্ষণ পথ চেয়ে বসে থেকে যখন দেখ্‌লে যে, স্বামী আর কিছুতেই এলো না, তখন সে মহা ফাঁপরে পড়্‌লো। বালুর চরার ওপরে কচি ছেলে দুটোকে শুইয়ে রেখে সে কাপড় চোপড়গুলো নিয়ে সুমুদ্দুরের জলে ধুতে গেল, ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে এক দুষ্টু সওদাগর চলেছে বাণিজ্য করতে। তুলাবতীকে দেখে সে তাল ধরে জোর করে পান্‌শীতে তুলে নিয়ে নিজের দেশের দিকে চলল। তুলাবতীর কান্নাকাটি কিছুই সে শুন্‌ল না।

(৫)

এদিকে হয়েছে কি—এক গোয়ালার গরু রোজ সেই চরায় চড়তে আসে। ছেলে দুটিকে দেখে তার কি মনে হল, সে তাদের দুধ খাইয়ে গেল। এমনি করে রোজই দুধ খাইয়ে যায়! তাই গোয়ালে দুধ দোহালে তার আর আগের মতন দুধ হয় না, রোজই দুধ একটু কম হয়। গোয়ালা বেচারী কিছুই ভেবে ঠাহর কর্‌তে পার্‌লে না। মনে কর্‌ল, একদিন সে গরুটার পিছু পিছু গিয়ে দেখ্‌বে, কোথায় গরুটা সারাদিন কি করে।

পরদিন গরুটা ছেড়ে দিয়ে সে পিছু নিল। গরুটা নদী সাঁতরে একটা চরে গিয়ে উঠ্‌লো। গোয়ালাটা নজর করে দেখ্‌ল—গরুটা নীচু হয়ে কাকে যেন দুধ খাওয়াচ্ছে। সেও তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরে গিয়ে হাজির হলো।

দুটো ছেলে! আহা কি রূপ!! যেন আকাশের চাঁদ খসে পড়েছে। গোয়ালার আর চোখের পাতা পড়ে না। সে তাড়াতাড়ি ছেলে দুটোকে বুকে তুলে নিয়ে ঘরে এলো। গোয়ালিনী যেন সাত রাজার ধন মাণিক কুড়িয়ে পেল। তারা আদর করে শিশু দুটোকে লালন পালন কর্‌তে লাগ্‌লে।

(৬)

সুখে হোক দুঃখে হোক দিন বসে থাকে না, এক রকম করে কেটেই যায়। তুলাবতীর দিনও কোন রকমে কাটে। এমনি করে বারো বৎসর গেল। সেই সওদাগর উৎপাৎ সুরু করে দিলে—যেমন করেই হোক—শীগ্রি তাকে সাদী করা চাই।

একদিন তার আয়োজনও হলো! বহু দেশের নবাব বাদ্‌শা আমীর ওমরাহদের নিয়ে এক মস্ত বড়ো সভা বস্‌লো।

এ দিকে সেই যে বাদশাজাদা রাফান—সে তো তার ছেলে দুটো আর তুলাবতীকে হারিয়ে একেবারে পাগলের মতন হয়েছে। রাতদিন কেবল তুলাবতীর কথা ভেবে কাঁদে। সেই সভায় পাগলের মতন ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়জামা নিয়ে সে-ও একটি কোণে এসে চুপটি করে বসেছে। ভেবেছে, কোন ভোজ টোজ হবে বোধ হয়।

তুলাবতী অন্দর মহলের জানলা থেকে উঁকি দিয়ে লোক দেখ্‌ছিল। হঠাৎ তাকে দেখ্‌তে পেয়েই চম্‌কে উঠ্‌লো—এই তো তার স্বামী! সে ধীর ভাবে সভায় এসে হাজির হলো। সভায় আমীর ওমরাহদের ডেকে ধীর গলায় বলল, "আমার এক নালিশ আছে—আপনারা বিচার করুন।" সকলে বল্‌লে, "কি নালিশ বলুন।"

তুলাবতী বলল, "আমাক স্বামী এখনো বেঁচে আছেন। তিনি থাক্‌তে আমি আরেক জনকে কি করে বিয়ে করি?"

সকলে বলল, "ঠিক, ঠিক! তা আপনার স্বামী কোথায় আছেন?"

তুলাবতী বলল, "তিনি এখানেই আছেন।"

সওদাগর এবং অন্য সকলে চম্‌কে উঠ্‌লো।

বলল, "কোথায়?" তুলাবতী তখন রাফানের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে নমস্কার কর্‌ল। রাফানও এমন হঠাৎ স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

সকলে সেই পাগলের মতন লোকটাকে দেখে বলল, "এই আপনার স্বামী! কি ব্যাপার?" যা যা ঘটেছিল তুলাবতী তখন সকল কথা তাদের কাছে বলে গেল। তাদের ছেলে দুটো যে সেই সুমুদ্দূরের চরায় না খেতে পেয়ে মরে গেছে— এই কথা বলে সে কাঁদ্‌তে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে সভার মাঝখান থেকে দুটো ছেলে এসে তুলাবতীকে আর রাফানকে প্রণাম কর্‌লে। মায়ের প্রাণ, তখনি দেখেই তাদের চিন্‌তে পার্‌ল। কিন্তু তবু হঠাৎ না জেনে না শুনে কি করে ছেলে বলে মেনে লয়।

তখন সেই ময়ূরটা প্যাঁক প্যাঁক করে উড়ে সভার মাঝখানে এসে নাম্‌ল। বলল, "আমি মরিনি। তীর লেগে কাতর হোয়ে পড়েছিলেন, এক দরবেশ আমাকে জিইয়ে দিয়েছে।....এ দুটো আপনাদের সেই ছেলে, গোয়ালার ঘরে এরা মানুষ হয়েছে।"

তুলাবতী আর রাফান ছেলে দুটোকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ল। সকলে আনন্দে জয় জয়কার করে উঠ্‌লো। বাদশা নবাব যাঁরা নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, তাঁরা সেই দুষ্টু-বুদ্ধি সদাগরকে বন্দী করে যাবজ্জীবনের জন্যে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

তুলাবতী আর ছেলে দুটোকে নিয়ে শাহজাদা রাফান দেশে রওনা হলো।

সেই যে বাদশা আর বেগম, তাঁরা তো বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁদের আর ছেলে পুলে হয়নি। একমাত্র সেই বারো দিনের ছেলেকে হারিয়ে অবধি তাঁদের মনে সুখ শান্তি নেই।

একদিন ময়ূরতক্তে বসে বাদশা বিচার আচার কর্‌ছেন, হঠাৎ এমনি সময়ে রাফান, তার স্ত্রী ছেলে দুটো আর ময়ূর—

সবাই এসে বাদশাকে সেলাম কর্‌ল। বাদশা তো চিনতেই পা রেন না। ময়ূরের মুখে তাদের পরিচয় পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেল্‌লেন। মহল থেকে বেগম ছুটে এলেন।

তারপর?—

তারপর আর কি। বছর কয়েক পরে বুড়ো বাদশা আর বেগম দুজনেই মারা গেলেন। শাহজাদা রাফান তখন বাদশা হয়ে ছেলেপুলে আর তুলাবতীকে নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব কর্‌তে লাগ্‌ল।

ছবি: বন্দে আলী মিয়া

(চৈত্র-১৩৩৯)

এপ্রিল—পয়লা ও দোসরা

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ললিত এবং ননীতে এজন্মে আর বনিবনা হইল না। পন্ডিতমশাই ক্লাসে সংস্কৃত পড়াইতে পড়াইতে সাপ আর বেজী এই দুই প্রবল শত্রুর বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেন, 'অহি-নকুলম্'। আমরা সেই কথাটাই আবার একটু ঘুরাইয়া পরস্পর বলাবলি করিতাম 'ননী-ললিতম্'।

ললিত লেখাপড়ায় ভাল ছাত্র, কাজেই আমাদের হোষ্টেলে তার দলেই ছেলে বেশী। কিন্তু অপরদিকে আবার তেম্‌নি সুদ-সমেত আদায় করিয়া লইত অসীম। সে ছিল ননীরূপ রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ হনুমান্। মুখ বাঁকাইয়া মাড়ীশুদ্ধ বত্রিশ পাটী দাঁত বাহির করিয়া যখন তখন সে শুনাইত, "আরে রেখে দে তোদের ললিত্-ফলিত্। বাংলা দেশে সবশুদ্ধু হাজার খানেক ইস্কুল, আর ফি-ইস্কুলে আটদশটা ক'রে ক্লাস। তারই একটা ক্লাসে উনি ফাষ্ট হন্ বলে সেই গুমোরে মাটীতে পা-ই পড়ে না! আর তাকা দেখি একবার ননীর দিকে—সাঁতার বল সাঁতারে, ফুট্‌বল্ বল ফুট্‌বলে, হাইজাম্প্ বল হাইজাম্পে, রাইডিং বল রাইডিংয়ে, ছবিআঁকা বল ছবি আঁকাতে কোন্‌টায় ও পিছ্‌পা বল্ দেখি? আর এ সবের পরেও তো লেখাপড়ায় তোদের কারুর চেয়ে কম যায় না! ললিতের মত দিনরাত যদি বইয়ের ভেতরে ডুবে থাক্‌তো তবে আর ললিত্-ফলিত্‌কে ওর নাগাল পেতে হোত না। হ্যাঁ, একেই বলি চৌকশ ছেলে!"

আমি বলিলাম, "চৌকশ বলে চৌকশ, নইলে জেনেশুনে পয়লা এপ্রিল তারিখে অমন 'ফুল্' হয়? বাহাদুরী তাতে অনেকখানিই যে দরকার!"

এক বছরের পুরানো কথাটা মনে পড়ায় সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বাস্তবিকই ললিতের বুদ্ধির জোরে সেবার আমাদের কাছে ননী দারুণ জব্দই হইয়াছিল—

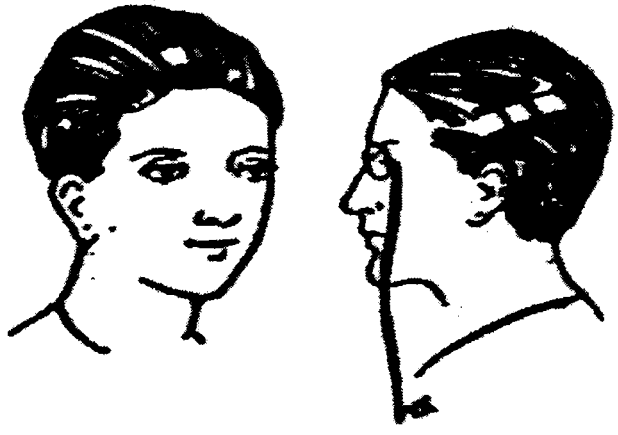

সচরাচর জানিয়া শুনিয়া লোকে অতবড় 'এপ্রিল-ফুল' বড় একটা হয় না। হোষ্টেলের খোট্টা চাকর রামভজন—যে কোন দিন কোন কথা বোঝেনা বলিয়াই সকলের বিশ্বাস—সে পর্য্যন্ত সেদিন বাঙ্গালী বামুনকে গিয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুরমোশোয়, আজ ননীবাবু বোড়ো বোকা বোন্‌ল।"

অসীম এ সমস্ত ব্যাপারের কোন খবরই রাখিত না। যদিও আমাদের সঙ্গে এসে পড়িতেছে অনেকদিন হইতেই, কিন্তু হোষ্টেলে আসিয়াছে মাত্র মাস তিনেক আগে। একটু অপ্রস্তুত হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে তাকাইতেই ব্যাপারটা তখন আগাগোড়া তাহাকে শুনাইয়া দেওয়া হইল।

ফি বছর গ্রীষ্মের ছুটীর কিছু দিন আগে আমাদের হোষ্টেলে একটা করিয়া "সোস্যাল" হইত। সেই সোস্যালের প্রধান অঙ্গ ছিল দু'টী জিনিষ। একটী বড় রকমের এক ভোজ এবং আর একটী থিয়েটার। এই থিয়েটার লইয়া এবার ভারী হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। গত দু'বছর হইতে রাজার পার্ট্ করিয়া আসিতেছে ললিত, তার ইচ্ছা এবারও সে-ই রাজা সাজে। কিন্তু বাদ সাধিল

অসীম। ব্যাপারটা লইয়া সে এমনই সব কান্ড করিতে লাগিল যে সে আর বলিবার নয়। ছেলে-মহলে নিজে রাজা সাজিবার বায়না তো সে ধরিলই, উপরন্তু একদিন সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট, অঙ্কের মাষ্টারমশায়কে পর্য্যন্ত বলিয়া আসিল যে এবার রাজার পার্ট্ তাহাকেই দিতে হইবে। কথাটা আমাদের কাণে আসিতেই খাইবার আসরে আমরা তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম, "হাঁরে, তুই নাকি ললিতকে বাতিল করে এবার নিজে 'রাজা' সাজ্‌তে চাস্?"

"চাই-ই তো! রাজা কখনো ওকে মানায়? তা হ'লে তো প্রত্যেক প্রজার চেহারাই রাজার চাইতে সুন্দর হ'য়ে যাবে! রাজা কখনো অমন চিম্‌সে ঢ্যাঙ্গাপানা হয়? রাজার কাণ কখনো অমন লম্বা হয়? তার চাইতে ওকে যে পার্টে মানাবে তাই দে না কেন? ক্লাউনের পার্ট্ দে, হাত-পা নেড়ে আর বক্তৃতে দিতে হবে না, এম্‌নিই লোকে হেসে গড়িয়ে পড়্‌বে।' তারপর ছোঁড়া হঠাৎ আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "আর ওই বিজয়টাকে চাস্ তোরা মন্ত্রীর পার্ট্ দিতে? হায়রে, তোদের কলা-জ্ঞান দেখে গেছি আর কি! কলা-জ্ঞান তো নয়, একেবারে কাঁচকলা জ্ঞান! ওর উপযুক্ত পার্ট্ হচ্ছে 'নেপথ্যে কোলাহল'; ষাঁড়ের মত গলা আছে খুব চেঁচাতে পার্‌বে। ষ্টেজের ওপর ওকে আন্‌তে আছে? সব লোক তবে থিয়েটার ছেড়ে পালাবে।"

সাড়ে দশটার সময় খোদ্ হেড্‌মাষ্টার মশায়ের ক্লাস, আর এদিকে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কাজেই মুখের আগে যে জবাবটা আসিয়াছিল সামলাইয়া লইয়া নীরবে খাইয়া উঠিলাম। মনে মনে বলিলাম, ইহার উত্তর দিব ছুটীর পর।

আমাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, অসীম ননীর হাতের পুতুল মাত্র, ননী তাহাকে দিয়া যে কথা বলাইতেছে, কলের পুতুলের মত সে তাহাই বলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ-ধারণা যে কতবড় ভুল ইস্কুল ছুটীর পরেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। 'রাজা' সাজিবার লোভে ছোকরার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া গেছে, নতুবা যে ননী তার গুরুদেবের সামিল তাকেও কিনা সে চটাইতে সাহস পায়! কথাটা একটু ভাঙ্গিয়াই বলি। গত ক' বছর হইতেই ননীর মনে মনে ভারী ইচ্ছা থিয়েটারে একবার সে রাজা সাজে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একবারও বলিতে পারে নাই। এইবার অসীমকে দিয়া কথাটা পাড়াইবে এই ছিল তার মতলব, কিন্তু ছোঁড়া একেবারে 'শুয়োরের-গোঁ' ধরিয়াছে, রাজা সে কাহাকেও হইত দিবে না—ননীকেও নয়। তবে 'মন্ত্রী' বা 'সেনাপতি' সাজিতে ননী যদি রাজী থাকে তো সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। এই লইয়াই প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মন কষাকষি এবং শেষটায় দুজনে একেবারে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেছে।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া চায়ের কাপ্ হাতে আমরা ননীর ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইলাম। মনে মনে আমাদের ভারী স্ফূর্ত্তি হইতেছিল। অসীম ছোঁড়া ওবেলা অনেকগুলি শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়াছে, এবেলা সবাই একজোটে তাহার 'শ্রাদ্ধ' করায় খুবই আনন্দ হইতেছিল। আজ ললিত এবং ননী একই ব্যথার ব্যথী, তাই তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের মনের মিল দেখা গেল। ললিত বলিল, "দোষ কিন্তু ষোল আনা তোরই ননী! তুই-ই তো ওকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছিস্। নইলে ওটাকে কি আমরা কেউ আমোলে আনি?"

ননী ফোঁস্ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হুঁ, তার ফলও আজ ভুগ্‌তে হয়েছে। ছোঁড়ার আস্পর্দ্ধা এতখানি বেড়ে গেছে যে আমায় কিনা ফস্ ক'রে বলে ফেলল 'ফুল'।"

—"তোকে বল্লে ফুল? আশ্চর্য্য তো!" অভিমানের সুরে ননী বলিল, "আশ্চর্য্য আর এতে কি আছে ভাই? শুন্‌লাম্ আমায় যে আর বছর 'এপ্রিলফুল্' করেছিলি সে গল্পই আজ ওর কাছে করেছিস্। 'ফুলের' মত কাজ করেছিলাম, 'ফুল' বল্‌বে তাতে আর চট্‌লে চল্‌বে কেন?"

ললিত উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বটে, ওকি মনে করে ওকে এপ্রিল-ফুল করা যায় না? হাঁরে, দেখ্‌তো একবার ক্যালেন্ডারখানা ফার্ষ্ট এপ্রিল কবে? বাছাধনকে মজা দেখাচ্ছি একবার।"

ক্যালেন্ডার দেখার কিন্তু প্রয়োজন হইল না, কেননা সকলেরই জানা ছিল আমাদের থিয়েটার দোসরা এপ্রিল, সুতরাং তার ঠিক আগের দিনই পয়লা এপ্রিল হইবে। ললিত কথাটা শুনিয়া চারিদিকে একটু তাকাইয়া খাটো গলায় বলিল, "বেশ, সাম্‌নেই যখন পয়লা এপ্রিল তখন ওই দিনই ওকে বোকা বানান যাক্। কি মতলব করা যায় বল্ দেখি ননী?"

ননী জবাব দিল, "ওর গলদ কোথায় তা আমার জান্‌তে বাকী নেই—ভূতের ভয়। পার্‌বি ভূত সাজ্‌তে? ফি শনিবারে সন্ধ্যার পর সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে ছুটী নিয়ে ও মামার

বাড়ীতে যায়, পথে পড়ে আমড়াতলার মাঠ-টা। সেইখানটাতে যদি.....''

আমি মহা উৎসাহে ননীর মুখের কথাটা কাড়িয়া নিয়া বলিলাম, ''আল্‌বৎ পার্‌ব। আমি আর ললিত ভূত সাজবার ভার নিলাম, বেশ ভাল দেখে মুখোস্-টুখোস্ এঁটে আমড়াতলার মাঠে.....''

বাধা দিয়া ননী বলিল, ''ও মুখোস্-টুখোসের পুরোনো আইডিয়াটা ছেড়ে দে। ওগুলো যেন মানুষের মুখের সঙ্গে খাপই খাওয়ান যায় না—কেমন আলগা আলগা দেখায়। অসীম ছোক্‌রা হুঁসিয়ার আছে, কোন মতে টের পেয়ে যায় তো 'এপ্রিল-ফুল' বনে যাবি তোরাই। তার চাইতে এক রকম রংয়ের খবর আমি জানি, সেইটে মুখে মেখে নিস্। আমি বরং চোখ, গোঁফ্, ভুরু-টুরু গুলো এম্‌নি ভাবে এঁকে দেব যে দেখ্‌তে একেবারে ব্রহ্মদত্যির মতই হবে।''

ননীর পরামর্শ মতেই কাজ হইবে ঠিক হইল। কথাটা আমাদের ক'জনার মধ্যেই গোপন রহিয়া গেল।

পয়লা এপ্রিল, শনিবারের সন্ধ্যা। একটু অন্ধকার হইতেই ননী, ললিত এবং আমি সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে একটা 'অজুহাত' দেখাইয়া রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকার অনুমতি লইয়া আসিলাম। তারপর ললিত আর আমি চট্ পট্ ননীর দেওয়া কালো রংটা মুখে লাগাইয়া লইতেই ননী তুলি দিয়া সযত্নে আমাদের চোখ, ভুরু এবং গোঁফ এমনই বীভৎস ভাবে আঁকিয়া দিল যে ললিতের চেহারা দেখিয়া আমার এবং আমার চেহারা দেখিয়া ললিতের প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম। তারপর রাত্রির অন্ধকারে কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া দুজনে আমড়াতলার নির্জ্জন মাঠে আসিয়া অসীমের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায় ঘন্টাখানেক এই ভাবে অপেক্ষা করার পর সহসা দেখি বিপরীত দিক্ হইতে কে একজন অতি দ্রুত পদে দৌড়াইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। সে আরও একটু কাছে আসিলে সবিস্ময়ে দেখিলাম ননী! ননী ঊর্দ্ধশ্বাসে বলিল, ''সমস্তই মাঠে মারা গেছে রে, পালা, এইবারে পালা! অসীম কি করে জানি না সমস্তই টের পেয়ে গেছে, ওর মামাবাড়ী থেকে জনকয়েক ভোজপুরী দর্‌ওয়ান্ নিয়ে এদিকে রওনা হয়ে

আস্‌ছে দেখে এলাম।"

দৌড়! দৌড়! এই পড়িতো এই পড়ি অবস্থায় ছুটিতে ছুটিতে কোন মতে হোষ্টেলে ফিরিয়া সটান নিজের ঘরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। আমি আর ললিত একই ঘরে রুম্‌-মেট্ ছিলাম, বাকী দু'টা সীট্ আপাততঃ খালি ছিল। তাড়াতাড়ি দরজা আঁটিয়া আমরা মুখে সাবান ঘষিতে আরম্ভ করিলাম, যথেষ্ট সাবান জল মুখে লাগান হইল, কিন্তু হরি! হরি! একি—সাংঘাতিক কান্ড, রং যে একেবারেই ওঠে না। সাবান মাখানো তোয়ালেখানা ঘষিয়া ঘষিয়া আমাদের মুখের ছাল এক পর্দ্দা উঠিয়া গেল, কিন্তু তবু সে সর্ব্বনেশে রংয়ের একটী আঁচড়ও মুখ হইতে গেল না। এইবার আমাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া বাস্তবিকই আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। ললিতের চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িয়াছিল; রাগে দুঃখে সে দাঁত কড়্‌মড়্ করিতে করিতে বলিল, "এ সব হতভাগা ননেটার চক্রান্ত। সেই অসীমের সঙ্গে সাঁট করে আমাদের ফাঁদে ফেলেছে,—গত বছর তাকে যে 'এপ্রিল্-ফুল্' করা হয়েছিল তারই শোধ তোলবার জন্যে। কি হবে এখন উপায় বিজয়—হোষ্টেলের সবাইকে এখন এ-মুখ দেখাই কি করে, অথচ না দেখালেও তো রং তোলবার আর কোন উপায়ই নেই!"

দুশ্চিন্তায় সমস্ত মাথা তখন আমার ঘুরিতেছে, উপায় বাৎলাইব আমিই বটে! ঢং ঢং করিয়া খাইবার ঘন্টা বাজিল, সিঁড়ি দিয়া হৈ-হৈ করিয়া ছেলের দল খাইতে চলিল তাহাও শুনিলাম। ক্ষুধায় নাড়ী চোঁ চোঁ করিতেছিল, অথচ খাইতে যাইবার উপায় নাই। খানিক বাদে রামভজন তদারক করিতে আসিল, দুজনেই ভিতর হইতে ক্ষুধা নাই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম; অথচ সে সময় বোধ করি না-খাইতে পারিতাম্ এমন জিনিষই নাই।

কিন্তু আজ রাত্রি না হয় যে কোন প্রকারে কাটিল, কাল প্রাতে কি হইবে? কাল আমাদের থিয়েটারের দিন, সকাল সাড়ে সাতটায় ষ্টেজ রিহার্সাল হইবে ঠিক আছে। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আসিবেন, শিক্ষকমশায়দের মধ্যেও কেহ কেহ আসিবেন, বাহিরের ছাত্রও হয়তো অনেক আসিবে। তাঁহাদের সবার সম্মুখে আমাদের উপায় হইবে কি?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে সাড়ে সাতটায়। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আয়নার কাছে গিয়া দেখি ওমা! কাল রাত্রে চেহারা যে ছিল বরং ভাল, গাল চড়াইয়া গলা ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু তাহার আর সময় হইল না, হঠাৎ দরজার সাম্‌নে এক সঙ্গে বহু লোকের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরক্ষণেই সুপারিন্টেডেন্টের গলার শব্দ পাওয়া গেল, "ললিত, বিজয়, তোমাদের তো আচ্ছা দায়িত্ব জ্ঞান দেখ্‌ছি! সাড়ে সাতটায় ষ্টেজ রিহার্সালের কথা, হেড্‌মাষ্টার মশাই, অন্যান্য টিচারেরা সবাই এসে পড়েছেন, অথচ তোমাদের দু'জনার পাত্তাই নাই! শীগ্‌গির ওঠ, দোর খোল।"

ললিত গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কোন মতে দরজা খুলিয়া দিল। তারপর? সে কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করিও না; আমার মাথা ঠিক ছিল না, হয়তো যথাযথ বলিতে পারিব না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে একটা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল, ছেলেরা হাসিতে হাসিতে এ উহার গায়ে লুটাইয়া পড়িল, এমন কি হেড্ মাষ্টার মশাই পর্য্যন্ত হাসি দমন করিতে গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিতে লাগিলেন। আর চাহিয়া দেখি ননী এবং অসীম নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিতেছে।

ননীটার ন্যাকামির সীমা নাই। সে গিয়া সুপারিন্টেন্ডেন্ট্‌কে বলিল, "স্যর, এদের না রাজা আর মন্ত্রী সাজবার কথা। তবে এরা এ-রকম মেক্ আপ্ কর্‌লে কেন?"

হাতের সাম্‌নে মুগুর থাকিলে আমি নির্ঘাৎ সেদিন ননীর মাথা ফাটাইয়া দিতাম।

(আশ্বিন-১৩৩৯)

ছবি : এম. গুহ

সম্পাদকের চিঠি

দেখতে দেখতে সন্দেশ পার করেছে শতবর্ষের গণ্ডি। তিন পর্যায় মিলিয়ে সন্দেশ-এর বয়স এখন একশো এক। ১৩২০র বৈশাখে (এপ্রিল-১৯১৩) প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশ-এর প্রথম সংখ্যা। প্রায় চোদ্দ বছর চলেছিল সন্দেশ-এর প্রথম পর্যায় (কার্তিক-১৩৩৩ পর্যন্ত)। দ্বিতীয় পর্যায় চলেছিল তিন বছর এগারো মাস (আশ্বিন-১৩৩৮ থেকে শ্রাবণ ১৩৪২)। ১৩৬৮র বৈশাখে পথ চলা শুরু হয়েছিল আজকের এই সন্দেশ-এর, সত্যজিৎ রায় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। বহু বাধা বিপত্তি পার করে তৃতীয় পর্যায়ের সন্দেশ পৌঁছে গেছে তিপান্নতম বর্ষে। একই সঙ্গে হয়েছে উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ-এর শতবর্ষ পূর্তি।

এবারের এই 'শতবর্ষ সংখ্যা' (ফিরে দেখা সংখ্যা) সন্দেশকে আমরা সাজিয়েছি গত একশো বছরের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে বাছাই করা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধর পুনর্মুদ্রণে, তবে 'সেরা সন্দেশ' ও 'সন্দেশ সেরা গল্প সংকলণ' গ্রন্থ দুটির কোনও লেখা এখানে পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এই সংখ্যার সূচীপত্রের বাইরে রয়ে গেছে সন্দেশ-এর আরও অনেক ভালো ভালো লেখা, বাদ পড়েছে অজস্র ভালো লেখকের লেখা। একশো বছর আগে প্রথম সংখ্যায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক যে আশা প্রকাশ করেছিলেন, এই সংখ্যায় আমরা তারই পুনরাবৃত্তি করি, 'ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভালো লাগে আর কিছু উপকার হয় তবে ইহার নাম সার্থক হইবে'।

এই সংখ্যা কেমন লাগল জানিও। তোমাদের অভিমত আমাদের খুব প্রয়োজন।

গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ১লা জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত নন্দনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সন্দেশ শতবার্ষিকী উৎসব। সন্দেশ-এর দুই প্রিয় বন্ধু পরিমল রায় ও কাজী অনির্বান একটি অসাধারণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। সুখচর পঞ্চমের ক্ষুদে সদস্যরা উপ্রেন্দ্রকিশোর-সুকুমারের গল্প-কবিতায় আসর মাতিয়ে ছিল। দেখানো হয়েছিল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্র 'সুকুমার রায়' ও 'টু'। পরের সংখ্যায় উৎসবের ছবিসহ বিবরণ থাকবে।

ভাল থেকো।

সঃ সঃ

শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস, এম, এস-সি

এক গ্রামে এক চাষা ছিল। সে দুই ছেলে রেখে মারা যায়। বড় ছেলের নাম মাণিক, ছোটর নাম ফটিক। বড়র বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছোটটির হয় নি। বড়টির বুদ্ধি সুদ্ধি ভাল, বেশ চাষ বাস করে। ছোটটি একটু বোকা, কাজ টাজ তেমন করতে পারে না।

যাই হোক, দুই ভায়ে মিলে মিশে বেশ থাকে, কোন রকমে দুঃখে কষ্টে দিন চলে যায়। একদিন ফটিকের বৌদি ফটিককে বললেন, "ঠাকুর-পো, বসে বসে থাক কেন? যাওনা কিছু কাঠ কেটে নিয়ে এস। আজ যদি কাঠ কেটে না আন তো খেতে পাবে না।"

খেতে পাবে না শুনে ফটিকের বড় ভয় হ'ল। সে একটা কুড়ুল নিয়ে তখনই কাঠ কাটবার জন্যে গ্রামের ধারে বনে চলে গেল। সেখানে একটা গাছে উঠে তার ডালের উপর চড়ে বসল। ব'সে একমনে কুড়ুল দিয়ে সেই ডালটারই গোড়া কাটতে আরম্ভ করল।

এক ঠাকুর দেখলেন ছেলেটা তো এখনই পড়ে মরবে। তিনি তাড়াতাড়ি কাছে এসে তাকে ডেকে বললেন—"ওরে ও বোকা ছেলে, পড়ে যাবি যে! ওমনি করে কাঠ কাটতে হয় না! নেমে আয়।" ফটিক রেগে বলল—"তুমি তো খুব জান ঠাকুর! ভারী বললে কাঠ কাটতে হয় না! এদিকে বৌদি যে বলেছে কাঠ না কাটলে খেতেই দেবে না, সে খবর রাখো?"

ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা নেমে আয়, আমি তোর খাবার ব্যবস্থা করছি।"

ফটিক গাছ থেকে নেমে এল। ঠাকুর তাকে পাথরের তৈরী একখানা থালা দিয়ে বললেন—"এর কাছে যখনই 'দাও পাঁচ তরকারী ভাত' বলে চাইবি, তখনই থালা ভ'রে ভাত ও ভাল ভাল পাঁচ রকম তরকারী পাওয়া যাবে।" ব'লে ঠাকুর চলে গেলেন। কুড়ুলটা পাশে রেখে ফটিক তখনই বসে গেল। বলল, "দাও পাঁচ তরকারী ভাত।" অমনি ভাত আর পাঁচ রকম তরকারীতে থালা ভরে গেল। ফটিক পেট ভ'রে ভাত খেয়ে কুড়ুল ও থালাখানি নিয়ে বাড়ী রওনা হ'ল। অর্দ্ধেক পথ এসে নদীর ঘাটের কাছে যখন পৌঁছেছে, তখন দেখল সাত জন রাখাল মাঠে গরু চরাচ্ছে। তাদের দেখে সে ভাবল, যাই রাখালগুলোর কাছে কুড়ুল আর থালাটা রেখে তাড়াতাড়ি নদীতে স্নান করে আসি। এই মনে করে রাখালদের ডেকে বলল, "দ্যাখ ভাই সাত রাখাল, তোদের কাছে এই কুড়ুল আর থালাটা রেখে আমি স্নান করতে যাচ্ছি। তোরা যেন থালাটার কাছে 'দাও পাঁচ তরকারী ভাত' বলে কিছু চাস্‌নে।"

এই ব'লে সে যেই স্নান করতে গেল অমনি রাখাল সাত জন মাঠে বসে থালাটা রেখে বলল, "দাও পাঁচ তরকারী

ভাত।'' অমনি থালা ভরে ভাত তরকারী এল। রাখালরা তখন মহা স্ফূর্ত্তিতে বারে বারে অমনি করে ভাত তরকারী চেয়ে নিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিল। তারপর সেই থালাখানা লুকিয়ে রেখে ঠিক সেই রকম দেখতে আর একখানা থালা এনে সেখানে রেখে দিল।

ফটিক স্নান করে এসে কুড়ুল আর নকল থালা নিয়ে বাড়ী ফিরল। বৌদি ডেকে বললেন, ''কই ঠাকুর-পো, কাঠ কোথায়?''

ফটিক ধমক দিয়ে বলল—''আনিনি কাঠ!''

বৌদি বললেন—''বেশ, তা হলে আজ আর ভাত পাবে না।''

ফটিক বলল—''নেই মাংতা ভাত!''

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—''কি খাবে তা হলে?''

ফটিক তখন থালা দেখিয়ে বলল—''এর কাছে যত ভাত চাবে তত পাবে। এই দেখ।'' ব'লে থালা বের করে বলল, ''চাই পাঁচ তরকারী ভাত।'' কিন্তু ভাতও এলনা তরকারীও এল না। ফটিক তো রেগে আগুন! ঠাকুরের উদ্দেশ্যে গাল মন্দ অনেক করল আর আছাড় মেরে থালাটা ভাঙতে গেল। বৌদি তাড়াতাড়ি থালাখানা কেড়ে নিয়ে বললেন, ''রাখো, থালাটা আর ভাঙতে হবে না। আজ তোমাকে খেতে দিচ্ছি দুটি। কিন্তু কাল যদি কাঠ না আন, কাল আর খেতে পাচ্ছ না।''

পরদিন সকাল হ'তেই ফটিক আবার চলল কাঠ কাটতে। আবার সেই গাছটার উপর সেই ডালটায় বসে তার গোড়া কাটতে লাগল। ঠাকুর দেখলেন, ছেলেটা আজ আবার সেই বোকামীই কর্‌ছে, এখনই পড়ে মরবে। ফটিককে ডেকে বললেন—''বলি ও ছেলে, আজ আবার অমনি করে ডালের গোড়া কাট্‌ছ? পড়ে মরবে যে! নেমে এস, অমনি করে কাঠ কাটতে হয় না।''

ফটিক গাছের উপর থেকেই ধমক দিয়ে বলল—''যাও ঠাকুর, তোমার কথা সব মিথ্যে, তোমার কথা আর শুনব না। আজ আমি কাঠ নিয়ে যাবই। নইলে বৌদি ভাত দেবে না।''

ঠাকুর বললেন—''নিশ্চয়ই ভাত দেবে। আজ তোকে এমন একটা জিনিষ দেব যে বৌদি ভাত তো দেবেই, আদরও

করবে অনেক।" এই ব'লে তিনি ফটিকেকে একটা গরু দিলেন। বললেন, "এই গরুটার গায় হাত বুলিয়ে যখনই বলবে, 'দাও বাপু, সোনা দাও তো', অমনি সে হাম্বা হাম্বা করে তাল তাল সোনা মুখ দিয়ে বের করে দেবে।"

ফটিকের বড় লোভ হ'ল। সে লাফ্ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়েই গরুটার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলল, "দাও তো বাপু, সোনা দাও তো।" গরুটা অমনি মুখের ভেতর থেকে এক তাল সোনা বের করে দিল।

ঠাকুর চলে গেলেন। ফটিকও কুড়ুল ঘাড়ে করে সোনাটা হাতে নিয়ে গরু তাড়াতে তাড়াতে নদীর ধার দিয়ে বাড়ী চলল। খানিক দূরে গিয়েই সে ভাবল, "আরে আমি কি বোকা রে! মিছি মিছি সোনাটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি কেন? অমন সোনা তো যখন ইচ্ছা তখনই কত পাব।" এই ব'লে সে সোনাটা ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিল। তারপর আবার চলতে লাগল। ঘাটে এসে দেখল, আজও সেই রাখাল সাতজন মাঠে গরু চরাচ্ছে। সে ভাবল, স্নানটা তা হ'লে করেই যাই। এই ভেবে রাখাল সাত জনকে ডেকে বলল, "দ্যাখ ভাই সাত রাখাল, আমি এই কুড়ুলটা আর এই গরুটা তোদের কাছে রেখে স্নান করতে যাচ্ছি। তোরা যেন গরুর গায় হাত বুলিয়ে বলিস্‌নে—'দাও তো বাপু, সোনা দাও তো'।"

এই ব'লে নিশ্চিন্ত হয়ে ফটিক স্নান করতে গেল, আর রাখালরাও অমনি গরুর গায় হাত বুলিয়ে বলল—"দাও তো বাপু, সোনা দাও তো।" বলতে না বলতে এক তাল সোনা গরুটার মুখ থেকে বের হয়ে এল। রাখাল সাতজন তখন মহা আনন্দে সেই গরুটা ও সোনাগুলি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে দিল এবং খুঁজে খুঁজে ঠিক সেই রকম দেখতে আর একটি গরু এনে সেখানে রাখল। ফটিক স্নান ক'রে এসে নকল গরুটা আর কুড়ুলটা নিয়ে বাড়ী গেল।

বৌদি ডেকে বললেন—"কই ঠাকুর-পো, কাঠ কোথায়?"

ফটিক বলল—"কাঠ আনি নি।"

বৌদি বললেন—"তা হ'লে ভাত আর চাও না?"

বুক ফুলিয়ে ফটিক জবাব দিল—"নেই মাংতা।"

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ বুঝি ঐ গরুটা তোমায় খেতে দেবে?"

ফটিক বলল—"আলবৎ! দেখবে?" ব'লে গরুটার গায় হাত বুলিয়ে বলল, "দাও তো বাপু, সোনা দাও তো।" একবার নয়, দুই বার নয়, তিন তিন বার ক'রে বলল। সোনা কিন্তু বিন্দুমাত্র বের হ'ল না।

ফটিক তো রেগে উগ্রচণ্ডি! একটা ঠ্যাঙা নিয়ে গরুটাকে এই মারে তো এই মারে। বৌদি এসে তাড়াতাড়ি লাঠিটা কেড়ে নিলেন; বললেন, "খুব বীরত্ব বোঝা গেছে! ওটাকে মেরে কি হবে শুনি। যাও এখন ঠাণ্ডা হও। আজও না হয় দুটো খেতে দেব, কিন্তু কাল যদি কাঠ না আনো তো কিছুতেই ভাত দেব না তা মনে রেখো।" এই ব'লে গরুটাকে গোয়ালে নিয়ে চললেন; ভাবলেন, যা হোক একটা গরু তো এল; কাঠ না হয় আজ নাই এসেছে।

পরদিন সকালে ফটিক কুড়ুল নিয়ে কাঠ কাটতে গেল। সেই আধকাটা ডালে চ'ড়ে ব'সে তার গোড়াটা আবার কাটতে লাগল।

ঠাকুর এসে দেখলেন ছেলেটা আজও সেই আহাম্মকি করছে। আর ৭/৮ কোপ মারলেই তো ডাল শুদ্ধ মাটিতে প'ড়ে মাথা ভেঙে মরবে!

ফটিককে ডেকে বললেন—"বলি ও ছেলে, ওরে রোজ রোজ সকালে তোর এ কি বুদ্ধি হয় বল্ ত? আমি যে তোকে থালা দিলাম, গরু দিলাম, তা করলি কি?"

ফটিক ডালের উপর তিন কোপ মেরে বলল—"যাও ঠাকুর, বিরক্ত করো না। থালা দিলেন, গরু দিলেন, একবার ছাড়া দু'বার তাতে কাজ হয় না, তাই আবর বলা হচ্ছে!"

ঠাকুর তখন সব বুঝতে পারলেন। বললেন—"আচ্ছা, আয় তুই নেমে, আজ তোকে এমন জিনিষ দেব যে খাওয়া তো দূরের কথা, তুই রাজা হয়ে যাবি।"

এই ব'লে একটা ঘোড়া নিয়ে এলেন; আর তার সঙ্গে এল, একটা লাঠি ও বাঁশের একটা নল। ফটিকের বড় লোভ হ'ল। আজ আবার কি মজা হয়! সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল।

ঠাকুর বললেন—"যা, ঘোড়ার উপর গিয়ে চ'ড়ে বোস। এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে নলটা নিয়ে বল্, 'লাগাও লাঠি'।"

একটুও সবুর সইল না। ফটিক লাফ দিয়ে ঘোড়ার উপর চড়ে বসল। লাঠি ও নল হাতে নিয়ে বলল 'লাগাও লাঠি'।

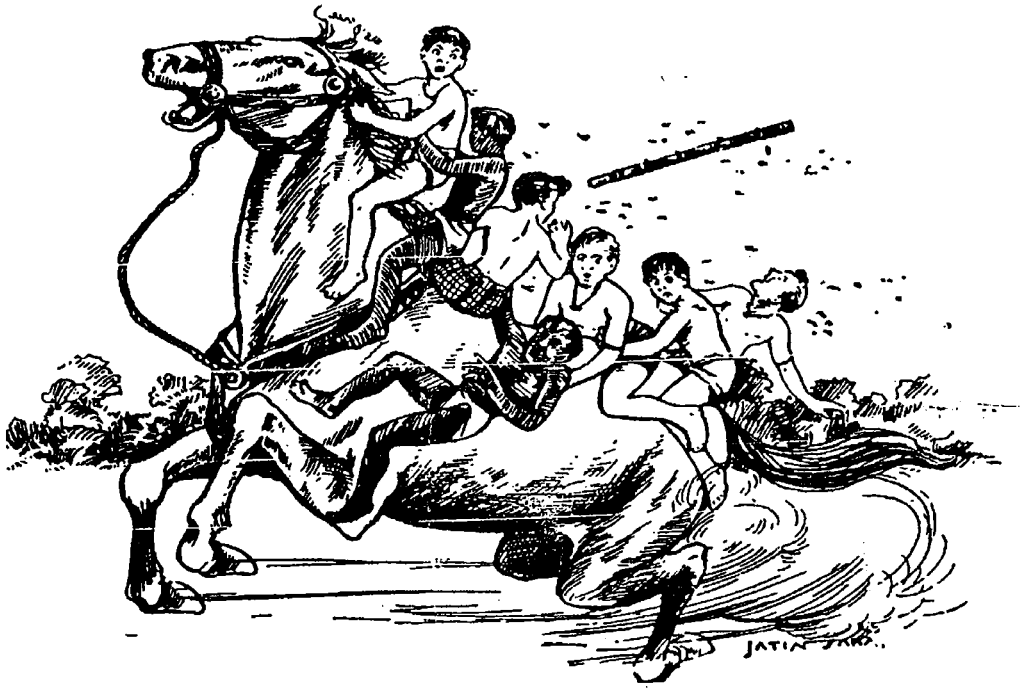

যেমনি বলা অম্‌নি এক ভীষণ ব্যাপার আরম্ভ হ'ল। ঘোড়াটা পাগলা হ'য়ে লাফাতে লাগল, তার ঝাঁকানীর চোটে প্রাণ যায় আর কি! শুধু কি তাই? লাঠিটা যেন তার হাত থেকে একটা ভূতে কেড়ে নিয়ে ফটিককে দমাদম্‌ বেদম মারতে সুরু করল। আর নলটার ভেতর থেকে হাজার হাজার মৌমাছি আর ভীমরুল বের হয়ে তাকে কামড়াতে লাগল। ফটিক তো 'বাবা রে, মা রে, গেলাম রে, মরলাম রে' বলে চেঁচিয়ে অস্থির! ঠাকুর তখন বললেন—"আচ্ছা এইবার বল, রাম রাম, থাম্‌ থাম্‌।"

ফটিক ওকথা বলতেই সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। ঘোড়াটা যেন কাদার তৈরী—এমনি শান্ত! লাঠি তো তার হাতেই রয়েছে। মৌমাছি ভীমরুলের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই!

ফটিক কিন্তু গোড়া থেকে নেমেই ঠাকুরকে খুব বকল। ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা বাপু, ঘোড়া নিয়ে তুই বাড়ী যা। যদি এতে তোর ভাল না হয় বা ভাত খেতে না পাস তো কাল এখানে এসে তোর কুড়ুল দিয়ে আমাকে দু টুকরো করে কেটে ফেলিস্‌।" ফটিক তখন কি আর করে—ঘোড়া লাঠি ও নল নিয়ে, কুড়ুল ঘাড়ে ক'রে বাড়ী চলল।

ঘাটের কাছে এসে বলল—"বাবা গা হাত পা এখনও জ্বলছে। যাই স্নানটা ক'রে আসি।" চেয়ে দেখল সেই রাখাল সাতজন সেদিনও গরু চরাচ্ছে। তাদের ডেকে বলল—"দ্যাখ ভাই সাত রাখাল, আমি স্নান করতে যাচ্ছি। তোরা যেন এই ঘোড়ার উপর চড়ে, লাঠি আর নল হাতে করে, 'লাগাও লাঠি' বলিস্‌ না। তা হ'লে কিন্তু বড় মুস্কিল হবে।"

এই ব'লে ফটিক স্নান করতে গেল। রাখালরা ভাবল—আজ নিশ্চয়ই হীরে জহরৎ পাওয়া যাবে। তারা আর দেরী না করে সাত জনই ঘোড়ায় চ'ড়ে বসল, এবং লাঠি ও নল হাতে করে বলল "লাগাও লাঠি।" আর কোথায় যাবে! ঘোড়ার সেই পাগলা লাফ্‌, লাঠির সেই ভূতুড়ে মার, আর ভীমরুল, মৌমাছির খ্যাচা-র‍্যাচা কামড় আরম্ভ হ'ল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল, সাতটা ষাঁড়ের মত গলায় "বাপ রে, মা রে মলাম রে" চীৎকার! কিন্তু চীৎকার করলে হবে কি? থামাবে কে? কেউ তো আর কাছে নেই।

মার খেয়ে, কামড় খেয়ে যখন তারা প্রায় আধমরা হয়ে পড়েছে তখন ফটিক স্নান করে ফিরে এল। তাকে আসতে দেখেই রাখাল সাতজন চীৎকার করে বলতে লাগল—"বাঁচাও ভাই, থামাও ভাই; আর করব না। তোমার থালা গরু এখনই এনে দিচ্ছি। আর কখনো আমরা চুরি করব না।"

ফটিক তখন বলল, "রাম রাম থাম থাম।" অমনি সব থেমে গেল। দু জন রাখাল ছুটে গিয়ে তখনই ভাত-তরকারী-

দেওয়া থালা আর সোনা-বের-করা গরু এনে দিল। ফটিক তখন ঘোড়া গরু থালা নিয়ে মহা স্ফূর্ত্তিতে বাড়ী চলল।

বাড়ী গিয়ে দেখে তার দাদা বৌদি তার জন্য বসে আছেন। ফটিককে দেখেই তার বৌদি বললেন, "আজও কাঠ আননি ঠাকুর পো? আজ আর ভাত পাবে না।"

ফটিক বুক ফুলিয়ে থালা বাজিয়ে বলল—"নেই মাংতা! এই দ্যাখো।" থালাটা মাটিতে রেখে বলল—"দাও পাঁচ তরকারী ভাত।" অমনি সুন্দর পাঁচ রকমের তরকারী আর ফুটফুটে থালা ভরা ভাত বের হয়ে এল। দাদা বৌদি তো অবাক!

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—"আর গরুটাতে কি হবে?" ফটিক অমনি গরুর গায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "দাও তো বাপু, সোনা দাও তো।" অমনি গরুর মুখ থেকে এক তাল সোনা বের হয়ে এল। দেখে সকলের কি স্ফূর্ত্তি! বৌদি তো তাড়াতাড়ি গিয়ে সোনাটা কুড়িয়ে নিলেন।

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘোড়াটা দিয়ে কি করবি?" ফটিক বলল, "এস না দাদা ঘোড়াটা দিয়ে কি হয় দেখিয়ে দিই।" ব'লে দাদাকে ঘোড়ার উপর চড়িয়ে দিয়ে তার হাতে লাঠি আর নল দিয়ে দিল। বলল —"বল, লাগাও লাঠি।" দাদা যেই বলেছেন 'লাগাও লাঠি', অমনি সেই ভূতুরে কাণ্ড, আর সঙ্গে সঙ্গে দাদার ভীষণ চীৎকার আরম্ভ হ'ল। ফটিক তখন "রাম রাম থাম থাম" বলে সব থামিয়ে দিল।

তারপর থেকে মানিক ফটিকদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! তারা একটা ইঁটের পাকা ঘর তৈরী করে তার মধ্যে গরুটাকে নিয়ে গিয়ে তার গায় হাত বোলায় আর খালি বলে—"দাও তো বাপু সোনা দাও তো, দাও তো বাপু সোনা দাও তো।" এমনি করে সমস্ত ঘরটা সোনা দিয়ে ভরে ফেলল।

সেই সব সোনা দিয়ে মস্ত একটা রাজ্য কিনে ফেলল। ফটিক এখন মনের সুখে রাজত্ব করছে। তার অগাদ সম্পদ ও জাঁক জমক দেখে দুনিয়া শুদ্ধ লোক বলতে লেগেছে—রাজা তো রাজা, ফটিক রাজা!

তার পর মহা ধূমধাম করে ফটিকের বিয়ে হ'ল। লাখ লাখ লোককে খাওয়ান হ'ল। কারো কিছুমাত্র কম পড়ল না। কম পড়বেই বা কি করে? থালার কাছে যত চাওয়া যায় ততই নানা রকম তরকারী ও ভাত এসে হাজির হয়।

আর ঘোড়াটাও কি কম কাজে লেগেছিল! যখনই কোন চোর ডাকাত বা বদমাইস রাজ্যে এসে ধরা পড়ত, অমনি তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে ভূতুরে মার খাওয়ান হ'ত। তারা জন্মে আর কখন চুরি ডাকাতি করত না।

ছবি: যতীন সাহা

(বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ-১৩৪০)

নন্দনে সন্দেশ-এর শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সম্পাদকের সঙ্গে লেখিকা নবনীতা দেব সেন

বাতাসের গান

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে;
মোরা নাচি সুরধুনী কুলে কুলে।

কখনো চলি বেগে কভু মৃদুচরণে,
কখনো ছুটি মোরা ফুল ফল হরণে;
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি,
তা গেছি ভুলে।

খেলি লুকোচুরি কভু বনে
মাতি নিধি সনে কভু রণে
ভাসি আকাশে নীরদ সনে
শত পাল তুলে।

যখন থাকি ঘুমে থাকে ঘুমে ধরণী
গহন, নদী, নিধি, নভে মেঘ তরণী;
পুনঃ জাগে হরষে মোদের পরশে
নয়ন খুলে।

(পৌষ-১৩২৫)

দ্রিঘাংচু

শ্রীসুকুমার রায়

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওম্‌রা, সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা হ'তে একটা দাঁড় কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর ব'সে ঘাড় নীচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বল্ল "কঃ"।

কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ,—সভাশুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হ'য়ে উঠ্‌ল—সকলে একেবারে এক সঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী একতাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসে ছিল সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই ক'রে রাজার মাথার উপর প'ড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বল্লেন, "জল্লাদ ডাক"।

বল্‌তেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বল্লেন "মাথা কেটে ফেল"। সর্ব্বনাশ! কার মাথা কাট্‌তে বলে? সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজা মশাই খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বল্লেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় ক'রে বল্ল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বল্লেন, "ব্যাটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে? যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ ক'রেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাশুদ্ধ সকলে হাঁফছেড়ে এমন ভয়ানক নিঃশ্বাস ফেল্ল যে কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, ওই কাকটাই ওরকম আওয়াজ ক'রেছিল। তখন রাজা মশাই বল্লেন, "ডাক, পণ্ডিতসভার যত পন্ডিত সবাইকে"। হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ ক'রে এমন গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বল্‌তে পার?'

কাকে আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি? পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মত পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল—"আজ্ঞে বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল"।

রাজা মশাই বল্লেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আস্‌তে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রী হয়! মন্ত্রী ওঁকে বিদেয় ক'রে দাও"—সকলে মহা তম্বী ক'রে বল্ল, "হাঁহাঁ ঠিক ঠিক, ও'কে বিদেয় করুন"।

আর একজন পণ্ডিত বল্লেন, "মহারাজ কার্য্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হ'লেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখ্‌লেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্য্যের নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি"?

রাজা বল্লেন, "আশ্চর্য্য এই যে, তোমার মত মোটা-বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল-তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর"। অমনি সকলে হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌লেন, "মাইনে বন্ধ কর"।

দুই পণ্ডিতের এ রকম দুর্দ্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুর মত খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম, সকলে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হ'য়ে উঠ্‌ল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক প'ড়ে গেল। ব'সে ব'সে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজামশায়ের খিদেও নাই বিশ্রামও নাই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হ'য়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্ম্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে এমন সময় রোগা সুঁটকো মত একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে প'ড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "কি হ'ল, কি হ'ল"?

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বল্ল, "মহারাজ, সে কি দাঁড়কাক ছিল" সকলে বলল, "হাঁ হাঁ হাঁ—কেন বল দেখি"? লোকটা আবার বলল, " মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নীচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়ে ছিল আর "কঃ" ক'রে শব্দ ক'রেছিল"? সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে বল্ল, "হাঁ হাঁ—ঠিক ঐ রকম হ'য়েছিল"। তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায় হায় সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন"?

রাজা বল্লেন, "তাই ত, একে তখন তোমরা খবর দেওনি কেন"? লোকটাকে কেউই চেনে না তবু কেউ সে কথা বলতে সাহস পেল না. সবাই বল্ল. "হ্যাঁ. ওকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কি খবর দেবে, একথা কেউ বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বল্ল, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বল্লেন, "দিঘাঞ্চু কি হে"? লোকটা বলল, "দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝ্‌তে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল "ও!" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন "সে কি রকম হে?" লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খমানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলে বেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আস্‌ছি—তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মত। সে যখন সভায় ঢোকে তখন সিংহাসনের ডান দিকে থামের উপর বসে, মাথা নীচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমিত আর কিছু জানিনা—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন—পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।"

রাজা বল্‌লেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তমি থাকলে করতে কি?" লোকটা বলল. "মহারাজ. সে

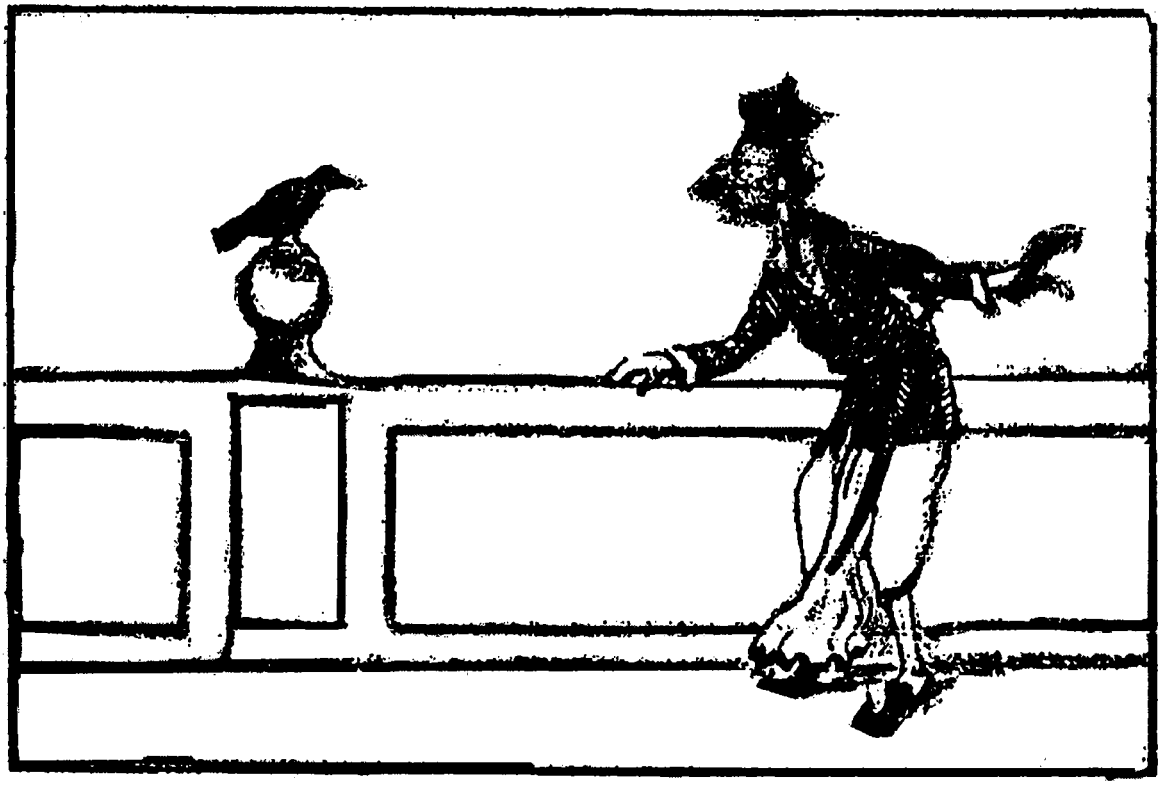

কথা বল্‌লে যদি লোকে বিশ্বাস না করে তাই বল্‌তে সাহস হয় না"।

রাজা বল্লেন, "যে বিশ্বাস করবে না তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল"। সভাশুদ্ধ লোক তাতে হাঁহাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বল্ল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধ'রে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র তাকে যদি বল্‌তে পারতাম তা হ'লে কি যে আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'ত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোন বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব"? রাজা বল্লেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত"। লোকটা বল্ল, "সর্ব্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই"। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দুদিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সাম্‌নে দাঁড় কাক দেখলে তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ"!

তখন সভা ভঙ্গ হ'ল সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য্য ফল পাওয়ার কথা, বলাবলি করতে করতে বাড়ী চ'লে গেল।

তারপর রাজামশাই দুদিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকাল বেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালী
ধর্ম্মতলা কর্ম্মখালি।"

রাজামশাই গম্ভীর ভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোন রকম আশ্চর্য্য কিছু হয় কিনা! কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোন সন্ধান পা'ন নি।

(কার্তিক-১৩২৩)

ছবি: সুকুমার রায়

সাহিত্য বিহার-এর ছোটদের বই

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
● ইন্দ্রনাথ	২৭.০০
● ছেলেবেলার গল্প	২০.০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	
● শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প	১০০.০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
● শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প	১০০.০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	
● শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প	১০০.০০
● বাছাই গল্প	৪০.০০
লীলা মজুমদার	
● গল্প সল্প	৩৫.০০
● নোটোর দল	৩০.০০
কুমারেশ ঘোষ	
● হরেক রকম্‌বা	৩০.০০
অমরনাথ রায়	
● বীরসিংহের সিংহশিশু	৪০.০০
জ্যোতিভূষণ চাকী	
● খাপখোলা তলোয়ার	২৫.০০
জগদানন্দ রায়	
● গাছপালা	২২.০০
সুনীল জানা	
● খড়ের মুকুট	২২.০০
চিত্তরঞ্জন মাইতি	
● আলোর ভুবন (১)	২৫.০০
● " " (২)	২২.০০
শৈলেন চক্রবর্তী	
● বিশ্বসেরা ছয় আবিষ্কার	২২.০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	
● একটি লাল লঙ্কা	৩০.০০
কার্তিক ঘোষ	
● গাছের কান্না	২২.০০
● জল আমাদের জীবন	২০.০০

সাহিত্য বিহার

প্রাপ্তিস্থান : ওরিয়েন্টার বুক কোম্পানি প্রা. লি.
৫৬, সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ২৩৫৪ ০৭২৮ / ২৩৫০ ৪৫৩৪
Email : sailen.air@ gmail.com/sahityabihar@ gmail.com

শ্রীসমর দে

মোহনপুরের জমিদার বাড়ীর নাটমন্দিরে লোকে লোকারণ্য—ঠেলাঠেলি—ধাক্কাধাক্কি। সে কি ভীড়ের ভীড়!

মেঝোবাবুর ছেলের অন্নপ্রাসন; কলকাতা থেকে খুব নামকরা যাত্রার দল এসেছে। সব প্রজাদের নেমন্তন্ন। তার ওপর আবার পালাটাও খুব ভাল—'পঞ্চনদ'। ভীড় হবে না তো কি? আশে পাশের গ্রাম উজাড় করে তো সব এসেছেই—এমন কি দু'চার ক্রোশের লোকেরাও। নাটমন্দিরের থামে থামে রং বেরং-এর আলোয় আলোয় রাতকে দিন করে ফেলেছে।

আসর বেশ জমে উঠেছে; এমনি সময় চার জুড়িদার এসে গলা সাধ্‌তে সুরু করে দিল। সামনেই অনেক খানি জায়গা দখল করে একদল ছেলে গুম হয়ে যাত্রা শুনছিল কিন্তু এই হতভাগা জুড়িদারদের চীৎকারে বিরক্ত হয়ে উঠলো।

যে ছেলেটি সবার আগে বসে ছিল তার নাম তড়িৎ। তড়িৎকে ও-দলের পাণ্ডা বল্‌লেও অন্যায় হয় না; কারণ ওর কথায় আর সবাই উঠ্‌তো বস্‌তো।

তড়িৎ ফেলুকে বল্‌লো, "চল্ খানিকক্ষণ বাইরে থেকে ঘুরে আসি। এ ব্যাটাদের গর্দ্দভরাগিণীর জের শিগগীর মিট্‌বে বলে মনে হচ্ছে না।" বাইরে এসে তড়িৎ বললো, "ভাবছিলাম আজ্‌কের পালাটা ভাল করে শুনব; কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া জুড়িদাররা যেম্‌নি ভাবে গলা ভাঁজতে সুরু করেছে—এতে সরে পড়াই ভাল।" তারপর চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে খাটো গলায় বললো, "পাঁজি দেখেছিস্?" সবাই অবাক্ হয়ে বললো, "পাঁজি? কেন বলতো?"

"দুর্ বোকারা, আজকে যে নষ্টচন্দ্র?"— "আজ নষ্টচন্দ্র"—"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ! সে খবরও রাখিস না? তোরা দেখছি সবাই ভালমানুষ হয়ে চল্‌লি রে!"

ফূর্ত্তিতে অধির হয়ে ফেলু একটা লাফ মেরে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই—তড়িৎ ওর মুখ চেপে ধরে বললো, "আস্তে, আস্তে! চেঁচাস্‌নে!" হাত ছাড়িয়ে দিয়ে আবার ফেলু বললো, "ওরে ভালই হয়েছেরে, আজ পাকা ফলার—যাও দু'হাতে তোলো আর খাও! এন্তার খাও বাবা, এন্তা—র খাও। কেউ দেখবার নেই! কেউ কইবার নেই! বিলকুল যাত্রার আসরে মসগুল। চল তাড়াতাড়ি।"

ফেলু বললো, "বড্ড গরম বোধ হচ্ছে, আগে চল প্যারীবাবুর বাগানে ডাবের জল খেয়ে—দিল খোলাসা করি, তারপর শিববাবুর বাগানের কলা, বাড়ুয্যেমশাইর আখ, রাধন পোদ্দারের শশা এতো আছেই।" ফেলু ক্যান ক্যানে গলায় বললো, "তারপর মদন ময়রার দোকানে হানা দিয়ে 'মিষ্টিমুখ'!— কি বলিস? বলেই হিঃ হিঃ করে হেসে উঠ্‌লো। টুক্কু এক হুমকী ছেড়ে বল্‌লো, "নে নে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেক্‌চার ঝাড়লে হবে না—চল্।"

দুই

জমিদারবাড়ী থেকে বেরিয়ে ওরা রওনা হ'ল শিববাবুর কলা বাগানে। বড় রাস্তায় উঠে খানিকটা পথ এগুতেই, ফেলু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"ওরে বাবা! সামনে ওটা কি?" সকলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে তাইত দূরে মস্ত বড় একটা সাদা ভূতের মত টলতে টলতে এগিয়ে আস্‌ছে না! ভয়ে জড়সড় হয়ে ফেলু চেঁচিয়ে বললো, "ওরে বাবারে! এযে মস্ত বড় ভূত! চল্ বাঁচতে চাস্ তো পালাই শিগগীর। কাজ নেই বাবা নষ্টচন্দ্রে!" তড়িৎ ওদের সাহস দিয়ে বললো, "ভয় নেই। আরে ভূতই যদি হয়, তো এতগুলো লোক একটা ভূতকে সায়েস্তা করতে পারবোনা?" তা' বললে কি হয়! ভূতটা যে ক্রমেই টলতে টলতে এগিয়ে আস্‌ছে! আর একটু হলেই হয়তো ঘাড়ে চাপ্‌বে! রইল পরে নষ্টচন্দ্র!—ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ওরা যে যেদিকে পারলো আপ্রাণ চেষ্টায় ছুট্‌লো।

তড়িৎ কিন্তু ঘাব্‌ড়াবার ছেলে নয়! সাহস করে এগিয়ে দেখে সাদা ভূত আর কিছুই নয়, একটা গরুর গাড়ীর ছাদ সাদা কাপড় দিয়ে ছাউনি দেওয়া! দেখেতো ও হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লো। তড়িৎকে হাসতে দেখে গাড়োয়ান বল্‌লো, "কি হয়েছে খোকাবাবু?" তড়িৎ বললো, "সব সাহসীর দল কিনা তাই!"—

যাক্! ভূতের ঘাড়ে চেপে তড়িৎ যখন ফেলু, খেলু, টুক্কুকে ডাক্‌লো, তখন ওদের ধড়ে প্রাণ এলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে ওরা বললো—"দুর ছাই! এরই জন্য এত ভয়?" তড়িৎ বললো, "তোদের মত সাহসী নিয়ে—" । ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ফেলু বললো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের নিয়ে খুব সুবিধে হবে। তুই ভাবিস কি? এবার ভূত কেন, ভূতের ঠাকুর্দ্দা এলেও আর আমরা কেউ ঘাব্‌ড়াচ্ছিনা, চল্ শিগগীর।"

বড় রাস্তা থেকে নেমে একটা সরু পথ ধরে ওরা চল্‌লো কলা বাগানের দিকে। কিছুদূর এসে পথটা ঘুরে একটা বাড়ীর উঠোনের ওপর দিয়ে চলে গেছে। তড়িৎ বললো, "আরে কে আর এখন জেগে আছে? যারা জাগবার তারা এতক্ষণে যাত্রার আসরে বিভোর।" চোরের মত পা টিপে টিপে উঠোন পেরিয়ে ওরা পুকুর পাড়ের ধার দিয়ে চললো। সামনেই কলাবাগিচা। বাঁশ দিয়ে উঁচু করে বেড়া দেওয়া। কোন দিক দিয়েই ভেতরে ঢোকবার সুবিধে নেই। দরজার সামনে এসে ওরা দেখে, দরজায় কুলুপ দেওয়া। ফেলু বলল, "হয়েছে আজ কলা খাওয়া! চল দেখি অন্য কোথাও সুবিধে করা যায় কিনা।"

হঠাৎ তড়িতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ও বেড়ার পাশে একটা গাছে চড়লো; তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে ধুপ করে—একেবারে বাগানের ভেতর! কাছেই মালীর ঘর, তড়িৎ পা টিপে টিপে ঘরের বেড়ায় কান ঠেকিয়ে দেখলো—ভেতরে কারুর নাক ডাকানির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আর চাই কি! মালীতো গেছে যাত্রা শুনতে। আনন্দে অধির হয়ে বললো, "মালী নেইরে। তোরা পেছনের দরজার কাছে যা, খুলে দিচ্ছি।"

দরজা খুলে দিতেই তিনজনে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ফেলু বললো, "কোন গাছে কলা পেকেছে আগে তাই খোঁজ্।" এসব কাজে তড়িতের মাথায় বুদ্ধি খেলে বেশী। ও বললো, "আরে গাছে চড়া পরে হবে, আগে চল্ মালীর ঘরে।" টুকু বললো, "কেন রে?" —কেন আবার কি? আগে চল্ না! বেটা রোজ রোজ বাজারে পাকা কলা বেচতে নেয়—আজ ঘোল খাইয়ে তবে ছাড়বো।" ঠোঁট টিপে হাসতে হাস্‌তে ওরা মালীর ঘরের কাছে এল; কিন্তু দরজায় তালা দেওয়া। অনেক কল-কৌশলে তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলো। ঘরে পা দিয়েই ফেলু বললো, "আঃ কি চমৎকার পাকা কলার গন্ধ!" — কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করেও সে পাকা কলার সন্ধান মিললোনা! হঠাৎ তড়িতের চোখ পড়লো মাচার নীচে খানিকটা বালীর ওপর। বালী সরাতেই কলা বের হয়ে পড়লো।

তারপর মজা দেখে কে! চারজনে মাচার নীচে বসে কলা তোলে আর কপাকপ্ গেলে। এমনি করে সমস্ত কলা সাবাড় করে ওরা বেরিয়ে পড়লো। তড়িৎ কিন্তু ঘর থেকে মালী বেচারীর কাটারী আর দড়িগাছা নিতে কসুর করলো না।

পথে বের হয়ে তড়িৎ বললো, "চল এবার ডাব খেতে প্যারী বাবুর বাগানে।"

তিন

পুকুরের পশ্চিম পাড়ের পথ ধরে, উত্তর পাড়ার ভেতর দিয়ে ওরা যখন ক্ষেত্র বাবুর বাগানে পৌছাল, তখন রাত দেড়টা! চারিদিকে হুয়া হুয়া রবে শেয়াল ডাকছে। তড়িৎ সড়সড়িয়ে গাছে উঠে পড়ল। তারপর দড়িটার একদিক গাছের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আর একদিক বাগানের বাইরে টুক্কুদের কাছে ছুঁড়ে ফেললো। ওরা দড়ি টেনে ধরার সাথে সাথেই তড়িৎ

অনেকগুলো ডাব দড়ির গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে সুড়সুড়িয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লো—অমনি ডাবগুলোও দড়ির গায়ে ঝুলতে ঠুলতে এক্কেবারে বাগানের বাইরে টুক্কুদের কাছে।

কাছাকাছি একটা পোড়োবাড়ী ছিল; ওরা ডাবগুলো সেখানে বয়ে নিয়ে একে একে সবগুলো ডাবই সাবাড় করে, চল্‌লো আবার আখ খেতে।

আখ ক্ষেতে গিয়ে তড়িৎ বললো, "টুক্কু তুই এই দিকটায় পাহারা থাক্, আর, ফেলু ঐ দিকে যা।" তারপর ফেলুকে ইসারায় ডেকে আখ ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ভেতরে গিয়ে তড়িৎ দা দিয়ে আখের গোড়ায় কোপ সুরু করলো। কোথায় আখ কাটবে তা না ঠক্ ঠক্ শব্দ করে উঠ্‌লো।

ফেলু বললো, "ওরে সর্ব্বনাশ করলি, ওটা আখ নয়! আখ নয়!"

এদিকে শব্দ শুনে ঘর থেকে ক্যান কেনে গলায় কে যেন বলে উঠলো "কেরে-বাগানে? কে—কে?" বেগতিক দেখে ফেলু তো হুড় মুড় করে মারলো এক দৌড়। আখের পাতায় হিঁচ্‌কে লেগে ওর পা কেটে গেল। তড়িৎ আর কি করে, সেও অগত্যা সটান দিল।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে সবাই একেবারে তড়িৎদের বৈঠক খানাতে। এতক্ষণে ফেলুর ভয় ভেঙ্গেছে। সে হোঃ হোঃ করে হেসে বললো, "তড়িৎ, তুই কিনা শেষে আখ ভ্রমে বাঁশের খুঁটিতে কোপ মার্‌লি?" তড়িৎ বললো, "আরে দেখলুম তোদের সাহসের দৌড়!"

দেওয়ালের ঘড়িতে ঠং ঠং করে তিনটে বাজলো। টুক্কু বললো, "থাক, খুব খেয়েছি বাবা, আর কত? লাভের ভেতর ও আখ খেলে জিব্ কাট্‌তো।" ফেলু হেসে বললো "আঙ্গুর যখন নাগালের বাইরে তখন তাকে টকই বলতে হবে, এইত?—ওসব বাজে কথা রাখ্, সোজা কথায় বল্—আখ খেতে পেলুম না।"

টুক্কু বললো, "নে নে হয়েছে, আর তর্ক করতে হবেনা; চল্ আবার যাত্রার আসরে, এতক্ষণে হয়তো পালাটা বেশ জমে এসেছে।" ফেলু টুক্কুকে বাধা দিয়ে বললো, "আরে রেখে দে তোর যাত্রা।" তারপর তড়িতের দিকে চেয়ে বললো, "আরে আসল কথাটাই ভুলে গেছি। বলেছিলুম না, যে মিষ্টিমুখ করতে হবে সেইটেই যে বাকী রয়ে গেল।" ফেলু খেলুকে এক ধমক দিয়ে বললো, "নে নে হয়েছে, আর মিষ্টিমুখে কাজ নেই—চল যাত্রার আসরে।"

এতক্ষণে তড়িৎ মুরুব্বির মত বলে উঠলো—"বড্ড ইয়ার হয়েছিস্ ফেলু, না!—খেলু ঠিকই বলেছে, মিষ্টিমুখ করতেই হবে। বিকেলে নবীন ময়রার দোকানে যা রসগোল্লা তৈরী করতে দেখেছি—জমিদার বাড়ীর বায়না! আঃ, জিব বেয়ে জল ঝরছে রে! আর পাচ্ছিনা, চল শিগগীর।"

চার

বাজারে ঢুকতেই নবীন ময়রার দোকান মস্ত একটা বট

গাছের তলায় চারজন। দোকানের কাছাকাছি যেতেই একটা খেঁকি কুকুর ভয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে উঠে পালালো।

তড়িৎ বললো, "দাঁড়া, আর এগুস্‌নে! দেখি আগে কেউ জাগলো কিনা।" একটু কান পেতে থেকে পা টিপে টিপে সবাই একেবারে—দোকান ঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তড়িৎ বললো, "দোকানে বোধকরি সেই হাবাটা ঘুমুচ্ছে।" টুক্কু বেড়ার ফাঁক্ দিয়ে উঁকি মেরে দেখে—ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলছে; আর কাঠের সিন্ধুকের ওপর হাবা দিব্বি আরামে ঘুমুচ্ছে। তার নাক ডাক্‌ছে—ঘড়্, ঘড়্, ঘড়্। খেলু বললো, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, আর দেখ্ মেঝেতে বড় দু' দুটো কড়া ভর্ত্তি রসগোল্লা—রসে হাবুডুবু খাচ্ছে!" তড়িৎ বললো, "চুপ. চুপ! টের পায়তো সবই মাটী।" তারপর দা' দিয়ে চোরের মত বেড়া কেটে একে একে সবাই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ফিস্ ফিস্ করে তড়িৎ বললো, "এত বড় কড়া টেনে বাইরে নেওয়া মুস্কিল হবে। তার চাইতে আলোটা নিবিয়ে দে, এখানে বসেই সৎকার করা যাক। আরে হ্যাঁ, ও হাবার ঘুম সহজে ভাঙ্গলে তো।"

তারপর আর কি? সবাই মনের সুখে অন্ধকারে কপাকপ্ সুরু করলো। হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ হইতেই ওরা ভাবলো, হাবার বুঝি ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

ফেলু, 'সারলেরে' বলে তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াতেই—তার মাথার সাথে ঠকাস করে কি একটা লেগে একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে মেঝেতে পরে গেল।—সাথে সাথে 'ওরে বাপ্‌রে গেলাম' বলে সবার ছুটাছুটি দেখে কে! তড়িৎ বেচারী পর তো পর এক্কেবারে জলন্ত উনোনে! চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে বেড়া ভেঙ্গে যে যেদিকে পারলে ভোঁ দৌড়!

চেঁচামেচি শুনে আঁৎকে উঠে হাবা হাঁউ মাঁউ করে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে লণ্ঠন হাতে পাশের দু'চার দোকানের লোক ছুটে এলো—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

আর ব্যাপার কি!—হাবাতো এদিকে সিন্ধুক থেকে পড়ে, হাত পা ভেঙ্গে চোখ কপালে তুলে—গোঁ গোঁ করছে; আর ঘরময় রসগোল্লার হরির লুট।

ওপরে তাকাতে সবাই দেখলো, সিকেয় তোলা বড় একটা কড়া কাৎ হয়ে রয়েছে, আর তারই গা বেয়ে, টপ্ টপ্ করে রস ঝড়ছে!

হাবা হাঁউ মাঁউ করে কি বললো, কেউ তা বুঝতে পারলে না। সবারই মুখে একই প্রশ্ন—"ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?"

অনেকক্ষণ চিন্তা করে গণেশ মুদি বললো, "আরে মাথা ঘামানোর দরকার নেই হে, ভোর হোকনা; দেখ্‌বোখন চোর পালায় কোথায়?—হ্যাঁ বাবা, এ ময়রার ঘরে 'নষ্টচন্দ্র'! পিঠের ছাপ না নিয়েই কি ফিরে গেছে?"

হাঁপাতে হাঁপাতে তড়িৎ, খেলুর বাড়ী এসে উঠ্‌লো, কিন্তু তখনও ওদের গরম রসের পোড়ার জ্বালা একটুকুও কমেনি? খেলুতো যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হাঁউ মাঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে একেবারে শুয়েই পড়ল। এত দুঃখের সময়ও বেচারী তড়িৎ আর খেলুর অবস্থা দেখে ফেলু হিঃ হিঃ করে হেসে বললো, "কেন বাপু, খুব যে মিষ্টিমুখ মিষ্টিমুখ বলে লম্ফ ঝম্ফ করছিলে—এখন?

ছবি: সমর দে

(অগ্রহায়ণ-১৩৩৮)

শ্রীসুখলতা রাও

মহানদী আর কাঠজুড়ি, এই দুই নদীর মাঝখানে কটক। মহানদীর মত চওড়া নদী খুব অল্পই আছে। তার উপর যে রেলের পোল সেটা দেড় মাইল লম্বা। কতদিন আমরা মহানদীর পারে দাঁড়িয়ে, অন্য পারে গড়জাতের পাহাড়গুলি দেখেছি। তাদের মধ্যে একটি পাহাড় খুব উঁচু, অনেক সময় তার মাথায় মেঘ লেগে থাক্‌তে দেখা যায়। এই পাহাড়ের নাম কপিলাশ।

এদেশে পাহাড়ে জায়গায় গরমের দিনে চারদিকের পাথর কাঁকড় তেতে উঠে ভয়ানক গরম হয়; তখন বনেতে শুক্‌নো ডালপালায় ঘষাঘষি লেগে অনেক সময় আগুন ধরে যায়। এই আগুনকে 'দাবানল' বলে। ছেলে বেলায় দাবানলের কথা পড়েছিলাম—এখানে এসে চোখে দেখলাম। অন্ধকার রাত্রে দূর থেকে সে আগুন ভারি সুন্দর দেখায়; মনে হয় যেন পাহাড়কে কে আলোর মালা আলোর মুকুট দিয়ে সাজিয়েছে।

গড়জাতের ঢেঙ্কানাল রাজ্যে কপিলাশ পাহাড়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ কয়দিন ঢেঙ্কানাল রাজবাড়ীতে 'ছৌ' নাচ হয়। যাত্রাগানে যেমন 'রাবণ বধ' 'প্রহ্লাদ চরিত' এই রকম এক একটা 'পালা' হয়, 'ছৌ' নাচেতেও তেমনি হয়; কিন্তু এতে কেউ একটি কথাও বলে না। ছোট বড় ছেলেরা সব নানা রকম সেজে এসে নেচে নেচে সমস্ত গল্পটা দেখায়; তাদের হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতেই তাদের মনের ভাব বেশ বোঝা যায়। এবার চৈত্র মাসে আমরা ঢেঙ্কানাল যাব ঠিক করলাম। ছৌ নাচও দেখব আর কপিলাশ পাহাড়ও দেখব।

এক দিন বিকাল বেলা জিনিষ পত্র বেঁধে আমরা ঢেঙ্কানাল রওনা হলাম। নদীর ওপারে ঢেঙ্কানাল, প্রথমেই নদী পার হতে হবে। তোমরা হয় ত শুনে হাসবে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার নৌকা চড়তে ভারি ভয় করে। তবে শুনেছি গ্রীষ্মকালে নদীতে জল খুব কম, এ সময়ে নৌকা ডুবতে কখনও শোনা যায় না, তাই মনে অনেকটা সাহস হ'ল। কটকের কাছে নদীর পার অনেক জায়গায় পাথর দিয়ে বাঁধান। এই সব বাঁধ প্রায় হাজার বছরের পুরান। এই রকম একটা বাঁধা ঘাটে আমরা নৌকায় উঠ্‌লাম।

দেখলাম নদীর জল এত কম যে অনেক জায়গায় জলের নীচের বালি শেওলা সব স্পষ্ট দেখা যায়। এক যায়গায় ত বালিতে নৌকা আট্‌কিয়েই গেল, তখন মাঝিরা জলে নেমে তাকে ঠেলে বা'র কর্‌ল। নদীর মাঝে অনেক চরা পড়েছে;

কোনটা জল বাড়লে ডুবে যায়, কোন চরা বর্ষা কালেও ডোবে না। এই সব চরাতে কুমড়ো তরমুজ শাক সরিষা ইত্যাদি তরি তরকারী যথেষ্ট জন্মায়। কোথাও কোথাও বড় বড় গাছপালায় জঙ্গল হয়ে গেছে। শীতকালে চরাগুলি যখন শাদা কাশের ফুলে ভরে যায় তখন ভারি চমৎকার দেখায়। আমরা চারদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছি। জলের পাখীরা চরার উপর বেড়াচ্ছে, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়ে যাচ্ছে। এক যায়গায় একটা কুমীর বালির উপর হাঁ ক'রে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

আড়াই ঘণ্টা পরে, সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা ওপারে নয়াপাটনার ঘাটে পৌঁছলাম। সেখানে রাজা বাহাদুরের মোটর এসে দাঁড়িয়ে ছিল। নয়াপাটনা থেকে ঢেঙ্কানাল সহর একুশ মাইল। মোটর যাবার জন্য সুন্দর রাস্তা আছে। রাস্তার দুধারে ঝোপ জঙ্গল, কোথাও ঘন বন, কোথাও পাহাড়,— মাঝে মাঝে গ্রাম আছে। কোথাও পাহাড়ের নীচে বিলের মত। আমরা যেতে যেতে সূর্য্য ডুবে গেল, সন্ধ্যা হয়ে এলো। পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য ঠিক যেন একটা মস্ত বড় সোনার থালার মত লেগে ছিল। ঝিলের জলে তার আলো পড়েছিল।

এই পথে নাকি ভারি বাঘের ভয়। আমরা যাবার আগে সপ্তাহ দুয়ের মধ্যে জন কুড়ি লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছে। মোটরে বসে যদি এক আধটা বাঘ টাঘ দেখতে পোতাম, তবে বেশ হ'ত; কিন্তু মোটরের ভয়ে তারা কেউ কাছেও ঘেঁস্‌ল না। দেখেছিলাম কেবল এক পাল বুনো হরিণ; তারা রাস্তা পার হচ্ছিল, মোটরের শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে ছুটে পালাল। আমরা যাবার দশ বার দিন আগে, আমাদেরি কয়েকজন আত্মীয় ঢেঙ্কানাল গিয়াছিলেন। দিনে দুপুরে বাঘ আসবে না মনে ক'রে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে একটি নয় দশ বছরের মেয়ে ছিল। কিছু দুর যেতেই সঙ্গের পাহারাওয়ালা তাঁদের চুপ করে দাঁড়াতে ইসারা করল। তাঁরা দেখেন সামনে প্রকাণ্ড বাঘ। দেখেই ত ছোট মেয়েটি ভয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল, আর অমনি বাঘও এগিয়ে রাস্তা আটকিয়ে দাঁড়াল। যাহোক, দু একটা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনে আর ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে রাজার একটা হাতী এসে পড়ায় বাঘটা পালিয়ে গেল। ছোট মেয়েটি বাড়ী এসে খুব বাঘের গল্প করল, বাঘটা নাকি তাদের দেখে 'ফুলে উঠেছিল'।

ঢেঙ্কানাল পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে এল তাই সে দিন আর সহরের কিছু দেখতে পেলাম না। পরদিন সকালে কপিলাশ যাব। কপিলাশের পথ বড় উঁচু নীচু, মোটর যাবার সুবিধা নাই; হাতী, গরুর গাড়ী বা মানুষে ঠেলা "পুস্‌পুসে" যেতে হয়। আমাদের জন্য পুস্‌পুস্‌ ঠিক হয়েছিল। সাম্নে দুজন করে লোক টানছিল আর পিছনে চারজন ক'রে ঠেলছিল। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে ব'লে সকাল সকাল বেরোন গেল। বারো মাইল পথ যেতে হবে। দুধারে লাল কাঁকরমাটি, শাল হরিতকী কুচিলার (নকস ভোমিকা) বন। মাঝে মাঝে আম কাঁঠালের গাছও দেখা যায়।

বেলা সাড়ে নয়টায় কপিলাশের নীচে এসে পৌঁছলাম। দু হাজার ফুট পাহাড়, তার উপরে উঠ্‌তে হবে। যারা হেঁটে উঠ্‌তে চায় তারা খাড়া পাহাড়ে' রাস্তা দিয়ে গাছপালা ধরে ওঠে। একটু ঘুরে গেলে হাতী কি পাল্কীতেও যাওয়া যায়। দার্জিলিং যেতে পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেমন রাস্তা গিয়েছে, কপিলাশের গা কেটে, ডিনামাইট দিয়ে পাথর উড়িয়ে তেমনি রাস্তা তয়ের করা হয়েছে। সবই ঢেঙ্কানালের রাজাবাহাদুর করিয়েছেন। আমরা হাতী চড়ে এই পথে পাহাড়ে উঠলাম। এক এক জায়গায় পাহাড় এত খাড়া যে হাতীর পিঠ থেকে নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে মাথা ঘোরে, মনে হয় যেন এই পড়ে গেলাম। দুধারে বাঁশের বন, গাছপালা লতা পাতা ঝুঁকে পড়েছে। একটু নজর না রাখলে বাঁশের খোঁচায় চোখ কানা হবার জোগাড়। পথের মাঝে কোথাও বড় বড় পাথর বড় বড় গুঁড়ি বাঁশের বোঝা পড়েছে, আমি ভাব্‌ছি 'রাস্তাত বন্ধ', তারপর দেখি আমরা যেমন ক'রে ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গাই, হাতী তেমনি ক'রে সেগুলোকে ডিঙ্গিয়ে চল্ল। যদি কোথাও গরু টরু কিছু সাম্নে পড়ে, বেচারীরা হাতীর ভয়ে কোন দিকে যে যাবে ঠিক পায় না, বাঁশের বনের ভিতর দিয়ে গড়ান পাথরে উপর দিয়েই উঠে পড়ে ছুট দেয়।

যা হো'ক এক ঘণ্টা পরে পাহাড়ের উপরে ঢেঙ্কানাল রাজের বাঙ্গলা বাড়ীতে পৌঁছান গেল। সেখানে একটি মহাদেবের মন্দির আছে। তার পাশে আরো ছোট খাটো মন্দির আছে। বাঙ্গলাখানি বেশ বড় আর ঝরঝরে। আমরা সেখানে রেঁধে খাওয়া দাওয়া করছি, ইতিমধ্যে একদল লালমুখো বাঁদর ছেলেপুলেসুদ্ধ এসে হাজির। মন্দিরের

লোকেদের কাছে আদর পেয়ে পেয়ে তারা আর মানুষকে ভয় করে না। খাবারের আশায় তারা বারাণ্ডার সামনে সারি বেঁধে বসে গেল, যেন ভিখারীর দল। একটা কলা ছুঁড়ে দেবা মাত্র কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আমাদের হাত থেকে খাবার নিতে আসে।

বিকালে আমরা মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরগুলির গড়ন ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ধরণের, ঘণ্টার মত; তবে মন্দিরগুলির গায়ে তেমন সুন্দর খোদাই কাজ নেই। পাহাড়ে' যায়গা ব'লে মন্দিরের উঠান কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, মাঝে মাঝে সিঁড়ী; সবই পাথর দিয়ে বাঁধান। পাহাড়ের উপর থেকে একটা ঝরণা তিন ধারায় নেমে এসেছে। মন্দিরের উঠানের পাথরের উপর দিয়ে সে ঝরণার জল বয়ে যাচ্ছে। কোথাও তার মুখে একটুকরো বাঁশের নল কি সুপারি গাছের খোলা লাগান হয়েছে; তা দিয়ে পরিষ্কার তক্‌তকে জল পড়ছে। কপিলাশ পাহাড়ের দৃশ্য বড় সুন্দর। সবুজ পাতায় ঢাকা প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা গাছগুলি দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। আম কাঁঠালের গাছগুলি পর্য্যন্ত পাহাড়ে এসে পাহাড়েরই মত কেবল আকাশের দিকে মাথা উঁচু করছে।

এই সব বনেতে খয়েরের গাছ আছে, তা থেকে লোকেরা খয়ের তৈরী ক'রে বিক্রী করে। আর এক রকম পাতা আছে শুনেছি, তার ডাল খুব মোটা; সেই ডাল কাটলে নাকি তার ভিতর থেকে জলের মত পরিষ্কার এক রকম রস বেরোয়। পাহাড়ে জঙ্গলে জলের অভাব হ'লে অনেক সময় লোকে এই রস খেয়ে তৃষ্ণা দূর করে। আবার আরেক রকম গাছ আছে, তার গুঁড়ি সিদ্ধ ক'রে তা থেকে সাগু দানার মত এক রকম খাবার তৈরী করা যায়; দুর্ভিক্ষের সময় এ দেশের অনেক লোকে তাই খেয়ে থাকে। এই সব বন জঙ্গলই হ'ল এ দেশের লোকের খাওয়া পরার উপায়। তার জন্য তাদের কম পরিশ্রম কর্‌তে হয় না। সারাদিন খেটে হয়ত বন থেকে বাঁশ কেটে মাথায় ক'রে বয়ে আন্‌ল — সেটা তারা রাজার দয়াতে বিনা পয়সায়ই পায়। বাড়ী গিয়ে হয় ঝুড়ি চাঙ্গাড়ি, কুলো ইত্যাদি বুন্‌ল, নয় ত ভেলার মত করে বাঁশের বোঝা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে সহরে চল্ল। সেখানে বাঁশ বেচে যে কয়টি পয়সা পাবে তাই দিয়ে নিতান্ত দরকারী চাল নূন কাপড় কিনে আন্‌বে। এরা ঘর বানায় বাঁশ কাঠের উপর বেলে-মাটি লেপে; চালা করে শুকনো পাতা না হয় খড়, খড় 'নই' দিয়ে বেঁধে। এ দেশে নারিকেল গাছ বেশী হয় না, পাট শনের চাষ ও নেই, তাই এরা দড়ির বদলে 'নই' বলে এক রকম মজবুত লতার ছাল ব্যবহার করে।

এখানে পাহাড়ের নীচের যায়গা গুলিতে খুব ধান জন্মায়। কিন্তু হ'লে কি হবে? হয়ত ক্ষেত ভ'রে ধান পেকেছে —হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখা গেল বুনো হাতীর দল এসে ধান খেয়ে আর মাড়িয়ে সব নষ্ট ক'রে রেখে গেছে। তাই ধান পাকবার সময় এলে চাষারা ক্ষেতের মাঝে মাচা বেঁধে সেই মাচায় বসে রাত্রে হাতী তাড়ায়। হাতী তাড়ান হচ্ছে মেয়েদের কাজ। ছেলেরা সারাদিন খেটেখুটে আর রাত জাগতে পারে না, তাই মেয়েরাই হাতী তাড়াবার ভার নেয়। দু একজন ক'রে মাচায় বসে থাকে, হাতীর পাল এলেই খুব ক'রে কেরোসিনের টিন পেটায় আর হৈ হৈ ক'রে চ্যাঁচায়; হাতীরা খুব ভীতু কিনা, তাতেই তারা ভয়ে পালিয়ে যায়।

গড়জাতের বনের বাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে, হাতী, হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়। তোমরা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ধনঞ্জয় পাখী দেখে থাক্‌বে, যার ঠোঁটের উপরে ঠোঁট থাকে; সে পাখীও এখানে আছে। এখানের লোকেরা সে পাখীকে 'কুচিলাখাই' (যে কুচিলা খায়) বলে।

কপিলাশ পাহাড়ে একরাত ছিলাম। ভোর বেলা উঠে দেখি পাহাড়ের উপর থেকে গুঁড়ি মেরে মেঘ নেমে আসছে। বিকালে আমরা ঢেঙ্কানালে ফিরে এলাম। সেখানে দুইদিন ছৌ নাচ দেখে বাড়ী ফিরলাম। ছৌ নাচ দেখে খুব ভাল লাগ্‌ল— একটা নূতন ধরণের জিনিষ।

ঢেঙ্কানাল সহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর দেখতে, মাঝে মাঝে পাহাড় আছে। একটা ছোট ঢিপির উপর রাজবাড়ী। স্কুল, কাচারি, পোষ্টআফিস, থানা সবই আছে। রাস্তার দুধারে গাছের সারি। সহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড আম বাগান। এ দেশের লোকেরা বেশ হাসীখুসী ও সাদাসিধা ধরণের।

ছবি: সুকুমার রায়

(শ্রাবণ-১৩২৩)

ইডেনে মুস্তাক

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মুস্তাক যদি না খেলেন, তবে
খেলা-ই বন্ধ হোক,
বলেছিল একবাক্যে এ-কথা
শহরসুদ্ধ লোক।
এ নয় নেহাত হালের ব্যাপার,
টগবগ-করা রাগে
ফেটে পড়েছিল গোটা কলকাতা
অনেক বছর আগে।
কেন মুস্তাক, এই প্রশ্নের
উত্তর শুধু তাঁরা
জানেন, যাঁরাই দেখেছেন তাঁর
ব্যাটিং বল্‌গা-ছাড়া!
দেখেছি আমিও ক্রিকেটের কী-বা
জৌলুস মরি-মরি!
সে কথা ভেবে আজও আমি খুব
গৌরব বোধ করি।
হিন্দি রানিং কমেন্টারিতে
যাকে বলে ধুঁয়াধার,
মুস্তাক মাঠে নামামাত্রই
শুরু হত সেই মার।
ক্রিজ ছেড়ে এসে ব্যাট চালাতেন
ছিল না তো ভয়ডর,
অফ্‌-এর বলকে অন্‌-এ পাঠাতেন
অক্লেশে পরপর।

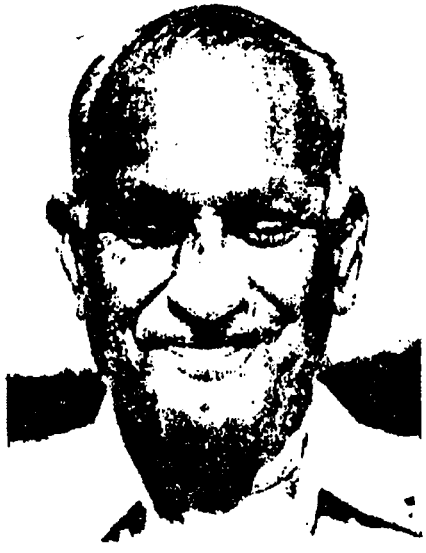

ব্যাটিংয়ের নানা কেতা-কানুনকে
হেলায় তুচ্ছ করে
কী চোস্ত মার মারতেন তিনি
দেখেছি দু'চোখ ভরে।
দেখেছি, এবং শিউরে উঠেছি,
তারপরে হাততালি
দিয়ে সব্বাই চেঁচিয়ে বলেছি:
জিও মুস্তাক আলি।

(মাঘ-১৪০৫)

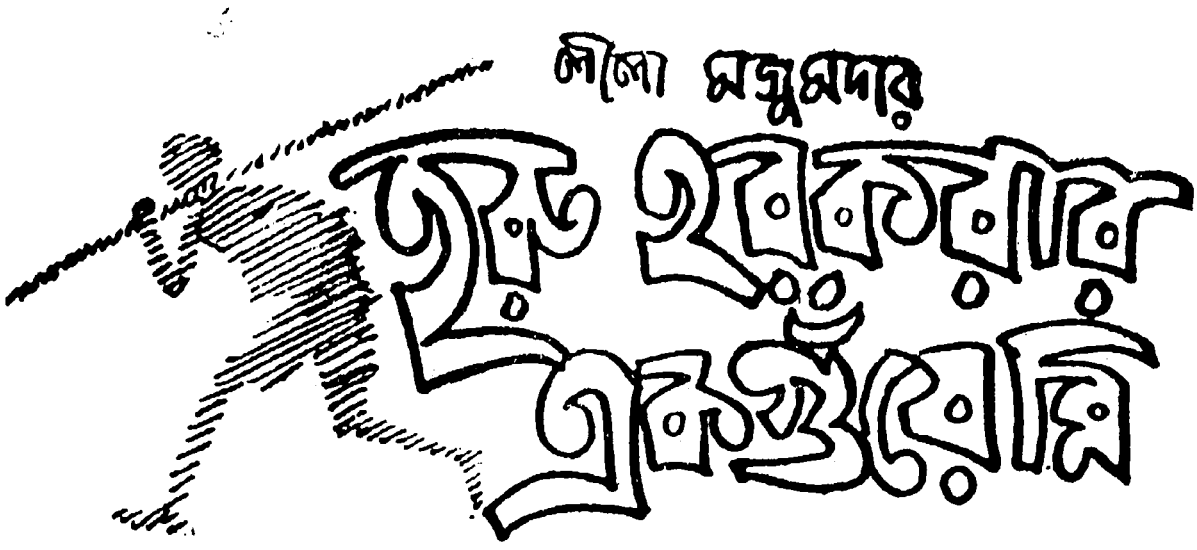

কলকাতায় গেঁড়িদির বিয়ে হল। তার নিমন্ত্রণপত্র বিয়ের সাত সপ্তাহ পরেও যখন বোলপুরের ভুবনডাঙায় বড়দাদুর কাছে পৌঁছল না, তিনি চটে কাঁই। নাকি লোকের অভাবে বাইরের চিঠি সব ডাকে দেওয়া হয়েছিল। বড়দাদু তাতে আরো চটে গেলেন, 'ডাকে চিঠি! বলি, ডাকের চিঠি কারো কাছে কখনো পৌঁছয়, যে বলছিস ডাকে দিয়েছিল?'

গেঁড়িদির বাবা অম্বিকা জ্যাঠা হলেন গিয়ে মেজদাদুর ছেলে। অবিশ্যি ছেলে ঠিক নয়, বেশ বুড়ো। বড্ড ভালোমানুষ। বাড়িসুদ্ধ সক্কলের জন্যে নতুন কাপড়, কাঁচাগোল্লা, কালাকান্দ, ল্যাংড়া আম সঙ্গে নিয়ে, কি ব্যাপার দেখতে এসেছিলেন। কেউ গেল না কেন বিয়েতে। সবাই খুশি হল, এক বড়দাদু ছাড়া।

বড়দাদু আবার বললেন, 'চিঠি পাইনি, যাইনি, ব্যস্!' অবিশ্যি চিঠি পেলেও যেতেন না। দোতলা থেকে নামতেই পারেন না, ৮৮ বছর বয়স। রান্নাঘরের ছাদে পাইচারি করে করে বনপথের মতো দুটো চওড়া লাইন ক্ষয়ে ফেলেছেন। অম্বিকা জ্যাঠা কিছু বলছেন না দেখে বড়দাদু ইজিচেয়ারের হাতল চাপড়ে আরো বললেন, 'হয় রেলের ডাকের থলিতে অন্য জিনিস আসে, বুঝলি? নয় তো পাঠাস্‌নি। তা না হলে দেরি করে হলেও, এর মধ্যে এসে পৌঁছত! আসলে রেলের ডাকে চিঠিপত্র আসে না আজকাল।

'আর শুধু আজকাল কেন, আগেও অনেক সময় আসত না। আমার দাদামশায়ের মরার আগে রেজিস্টার ডাকে পাঠানো হীরেগুলো মা-র কাছে এসে পৌঁছল না কেন? তার রসিদও ছিল। দাদামশায়ের ছেঁড়া গীতায় গোঁজা। তা সেটিকে বড়মামা সর্দারি করে চিতেয় তুলে গেছলেন!

'ব্যস্ হয়ে গেল! সে তো আমার জন্যেই পাঠানো হয়েছিল। আমিই মায়ের একমাত্র সন্তান। যদিও তখনো জন্মাইনি, তবু তাতে আমার উত্তরাধিকারের দাবি তো আর উপে যায় না...'

হেনা তেনা কত কি বলতে লাগলেন বড়দাদু। জোড়াশিং গুব্‌রেকে চান করাতে করাতে আধখানা কান দিয়ে সব শুনছিল বড়দাদুর একমাত্র সন্তানের একমাত্র সন্তান উট্‌কো।

গুব্‌রেটা যেমনি বদ্ তেমনি নোংরা, কিছুতেই চান করবে না! ঠ্যাং-এ সুতো বাঁধা সত্ত্বেও ইদিক উদিক পালাবার চেষ্টা করে। সমস্তক্ষণ কড়া নজর রাখতে হয়। তাই গোড়ার দিকটা তত শোনা হয়নি। কিন্তু হীরের কথা কানে যেতেই কান খাড়া। দু-শিং বদ্ গুবরেটা সেই সুযোগে দরজার পরদা বেয়ে প্রায় ছাদ অবধি উঠতেই সুতোয় টান পড়ল। থপ করে মাটিতে পড়ে উল্টো হয়ে শূন্যে ঠ্যাং ছুঁড়তে লাগল। তা জোড়া শিং ভাঙুক আর না-ই ভাঙুক, উটকোর খেয়াল নেই।

কাঁথা সেলাই করতে করতে বড় ঠাকুমা বললেন, 'তা বললে তো চলবে না। মাসে মাসে আমি আমকপালিতে বাপের বাড়ি চিঠি পাঠাই, পরের মাসে তার ঠিক ঠিক জবাব-ও পাই। আমার বাপু কোনো অসুবিধা হয় না।'

শুনে অম্বিকা জ্যাঠা পর্যন্ত অবাক! 'সে কি! রেলের ডাকে চিঠি যায়, উত্তর আসে?'

বড় ঠাকুমা কাঁথা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'অতশত জানিনে বাপু। উট্‌কো চিঠি ফেলে, উত্তর আসে। তাই নারে উট্‌কো?'

গুবরকে সোজা করতে করতে উট্‌কো বলল, 'হুঁ।'

জ্যাঠা বললেন, 'ডাকঘরের বাইরের ডোরাকাটা বাক্সে ফেলিস্ আর ডাকঘরের পেছনের খুদে জানলা দিয়ে উত্তর আনিস্?'

গুবরেকে বড় জালের বাক্সে ভরে উট্‌কো বলল, 'ঠিক তা নয় অবিশ্যি।'

'তবে? তবে?'

'ডাকে দিলে যদি না যায়, তাহলে ঠামু আমাকে ঘুড়ির পয়সা, গুলির পয়সা দেবে না। তাই—'

উট্‌কো থামতেই সবাই ওকে ছেঁকে ধরল, 'তাই কি বল্, আহা থামলি কেন? তোর যদি কোনো প্রাইভেট বন্দোবস্ত থাকে তো বল্, আমরাও তার পৃষ্ঠপোষকতা করব।'

উট্‌কো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বন্দোবস্ত ঠিক নয়! হয়েছে কি, হরু হরকরা যার তার চিঠি বিলোবার ভার নেয় না।'

বড়দাদু ভারি বিরক্ত, 'বিলোবার ভার আবার কি? ডাকের থলিতে রেলে করে যায় না?'

'না, তাহলে হয়তো পৌঁছবে না।'

অম্বিকা জ্যাঠা খবরের কাগজে বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখেন। তিনি বললেন, 'তবে কি চিঠি হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যায়। বুড়ো নিশ্চয়, খোঁড়াও হয়তো?'

উট্‌কো বড়দের সঙ্গে পারত পক্ষে কথা বলত না। সে খালি বলল, 'হুঁ।' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ঠামু বললেন, 'সেইখানে দুটো পোস্টকার্ড রেখেছি, তাকে দিয়ে দিস্।' সঙ্গে সঙ্গে উট্‌কো হাওয়া।

বড়দাদু তো হাঁ। বুলিপিসি বললেন, 'আমিও তাহলে দুটো চিঠি দেব। এমনিতে তো অর্ধেক পৌঁছয় না।'

অম্বিকা জ্যাঠা বললেন, 'তোরা কি খেপেছিস্? হরকরারা আর আছে নাকি? রেলের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওসব প্রায় উঠে গেছে। চার ঘণ্টায় রেল যায়, হরকরাদের লাগত পাঁচদিন, তা জানিস্?'

পিসি বললেন, 'তবু তো পৌঁছয় শুনছি। একটা পরীক্ষা হয়েই যাক না।'

ততক্ষণে বিকেলের জলখাবারের সময় হয়ে গেছিল। চিঁড়েভাজা, ডালমুট, কুচো নিমকি মাখা, জ্যাঠার আনা সন্দেশ। বলা বাহুল্য উট্‌কো এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী। সঙ্গে আবার পাশের বাড়ির লংকাকে জুটিয়ে এনেছে। দুজনারই বারো বছর বয়স, ভয়ানক ভাব।

জলখাবারের পর ঘুড়ি নিয়ে উট্‌কো আর লংকা যেই বেরোতে যাবে, বুলিপিসি দুটো কলকাতার চিঠি দিয়ে বললেন, 'হরকরাকে দিস্। দাঁড়া, ঐ টিকিটেই চলবে তো? নাকি বুড়োকে বাড়তি পয়সা দিতে হবে?'

উট্‌কো বলল, 'না।'

বাড়তি পয়সাকড়ি কিছু নেয় না হরু হরকরা। সে বলে, 'আমরা সরকারের লোক। সরকার যা দেন সেই যথেষ্ট। চিঠি বিলি আমাদের ডিউটি, ওতে টিকিট থাকলেই হল। আজকাল ছাপ-টাপও কেউ দেখে না।' এ-সব কথা অবিশ্যি বলেনি উট্‌কো।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ঘুড়ি লাটাই সিঁড়ির নিচে রেখে গেছিল। লংকা বলেছিল, 'এগুলো দিয়ে কি হবে? আমিও হরকরার কাছে যাই চল্।'

পেছন থেকে বড়দাদুর খাসবেয়ারা সীতেশ এক গাল হাসতে হাসতে ডেকে বলল, 'বড়বাবু বলছিলেন, হরকরাকে জিজ্ঞেস করিস্ হীরেগুলোর কি করল? রেজিস্ট্রি করা প্যাকেট তো হারাবার কথা নয়।'

ভারি রাগ ধরে উট্‌কোর। বেশ, তাই জিজ্ঞেস করবে। হরু হরকরা চোর নয়। কি ভালো ভালো গল্প বলে মহারাণীর বিষয়ে। ইন্দিরা গান্ধীই বলতে চায় বোধহয়, তা ঐরকম বলে। দেশের সকলের জন্য কত ভাবেন। ডাক টিকিটের দাম কত কমিয়ে দেছেন। অথচ বড়দাদুদের কথায় উল্টো মনে হয়। কি বাজে বকে বুড়োরা, মানে হরু হরকরা ছাড়া। উট্‌কো যা বলে ঠামু সব বিশ্বাস করে।

লংকা বলল, 'ও কি! ঐ বাঁশতলায় যাচ্ছিস ঠিক সন্ধ্যার আগে? জায়গাটা খারাপ।'

উট্‌কো চটে গেল, 'ধেৎ! আমি তো প্রায়ই যাই। বাঁশতলার চায়ের দোকানে হরু হরকরা আমার জন্য অপেক্ষা করে। ওকে আমি দুটো করে গোলাপী বিড়ি দিই, সীতেশদার ঘর থেকে নিয়ে। না বলে নিই, নইলে দেবে না।'

লংকা বলল, 'তোদের চিঠিপত্র নিরাপদে পৌঁছে দেয় আর তুই মোটে দুটো বিড়ি দিস্? ছিঃ!'

তার বেশি দেয়ই বা কি করে? হরু বলল, 'যাবার পথে একটা, ফেরার পথে একটা। তার বেশির কি দরকার যে নেব? কিছু জমাতে হয় না বুঝলি বাপ্, সব ছেড়ে ছুড়ে যেতে হয়। আমাকে দেখতে পাচ্ছিস্ তো!'

আশু পণ্ডিতের চায়ের দোকান। পণ্ডিত ওর পদবী। তবে সমস্‌কিতও নাকি জানে। গুড় দিয়ে আর শুকনো শালপাতা দিয়ে কি ভালো চা বানায়। হরুকে খাইয়েছে। আশুর চিঠি পৌঁছে দেয়, আশু ওকে আর ওর বন্ধু যদি কেউ সঙ্গে থাকে, সবাইকে বিনি পয়সায় চা খাওয়ায়। পয়সাকড়ির ধার ধারে না এরা।

হরু হরকরা বোধহয় একটু ব্যস্ত হচ্ছিল, 'এত দেরী করলে চলে, বাপ্? চাঁদ ডোবার আগে সিকি পথ কাবার করতে হয়।' উট্‌কো বলল, 'তা দেরি হবে না, হরুদা? যেখানে যাবে, একটু বসবে, তামাক খাবে, বিড়ি খাবে, শালপাতার চা খাবে, গাল-গপ্প করবে, চিঠি দেবে, চিঠি নেবে—দেরি তো হবেই।'

ভাঁড়ে করে চা দিতে দিতে আশু পণ্ডিত বলল, 'তা হরুদা একটু না বললে আমরা কি করে রাজ্যের খবরাখবর পাব? কলকাতার পোস্টকাট হরুদা পড়ে শোনাবে বলে আমরা সারা হপ্তা পথ চেয়ে থাকি, কি বল ভাইসব?'

চায়ের দোকানে মশার জ্বালায় চাদর মোড়া অন্য লোকও ছিল, ওরা এতক্ষণ খেয়াল করেনি। তারা বলল 'লিশ্চয় লিশ্চয়।' সীতেশদা বলে, বেশি লস্যি লিলে সব ল হয়ে যায়।

উট্‌কো বলল, 'ঠামুর পোস্টকাটও পড়ে শোনাও নাকি?'

হরু ভারি বিরক্ত, 'এত দেরি করে এলে তা কি করে শোনাব? দুঃখ কর না ভাই সব, আসছে হপ্তায় হবে। এখন রওনা না দিলেই নয়।' উট্‌কো আর লংকা ওর সঙ্গে চলল।

রোগা শুঁটকো মানুষটা, রোদে জলে চিঠি বিলি করে, খেজুরের মত গায়ের রং, পালকের মতো হাল্কা শরীর, বাতাসের মুখে ছুটে চলে। তা ওরা ওর সঙ্গে পারবে কেন। গোলাপি বিড়ি দুটো নিয়ে সে পা বাড়াতেই, উট্‌কো বলল, 'একটু সাহায্যের দরকার ছিল।'

ততক্ষণে বাঁশবাগান ছাড়িয়ে ঘোষদের আমবাগানে পৌঁছেছে ওরা। ঝড়ে একটা আমগাছ পড়ে গেছিল। টপ্ করে হরু তার ওপর বসে পড়ে বলল, 'বল।'

লংকা চাঁদের আলোয় ওকে ভালো করে দেখতে লাগল। বাঁশ-বনটা কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া, চেহারাটা ভালো করে মালুম দিচ্ছিল না। এখন দেখল কালচে মতো ইজের কুর্তা পরা, হাতে একটা তেল চুকচুকে বাঁশের লাঠি, কাঁধে ঝোলানো থলি। লংকা বলল, 'লাঠিতে ঘন্টি বাঁধা থাকে, ছবিতে দেখেছি।'

হরু কাষ্ঠ হাসল, 'সে আমি খুলে রেখেছি। এই সব বনে বাঘ নেই কিন্তু ডাকাতদের জানান দেবার কি দরকার? কই বাপ্, বললে না কি সাহায্য?'

উট্‌কো হরুর গা ঘেঁষে বসে বলল, 'তোমার গায়ে ধুপধূনোর বুনো গন্ধ পাই, হরুদা। দাদু আজ যা-তা বলেছে।'

'কি যা-তা বলবি তো?'

'নাকি রেজিস্টার ডাকে পাঠানো এক প্যাকেট হীরে হারিয়েছে। ডাকের সবাই নাকি চোর!'

চাঁদের আলোয় হরুর মুখ গম্ভীর হল, 'কে পাঠিয়েছিল? কাকে পাঠিয়েছিল? কোথা থেকে কোথায় পাঠিয়েছিল? কবে পাঠিয়েছিল?'

'দাদুর দাদামশাই মরার আগে তাঁর একমাত্র সন্তান দাদুর মা-কে পাঠিয়েছিল। আমাদের এই ভুবনডাঙার বাড়িতে, কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিল। কবে তা জানি না। দাদু তখন জন্মায়নি।'

শুনে লংকার কি হাসি! কিন্তু হরু বেজায় রেগে গেল, 'তার মানে আমাদের এই লাইনে রেজিস্টার প্যাকেট হারিয়েছিল? ডাকগাড়িতে আসছিল, না হরকরা আনছিল? আগে হরকরা আনত, পরে রাস্তা হলে, যদ্দুর রাস্তা তদ্দুর ঘোড়ার ডাক, তারপর থেকে হরকরায় আনত। আমি বলছি কারো কোনো হীরের প্যাকেট হারাতে পারে না। রসিদ আছে?'

'নাকি দাদামশাই মলে মামা সরদারি করে তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেঁড়া গীতা পুড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে রসিদ ছিল।

মোট কথা আজ পর্যন্ত হীরে পৌঁছয়নি। নির্ঘাৎ চুরি গেছে দাদু বলে।'

হরু চিড়বিড়িয়ে উঠল, 'নিশ্চয় ঠিকানা ভুল ছিল।'

'দাদু বলে তাহলে মরা চিঠির দপ্তর থেকে যে পাঠিয়েছিল তার কাছে ফেরত যেত।'

হরু বলল, 'হুঁ! তুমি তো সব জান! আমরা অত সহজে ছাড়ি না, বুঝলে? বছরের পর বছর ঠিক মালিককে খুঁজে বেড়াই। আমার কাছেই একটা আলাদা পুঁটলি আছে, এ দিককার যত সব পথহারা চিঠি, পার্সেলের! তাদের ঠিকানা পাওয়া যায় না। এই দেখ—!'

কাঁধের ঝুলি নামিয়ে হরু বলল, 'একবার অজয় নদীর বানের জলে ডাকের থলি পড়েছিল। বহু চিঠি প্যাকের নাম ঠিকানা ধুয়ে গেছিল। কিন্তু হারায়নি, চুরিও যায় নি। বুঝলে বাপ্? আমি পিরতিজ্ঞে করেছি সবগুলো বিলি না করে ছুটি নেব না, হ্যাঁ। এ লাইনে চোরটোর নেই।'

ঝুলির মধ্যে খুদে একটি বাক্স। সেটি গামছার ওপর উপুড় করে ফেলতেই দশ-বারোটা ছোট বড় খাম প্যাকেট ছড়িয়ে পড়ল। হরু বলল, 'কি নাম ছিল মায়ের সেটা তো জান?'

'বগলাদেবী'।

'বরের কি নাম?'

'বর কেন আসবে, হরুদা, দাদুর মার তো বিয়ে হয়ে গেছিল!'

'আহা, কর্তার কি নাম ছিল?'

'ও, তাই বল! ভজহরি শর্মা।'

চাঁদের আলোয় ঘাঁটাঘাঁটি করে খুদে একটা নোংরা ন্যাকড়ায় সেলাই করা, গালা লাগানো প্যাকেট উট্‌কোর হাতে দিয়ে হরু বলল, 'এই নাও বগলাদেবী। আর কিছু পড়া যাচ্ছে না। ভুল হয়। তাই বলে চোর বল না।' এই বলে হাউ হাউ করে হরু হরকরা কেঁদে ফেলল।

উট্‌কো অপ্রস্তুতের এক শেষ! 'ও হরুদা, আমি কখনো তোমাকে চোর ভাবতে পারি? ওরাও কেউ তোমাকে চোর বলেনি। যাবে একদিন আমাদের বাড়িতে? দাদু খালি বলছিল ডাকে সব চুরি যায়!'

শুনে হরু ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, 'তা যাব না। কিন্তু এই আমি তোকে বলে দিলাম এই যে রং-ওঠা, নাম-ঠিকানা ধোয়া, ভুল নাম-লেখা তেরোটা চিঠি বাকি রইল, এর পেরতেকটির মালিক খুঁজে বের করে তবে আমি ছাড়ব। তারপর ছুটি নেব। বয়স হয়েছে, আর পারিনে। তোরা তখন অন্য লোক দিয়ে চিঠি পাঠাস্। প্যাকিট্‌টা বড়দাদুকে দিস্, ওনার মায়ের জিনিস। ঠিকানা নেই, তাই সেকাল থেকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আবার বলে কিনা ডাকে জিনিস চুরি যায়! ছি!'

এই বলে হরুদা উঠে পড়ল। উট্‌কো বলল 'ও হরুদা, ও সব একশো বছর আগেকার চিঠিপত্র, ওর মালিক তুমি এখন কোথায় খুঁজে পাবে? ওগুলো মরা চিঠির আপিসে জমা দিয়ে দাও। এখন যেন কি নতুন নাম হয়েছে জ্যাঠা বলছিল।'

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তেরচা হয়ে একটা চাঁদের কিরণ উট্‌কোর হাতে ধরা প্যাকটের ওপর পড়ল, একটু ফেটে গেছে, মনে হল ভেতরে কি চক্‌চক্ করছে। উট্‌কো বলল, 'ও হরুদা, ওদের কোথায় খুঁজবে?'

হরু হরকরা বলল, 'কেন, সেকালে।' এই বলে ওদের চোখের সামনে সেই চাঁদের কিরণটাতে টপ্ করে উঠে পড়ে কিরণ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওদের চোখের বাইরে চলে গেল। উট্‌কো আর লংকা সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না।

বাড়ি পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বড়দাদুকে প্যাকেটটা দেবামাত্র তিনি সেটা কেটে খুলে একটা হীরের সীতাহার তুলে ধরে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এ যে দিদিমার সেই সীতাহার, মা-র কাছে কতবার শুনেছি। এই জলে ধোয়া পুরনো ধুরধুরে প্যাকেট তুই কোথায় পেলি?'

উট্‌কো হাঁউমাউ করে এমনি কাঁদতে লাগল যে দুঃখের চোটে জাল কেটে বেরিয়ে এসে গুবরে ওর মুখে মাথায় দুটো শিং-ই বুলিয়ে দিতে লাগল।

লংকা সব বলল। তা বড়রা কি সহজে কিছু বিশ্বাস করে। ঠিক হল কাউকে কিছু বলা হবে না। কাল সন্ধ্যায় নিজেরা গিয়ে হরু হরকরাকে ধন্যবাদ আর কিছু বখশিস্ দিয়ে আসবে। এমন বিশ্বাসী লোক আজকাল দেখা যায় না।

তা কোথায় হরু হরকরাকে পাবে যে ধন্যবাদ দেবে। পরদিন সন্ধ্যায় লংকার আর উট্‌কোর সঙ্গে অম্বিকা জ্যাঠা, কলকাতা থেকে ফোন করে ডেকে আনা উট্‌কোর বাবা, পাশের

বাড়ির লংকার বাবা ব্যোমকেশ কাকা, সীতেশদা গেল। বাবা আর জ্যাঠা ছাড়া সবাই শুনল বাঁশবনে মোটা মোটা খরগোশ শিকার করতে যাওয়া হচ্ছে, লাঠি গুলতি, এয়ার-গান্, এইসব সঙ্গে গেল।

কোথায় কি! লংকা আর উট্‌কো সেই বাঁশ-বাগানটাকে খুঁজেই পেল না, তা আশু পণ্ডিতের শালপাতার চায়ের দোকান আর হরু-হরকরা! ওদের খোঁজাখুঁজি দেখে নবু মণ্ডলের কি হাসি। সে বলল, 'ছিল বটে বাঁশবন একশো বছর আগে। কোনকালে সব বেচে-বুচে সাফ! খরগোশ চাও তো ইলেমবাজার ছাড়িয়ে শালবনে খোঁজ। বাস্ যায়।'

সব শুনে দাদু একেবারে থ! উট্‌কো লংকা গাঁজাখুরি গল্প বলতে ওস্তাদ, কিন্তু হীরেগুলো তো আর গাঁজাখুরি নয়। উট্‌কোকে বলেও ছিল হরুদা, কারো কাছে এ-সব কথা প্রকাশ করলে এমনি হবে।

আর কখনো ওরা সেই বাঁশবন খুঁজে পায়নি। চিঠিপত্র আজ-কাল পাঁচদিনে রেলের ডাকে যায়। নয়তো স্বপনকাকা হাতে করে দিয়ে আসে।

(শারদীয়া-১৩৮৯)

ছবি: সত্যজিৎ রায়

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

বড় বাড়ির 'খোকনবাবু' টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। তাই দেখে, নীলু বলল 'ওমা আমায় একটা ঘোড়া কিনে দাওনা!' মা একটা কাঠের ঘোড়া এনে বলল 'আমরা গরীব মানুষ, বাবুদের মত ঘোড়া কোথায় পাব বাবা? এই ঘোড়া নিয়ে খেলা কর।'

ছোট্ট লাল ঘোড়া, নীলু তার নাম রাখল 'লালু'। সারাদিন সে লালুকে নিয়ে খেলা করল, খাবার সময়ে লালুর মুখেও খাবার গুঁজে দিল, রাতে তাকে নিজের বিছানায় ঘুম পাড়াল। লালু এখন ছোট্ট ছানা, খেয়ে দেয়ে বড় হবে, তখন তার পিঠে চড়ে কত বেড়াবে—ভাবতে ভাবতে নীলু ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ শুনল, 'চিঁ-হিঁ-হিঁ! বেড়াতে যাবে না?' চেয়ে দেখে, আরে! লালু কত বড় হয়ে গেছে! তড়াক্ করে নীলু তার পিঠে চড়ে বসল, অমনি লালু ছুটল—খট্ খটাস-খট্ খট্—!

খোকনও তখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, ওদের দেখে হেসে বলল, 'রেস দিবে?' টগ্-বগ্-টগ্-বগ্ খট্-খট্—খট্ খট্—দুই ঘোড়া ছুটল—দেখতে দেখতে টাট্টুকে পিছনে ফেলে লালু অনেকদূর এগিয়ে গেল!

সহর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে, নদীর ধারে খানিক দূরে বেড়িয়ে, নীলু বলল 'এবার ঘরে চল, লালু।' নীলুকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়েই, লালু আবার পা বাড়াল—'চিঁ-হিঁ-হিঁ! চল্লাম!'

'ওরে লালু, কোথা যাস?' বলে নীলু তার লেজ টেনে ধরল।

'উঁঃ হুঃ হুঃ—চুলগুলো যে ছিঁড়ে দিলি রে! ও নীলু, স্বপ্ন দেখছিস্ নাকি?' মায়ের ডাকে জেগে উঠে নীলু দেখল, ছোট্ট লালু তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে—লালুর লেজ ভেবে সে মায়ের চুল টেনে ধরেছে।

ছবি: সত্যজিৎ রায়

(বৈশাখ -১৩৭৫)

নির্ভীক

শঙ্খ ঘোষ

একটা কথা গোপনে আজ
বলতে পারি তোমায়
ভয় করি না বন্দুকে বা
ভয় করি না বোমায়।
ভয় করি না টিকটিকিকে
কিংবা আরশোলাকে
ভয় করি না ঘরেও যদি
বাদুড় ঝুলে থাকে।
উচ্চে মায়ের উঠছে গলা
ঝাপ্‌টে দিগ্‌বিদিক—
ঘোর বকুনির তেমন কালেও
থেকেছি নির্ভীক।
কিন্তু আমি ঠকঠকিয়ে
কাঁপতে থাকি ত্রাসে
চশমা চোখে অঙ্কের মিস্‌
ঢোকেন যখন ক্লাসে!

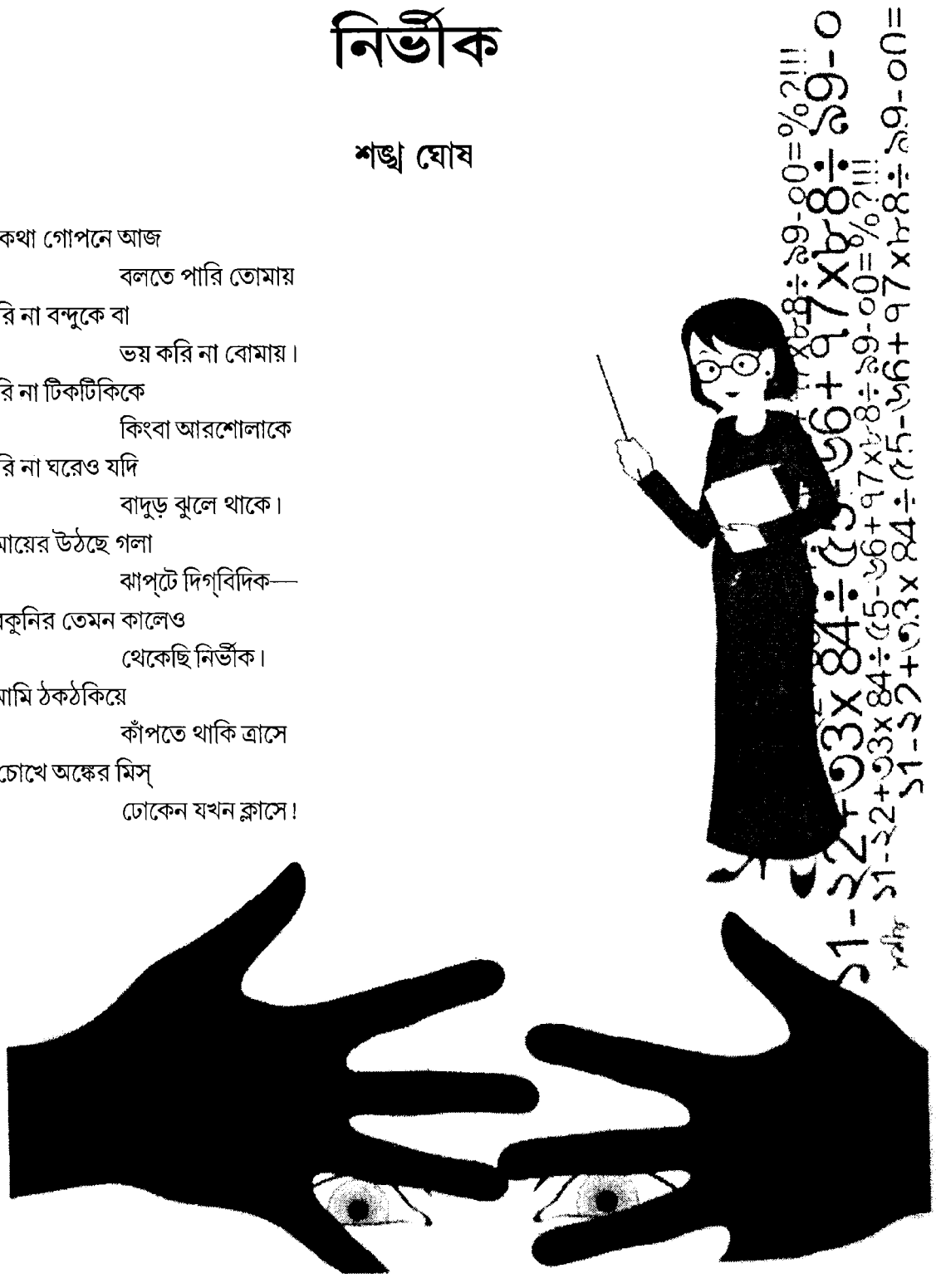

শারদীয়া-১৪১৯

ছবি: সমীর দাশ

সত্যজিৎ রায়

।। ১ ।।

সুজনের বাড়ির পিছনেই ছিল একটা সজনে গাছ। তাতে থাকত একটা দোয়েল। সুজনের যখন আট বছর বয়স তখন একদিন দোয়েলের ডাক শুনে সে ভাবল—আহা, এ পাখির ডাক কেমন মিষ্টি। মানুষে কি কখনো এমন ডাক ডাকতে পারে? সুজন সেইদিন থেকে মুখ দিয়ে দোয়েলের ডাক ডাকার চেষ্টা করতে লাগল। একদিন হঠাৎ সে দেখল যে সে ডাক দেবার পরেই দোয়েলটা যেন তার ডাকের উত্তরে ডেকে উঠল। তখন সে বুঝল যে এই একটা পাখির ডাক তার শেখা হয়ে গেছে। তার মা দয়াময়ীও শুনে বললেন, 'বারে খোকা, মানুষের গলায় এমন পাখির ডাক ত শুনিনি কখনো!' সুজন তাতে যারপরনাই খুশি হল।

সুজন দিবাকর মুদির ছেলে। তার একটা বড় বোন ছিল, তার বিয়ে হয়ে গেছে, আর একটা বড় ভাই মারা গেছে তিন বছর বয়সে। সুজন তাকে দেখেইনি। সুজনের মা খুব সুন্দরী, সুজন তার মতো নাক চোখ পেয়েছে, তার রঙটাও পরিষ্কার।

দিবাকরের ইচ্ছা ছেলে লেখাপড়া শেখে, তাই সে সুজনকে হারাণ পন্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিল। কিন্তু পড়াশুনায় সুজনের একেবারেই মন নেই। পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় বসে থাকে আর এ গাছ সে গাছ থেকে পাখির ডাক শুনে মনে মনে ভাবে এসব ডাক সে গলায় তুলবে। গুরুমশাই পাঁচের নামতা বলতে বললে সুজন বলে, 'পাঁচেক্কে পাঁচ, পাঁচ দুগুণে বারো, তিন পাঁচে আঠারো'। গুরুমশাই তাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেন, সেই অবস্থায় সুজন শালিক বুলবুলি চোখ-গেল পানকৌড়ির ডাক শোনে আর ভাবে কখন সে পাঠশালা থেকে ছুটি পেয়ে এই সব পাখির ডাক নকল করতে পারবে।

তিন বছর পাঠশালায় পড়েও যখন কিছু হলনা তখন একদিন হারাণ পণ্ডিত দিবাকরের দোকানে গিয়ে তাকে বলল, 'তোমার ছেলের ঘটে বিদ্যা প্রবেশ করানো শিবের অসাধ্য। আমি বলি কি তুমি ছেলেকে ছাড়িয়ে নাও। তোমার কপাল মন্দ, নইলে তোমার এমন ছেলে হবে কেন? অনেক ছেলেইত দিব্যি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে যাচ্ছে।'

দিবাকর আর কী করে, ছেলেকে ডেকে জিগ্যেস করল, 'অ্যাদ্দিন পাঠশালায় কী শিখলি?'

'আমি বাইশ রকম পাখির ডাক শিখেছি, বাবা,' বলল সুজন। 'আমাদের পাঠশালার পিছনে একটা বটগাছ আছে, তাতে অনেক রকম পাখি এসে বসে।'

'তা তুই কি হরবোলা হবি নাকি?' জিগ্যেস করল দিবাকর।

'হরবোলা? সে আবার কি?'

'হরবোলারা নানারকম পাখি আর জন্তু জানোয়ারের ডাক মুখ দিয়ে করতে পারে। তারা এইসব ডাক ডেকে লোককে শুনিয়েই রোজগার করে। তোর যখন পড়াশুনা হল

না, তখন দোকানে বসেও তুই কিছু করতে পারবিনা। হিসেব যে করবি, সে বিদ্যেও ত তোর নেই। তাই তোকে আমার কোনো কাজে লাগবে না।'

সুজন সেই থেকে হরবোলা হবার চেষ্টায় লেগে গেল। তার কাজ মাঠে ঘাটে বন বাদাড়ে ঘোরা, আর পাখির ডাক শুনে, সেই ডাক মুখ দিয়ে নকল করা। এই কাজে তার ক্লান্তি নেই, কারণ তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো, অনেক হাঁটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, সাঁতার কাটতে পারে। তার ডাকে যখন পাখি উত্তর দেয়, তখন তার মনটা নেচে ওঠে। মনে হয় সব পাখিই তার বন্ধু। খোলা মাঠে গিয়ে বসে গরু বাছুর ছাগল ভেড়ার ডাক সে তুলেছে, তারা তার ডাকে জবাব দেয়। তার হাম্বা ডাক শুনে নিস্তারিণী বুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ধবলীর বাছুরটা হঠাৎ ফিরে এল ভেবে; তার গাধার ডাক শুনে মোতি ধোপার গাধা ঘাড় তুলে কান খাড়া করে ডাকতে শুরু করে, মোতি ভাবে আরেকটা গাধা এল কোত্থেকে। ঘোড়ার চিঁহিতেও সুজন ওস্তাদ, সেটা সে ডাকে জমিদার হালদারদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। সে ডাক শুনে সহিস করিম মিঞা ভাবে, কই, আমার ঘোড়া ত ডাকছে না—এটা আবার কার ঘোড়া?

আর পাখির কথাই যদি বল, তাহলে সুজন অন্তত একশো পাখির ডাক তুলেছে। কাক চিল চড়ুই শালিক কোয়েল দোয়েল পায়রা ঘুঘু তোতা ময়না বুলবুলি টুনটুনি চোখ -গেল কাদাখোঁচা কাঠঠোকরা হুতুম প্যাঁচা—আর কত নাম করব? সুজন এইসব পাখির ডাক তুলে নিয়েছে এই গত কয়েক বছরে। সে ডাক শুনে পাখিরাই যদি ভুল করে তাহলে মানুষের আর কী দোষ?

বয়স কত হল সুজনের? তা হয়েছে মন্দ কী। তাকে আর খোকা বলা যায় না, সে এখন জোয়ান। সে গতরে বেড়েছে, সবল সুস্থ শরীর হয়েছে তার। বাবা বলে, তুই এবার কাজে লেগে পড়। রোজগারের বয়স হয়েছে তোর। কার্তিক হরবোলা থাকে এই পাশের গাঁয়ে। তাকে গিয়ে বল তোর একটা হিল্লে করে দিতে। না হয় তার সঙ্গে রইলি কটা দিন; তারপর আরেকটু বয়স হলে নিজের পথ দেখবি।

বাপের কথা শুনে সুজন কার্তিক হরবোলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। কার্তিকের বয়স হয়েছে দুকুড়ির উপরে—সে বিশ বছর হরবোলার কাজ করছে। কিন্তু সুজন দেখল সে নিজে যতরকম ডাক জানে, কার্তিক তার অর্ধেকও জানে না। সুজন এই কিছুদিন হল নাকী সুরে মুখ দিয়ে সানাই বাজাতে শিখেছে, তার সঙ্গে ডুগী তবলা সে নিজেই বাজায়; ফিঙে ফোঁকার আওয়াজও শিখেছে, নাচের সঙ্গে যে ঘুঙুর বাজে সেই ঘুঙুরের আওয়াজ করতে শিখেছে মুখ দিয়ে। কার্তিক এসব কিছুই জানে না। সে সুজনের কাণ্ড দেখে হাঁ। তবে মুখে কিছু বলল না, কারণ কার্তিকের হিংসে হচ্ছিল। সে শুধু বলল, 'আমি সাকরেদ নিই না। তোমার যা করার তা নিজেই করতে হবে।'

সুজন বলল, 'আজ্ঞে আপনি কি করে শুরু করলেন তা যদি বলেন তাহলে আমার একটু সুবিধে হয়।'

তাতে কার্তিকের আপত্তি নেই। সে বলল, 'আমি তেরো বছর বয়সে যন্তিপুরের রাজবাড়িতে গিয়ে হরবোলার খেলা দেখাই। রাজা খুশি হয়ে আমাকে ইনাম দেন। সেই থেকে আমার নাম হয়ে যায়। তুই কোনো রাজাকে খুশি করতে পারিস ত তোরও একটা গতি হয়ে যাবে। আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়।'

সুজন আর কী করে? সে কাউকে চেনে না, কোথাকার কোন রাজবাড়িতে গিয়ে খেলা দেখাবে সে? মনের দুঃখে সে বাড়ি ফিরে এল।

সুজনের গ্রামের নাম হল ক্ষীরা। ক্ষীরার উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে একটা বড় মাঠ পেরিয়ে ছিল একটা গভীর বন। এই বনের নাম চাঁড়ালি। চাঁড়ালির বনে যত পাখি আর জানোয়ারের বাস। তেমন আর কোনো বনে ছিল না। সুজন একদিন দিন থাকতে থাকতে সেই বনে গিয়ে হাজির হল। জানোয়ারে তার কোনো ভয় নেই, আর পাখিতে ত নেই-ই। এই বনে গিয়ে তিনটে নতুন নাম-না-জানা পাখির ডাক সে তুলল। সূর্যি যখন মাথার উপর থেকে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে, এমন সময় সুজন শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর দেখল এক পাল হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল।

কিছু পরেই সুজন দেখল যে বনের মধ্যে দিয়ে আসছে ঘোড়ার পিঠে এক রাজা, আর আরো পাঁচ সাতটা ঘোড়ায় তার অনুচরের দল। দেখে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, কারণ বনে অন্য মানুষ দেখবে সেটা সে ভাবেনি। এটা সে ভালোই বুঝল যে রাজা মৃগয়ায় বেরিয়েছেন।

এদিকে রাজাও সুজনকে দেখে অবাক।

'তুই কে রে?' রাজা হাঁক দিয়ে জিগ্যেস করলেন ঘোড়া

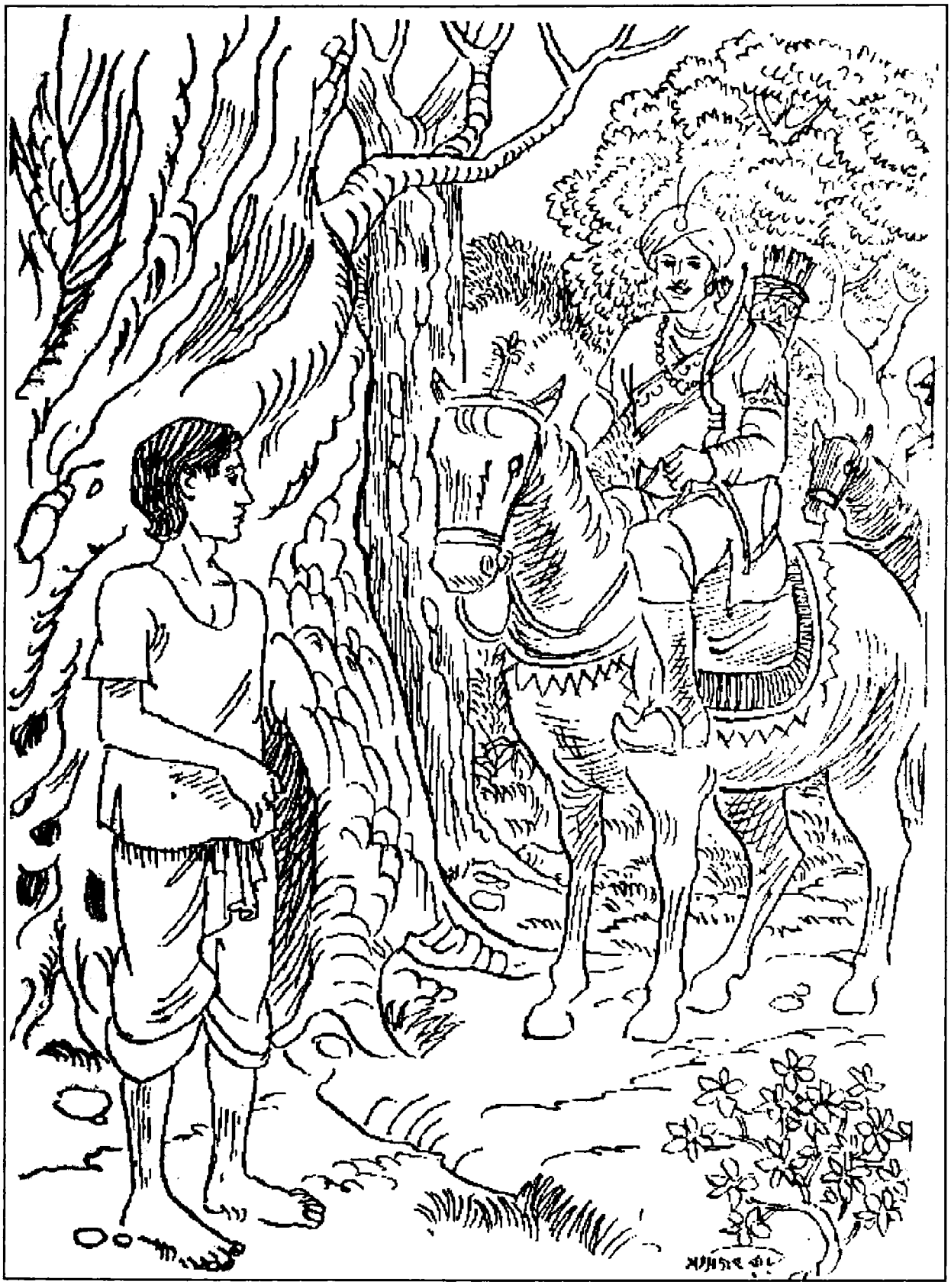

থামিয়ে।

সুজন হাত জোড় করে নিজের নাম বলল।

'তুই একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোর বাঘের ভয় নেই?'

সুজন মাথা নেড়ে না বলল।

'তার মানে কি এ বনে বাঘ নেই?' রাজা জিগ্যেস করলেন। 'শুনেছিলাম যে চাঁড়ালির বনে অনেক বাঘের বাস?'

'বাঘ আপনার চাই?'

'চাই বৈ কি। শিকারে এসেছি দেখতে পাচ্ছিস না? বাঘ ছাড়া কি শিকার হয়?'

'বাঘ খুঁজে পাননি আপনারা?'

'না, পাইনি। হরিণ ছাড়া আর কিছুই পাইনি।'

'ও।'

সুজন একটুক্ষণ ভাবল; তারপর বলল, 'বাঘ আছে, আর সে বাঘের ডাক আমি শুনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আপনি কি সে বাঘ মারবেন, রাজামশাই?'

'মারব না? শিকার মানেই ত জানোয়ার মারা।'

'কিন্তু বাঘ আপনার কী ক্ষতি করল যে তাকে মারবেন?'

রাজা আসলে খুব ভালো লোক ছিলেন। তিনি একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'বেশ, আমি তোর কথা মানলাম। বাঘ আমি মারব না, কারণ সত্যিই সে আমার কোনো অনিষ্ট করেনি। কিন্তু সে যে আছে তার প্রমাণ কই?'

সুজন তখন দুহাত চোঙার মতন করে মুখের ওপর দিয়ে সামনের দিকে শরীরটাকে নুইয়ে একটা বড় দম নিয়ে ছাড়ল একটা হুঙ্কার। অবিকল বাঘের ডাক। আর তার এক পলক পরেই বনের ভিতর থেকে উত্তর এল, 'ঘ্যাঁয়াওঁ!'

রাজা ত তাজ্জব।

'তোর ত আশ্চর্য ক্ষমতা,' বললেন রাজা। 'তুই থাকিস কোথায়?'

'আজ্ঞে আমার গাঁয়ের নাম ক্ষীরা। এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ।'

'তুই আমার সঙ্গে আমার রাজ্যে যাবি? তার নাম জবরনগর। এখান থেকে ত্রিশ ক্রোশ। আমার মেয়ের বিয়ে আছে সামনের মাসে আজবপুরের রাজকুমারের সঙ্গে। সেই বিয়েতে তুই হরবোলার ডাক শোনাবি। যাবি?'

'আজ্ঞে বাড়িতে যে বলতে হবে আগে।'

'তা সে তুই আজ বাড়ি চলে যা। আমরা বনে তাঁবু ফেলেছি। সেখানে রাত কাটিয়ে কাল সকালে ফিরব। তুই কাল সক্কাল সক্কাল চলে আসিস বাড়িতে বলে।'

'বেশ তাই হবে।'

।। ২ ।।

সুজন বাড়ি ফিরে এসে মা-বাবাকে সব কথা বলল। দিবাকর ত মহাখুশি। বলল, এইবার ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। তোর বোধ হয় একটা হিল্লে হল।

মা বলল, 'তুই যে যাবি, আর ফিরবি না নাকি?'

'পাগল!' বলল সুজন। 'কাজ হয়ে গেলে ফিরব। আর নাম ডাক হলে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাব, মাঝে মাঝে ফিরব।'

পরদিন ভোর থাকতে সুজন বেরিয়ে পড়ল। যখন চাঁড়ালির বনে পৌঁছাল তখন সূর্য তাল গাছের মাথা ছাড়িয়ে খানিকদূর উঠেছে। বনের ধারে একটু খুঁজতেই একটা খোলা জায়গায় জবর নগরের রাজার তাঁবু দেখতে পেল সুজন। রাজা দেশে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছেন। বললেন, 'তোকে একটা ঘোড়ায় তুলে নেবে আমার লোক, তুই তার সঙ্গেই যাবি!'

সুজনকে আগে ভালো ভালো মিঠাই আর ফল-মূল খেতে দিয়ে রাজা পাত্রমিত্র সঙ্গে করে রওনা দিলেন জবরনগর। ঘোড়ার পিঠে কোনোদিন চড়েনি সুজন, যদিও ঘোড়ার ডাক তার শেখা আছে। মহা আনন্দে রোদ থাকতে থাকতেই সুজন পৌঁছে গেল জবরনগর।

গাছপালা দালান কোঠা পুকুর বাগান হাট বাজারে ভরা এমন বাহারের শহর সুজন কখনো দেখেনি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে তার ভারী আশ্চর্য লাগল। সে রাজাকে জিগ্যেস করল, 'এত গাছপালা, এত বাগান, তবু একটাও পাখির ডাক নেই কেন?'

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে যে কত বড় দুঃখের কথা সে কী বলব তোকে। ওই যে দূরে পাহাড় দেখছিস, ওই পাহাড়ের নাম আকাশী। ওই পাহাড়ের গুহায় একটা রাক্ষস না খোক্কস না জানোয়ার কী জানি এসে রয়েছে আজ পাঁচ বছর হল। তার খাদ্যই হল পাখি। সে যে কী জাদু করে তা জানিনা; পাখিরা সব আপনা থেকে দলে দলে উড়ে গিয়ে তার গুহায় ঢোকে, আর রাক্ষসটা তাদের ধরে ধরে খায়। এখন এই শহরে আর কোনো পাখি বাকি নেই। কেবল একটা হীরামন

আছে আমার মেয়ের খাঁচায় রাজবাড়ির অন্দরমহলে।'

'কিন্তু তার খাবার ফুরিয়ে গেলে সে রাক্ষস বাঁচবে কি করে?'

'খাবার কি আর সে শুধু আমার শহর থেকে নেয়? পাহাড়ের উত্তরে আছে আজবপুর, পশ্চিমে আছে গোপালগড়—পাখির কি আর অভাব আছে?'

'এই জানোয়ারকে কেউ দেখেনি কখনো?'

'না। সে গুহা থেকে বেরোয় না। আমি নিজে তীর-ধনুক নিয়ে গুহার মুখে অপেক্ষা করেছি, আমার সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্য ছিল পঞ্চাশজন। কিন্তু সে দেখা দেয়নি। গুহাটা অনেক গভীর; মশাল নিয়ে তার ভিতরে কিছুদূর গিয়েও তার দেখা পাইনি।'

সুজন এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনো শোনেনি। শুধু পাখি খায় এমন রাক্ষসও থাকতে পারে? আর তাকে কোনোমতেই সায়েস্তা করা যায় না, এ ত বড় আজব কথা!

ততক্ষণে রাজার দল প্রাসাদে পৌঁছে গেছে। রাজা বলল, 'প্রাসাদের এক তলায় একটা ঘরে তুই থাকবি। কাল সকালে আমার মেয়েকে একবার শোনাবি তোর পাখি আর জানোয়ারের ডাক। আমার মেয়ের নাম শ্রীমতী। তার মতো বিদুষী মেয়ে আর ভূভারতে নেই। সে শাস্ত্র পড়েছে, ব্যাকরণ পড়েছে, ইতিহাস পড়েছে, গণিত পড়েছে, দেশবিদেশের রূপকথা সে জানে, রামায়ণ মহাভারত জানে। সে ঘরেই থেকেছে চিরটা কাল। সূর্যের আলো তার গায়ে লাগতে দিইনি, তাই তার মতো দুধে আলতায় রং আর কোনো মেয়ের নেই।'

সুজন ত শুনে অবাক। মেয়ে মানুষের এত বিদ্যেবুদ্ধি? আর সে নিজে যে অবিদ্যের জাহাজ! এই রাজকন্যার সঙ্গে ত কথাই বলা যাবে না।

'এই রাজকন্যারই কি বিয়ে হবে?' সে জিগ্যেস করল রাজাকে।

'হ্যাঁ, এরই বিয়ে। আজবপুরের যুবরাজের সঙ্গে। সেও পণ্ডিত ছেলে, অনেক পড়াশুনো করেছে। রূপেগুণে সব দিক দিয়েই ভালো।'

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে সুজনকে তার ঘর দেখিয়ে দিল রাজার একজন পরিচারক। রাজামশাই বললেন, 'আজ বিশ্রাম কর, কাল সকালে তোকে এরা নিয়ে আসবে আমার কাছে। তারপর তোর গুণের পরীক্ষা হবে।'

'একটা কথা রাজামশাই।' সুজন ওই পাখিখোর রাক্ষসের কথা ভুলতেই পারছিল না।

'কী কথা?'

'আকাশী পাহাড়টা এখান থেকে কত দূর?'

'চার ক্রোশ পথ। কেন?'

'না, এমনি জিগ্যেস করছিলাম।'

রাজা যে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন সেটা সুজন তার ঘর দেখেই বুঝতে পারল। দিব্যি বড় ঘর, তাতে চমৎকার নকসা করা একটা পালঙ্ক, আর তাছাড়াও আসবাব রয়েছে কাঠের আর শ্বেতপাথরের। পালঙ্কের বালিশের মতো বাহারের নরম বালিশ সুজন কখনো চোখেই দেখেনি, ব্যবহার করা তো দূরের কথা।

রাত্তিরে খাবারও এলো এমন যা সুজন কোনোদিন খায়নি। কতো পদ, আর তাদের কী স্বাদ, কী গন্ধ! সব শেষে মিষ্টান্নই এল পাঁচ রকম। এত খাবে সে কী করে?

যতটা পারে তৃপ্তি করে খেয়ে সুজন ভাবতে বসল। সেই রাক্ষসের কথাটাই বার বার মনে পড়ছে তার। পাখির মতো এত সুন্দর জিনিস, আর সেই পাখিই এই রাক্ষস টপ্ টপ্ করে গিলে খায়? এমনই তার খিদে যে শহরের সব পাখি সে শেষ করে ফেলেছে। একবার তার আস্তানাটা দেখে এলে হয় না? সুজনের এখনো ঘুম পায়নি। বাইরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। পাহাড় কোন দিকে সে তো দেখাই আছে, শুধু গুহাটা কোথায় সেটা খুঁজে বার করা।

সুজন খাট থেকে উঠে পড়ল। তারপর দুগ্গা বলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তাকে সকলেই চিনে গেছে, কাজেই ফটকে কেউ কিছু জিগ্যেস করল না।

চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো, সুজন তারই মধ্যে সটান চলল আকাশী পাহাড় লক্ষ করে। অল্প কুয়াশায় পাহাড়টাকে মনে হয় ঝাপসা।

নিঝুম শহর দিয়ে দেড় ঘণ্টা হেঁটে সুজন গিয়ে পৌঁছাল পাহাড়ের তলায়। চারদিকে জনমানব নেই, রাতের প্যাঁচাও বোধহয় গেছে রাক্ষসের পেটে।

পাহাড়ের পাশ ধরে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকটা পৌঁছাতেই সুজন দেখতে পেল মাটি থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপরে একটা অন্ধকার গুহা।

এটাই নিশ্চয় সেই রাক্ষসের গুহা। মানুষও কি এই

রাক্ষসের খাদ্য নাকি? আশা করি নয়।

সুজন সাহস করে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল।

এই যে গুহার মুখ। পাহাড়ের উল্টো দিকে চাঁদ, তাই গুহার ভিতরে মিশ-কালো অন্ধকার।

সুজনের মনে রাগ থেকে কেমন যেন একটা সাহস এসেছে। পাখিরা তার বন্ধু, আর সেই বন্ধুরা যাচ্ছে এই রাক্ষসের পেটে, তাই এ রাগ।

সুজন অন্ধকার গুহার ভিতরটায় গিয়ে ঢুকল।

দশ পা ভিতরে যেতেই তাকে সেই দশ পা-ই ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে হল।

গুহার ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর হুঙ্কার শোনা গেছে। এমন বীভৎস ডাক কোনো জানোয়ারের মুখ দিয়ে বেরোয় না।

এটা রাক্ষস, আর রাক্ষস সুজনকে দেখেছে, আর দেখে মোটেই পছন্দ করেনি।

।। ৩ ।।

সুজন এই ঘটনার পর আর সময় নষ্ট না করে প্রাসাদে তার ঘরে ফিরে এসেছিল।

পরদিন সকালে একজন কর্মচারী এসে তাকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। রাজা এখনো সভায় যাননি। আগে তাঁর মেয়েকে শোনাবেন সুজনের পাখি আর জানোয়ারের ডাক, তারপর রাজকার্য। সুজন বুঝল মেয়ের উপর রাজার কত টান।

এদিকে রাজকন্যা শ্রীমতী কাল রাত্রেই শুনেছে সুজনের কথা—কী ভাবে বাঘের ডাক ডেকে সে জঙ্গলে বাঘ আছে প্রমাণ করে দিয়েছিল। শ্রীমতী এক বেড়াল ছাড়া কোনোদিন কোনো জানোয়ারের ডাক শোনেনি। পাখি যখন ছিল শহরে—আজ থেকে পাঁচ বছর আগে—তখনও সে তার হীরামন ছাড়া কোনো পাখির ডাক শোনেনি। ঘর থেকে সে বাইরেই বেরোত না শুনবে কি করে? সে যে অসূর্যম্পশ্যা। যে সূর্যকে দেখেনি, তার ত প্রকৃতির সঙ্গে চোখের দেখাই হয় নি। অবিশ্যি বই পড়ে সঙ্গে চোখের দেখাই হয় নি। অবিশ্যি বই পড়ে সে অনেক কিছুই জেনেছে, কিন্তু বইয়ে আর কত জানা যায়? চোখে দেখা আর কানে শোনায় যা হয়, শুধু বই পড়ে কি তা হয়? বাংলার পাখির নাম শ্রীমতীর মুখস্থ, কিন্তু সে সব পাখি কেমন ডাক ডাকে, কেমন গান গায়, তা সে কানে শোনেনি কখনো।

সুজন যখন গিয়ে অন্দর মহলের আঙিনায় পৌঁছাল, তখন শ্রীমতী তার ঘর থেকে আরেকটা ঘরে এসে বসেছে। এঘরে একটা খোলা জানালা আছে, তাই দিয়ে আঙিনায় কোনো গান বাজনা হলে তার আওয়াজ শোনা যায়। সেই আঙিনাতেই এই হরবোলা তার কারসাজি দেখাবে।

দেউড়িতে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই রাজামশাই সুজনকে বললেন, 'কই, শুরু কর এবার তোর খেলা। আমার মেয়ে উপরে বসে আছে, সে শুনতে পাবে।'

কালটা বসন্ত, তাই সুজন পাপিয়া আর দোয়েলের ডাক দিয়ে শুরু করল। মানুষের গলায় এমন আশ্চর্য পাখির ডাক কেউ শোনেনি কখনো। পাঁচ বছর পরে এই প্রথম জবরনগরে পাখির ডাক শোনা গেল।

শুরুতেই রাজকন্যার চোখে জল এসে গেছে। চাপা স্বরে বলল শ্রীমতী, 'আহা কী সুন্দর! পাখি এমন করে ডাকে? আর এই পাখিরা সব গেছে সেই রাক্ষসের পেটে? কী অন্যায়! কী অন্যায়!'

সুজন একটার পর একটা ডাক শুনিয়ে চলল। রাজার বুক গর্বে ভরে উঠল, আর রাজকন্যার প্রাণ ছটফট করতে লাগল। এমন যার ক্ষমতা, তাকে একবার চোখে দেখা যায় না?

ঘরের বাইরে বারান্দা, সে বারান্দা বাহারের কাপড় দিয়ে ঢাকা। সেই কাপড়ের এক পাশ ফাঁক করলে তবে নীচে দেখা যেতে পারে। রাজকন্যার পাশে তার সখী বসা, তাকে একবার ঘর থেকে সরানো দরকার। 'সুরধুনী, আমার জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু খাবার জল এনে দে,' বলল রাজকন্যা।

জল আনতে সেই শোবার ঘরে যেতে হবে, তাতে কিছুটা সময় যাবে।

সুরধুনী চলে গেল।

শ্রীমতী এক ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এসে কাপড় ফাঁক করে দেখে নিল সেই ছেলেটিকে। সে এখন ফটিক-জলের ডাক ডাকছে। শ্রীমতীর দেখে বেশ ভালো লাগল ছেলেটিকে; তবে এটা সে বুঝল ছেলেটির পোষাকে যে সে গরীব।

সুরধুনী জল নিয়ে আসার আগেই শ্রীমতী তার জায়গায় ফিরে এসেছে।

এক ঘন্টা চলল সুজনের হরবোলার খেলা। এমন খেলা জবরনগরের রাজবাড়িতে কেউ কোনোদিন দেখেনি। আর রাজকন্যা ত এমন সব ডাক শোনেইনি; তার চোখের সামনে একটা নতুন জগত খুলে গেছে—প্রকৃতিব জগত, যার সঙ্গে এই ষোল বছরে তার কোনোদিন পরিচয়ই হয়নি। এই গরীব ঘরের ছেলেটি তার জীবনে একটা নতুন প্রাণ এনে দিয়েছে। এই সব ভাবতে ভাবতেই শ্রীমতীর মনে পড়ল যে আসছে মাসে তার বিয়ে। যাকে সে বিয়ে করবে, সেই যুবরাজ রনবীর কথা দিয়েছে যে শ্রীমতীর পড়াশুনার ব্যবস্থা তার বাড়িতেও হবে। আর তার জন্য অন্দর মহলের ভিতরে একটা ঘর রাখবে যাতে সূর্যের আলো কখনো প্রবেশ না করে। আলো লেগে রাজকন্যার রং যদি কালো হয়ে যায়।

সুজন কিন্তু রাজকন্যাকে দেখতে পায়নি। রাজা তাকে একটা হাতে আঁকা ছবি দেখিয়ে বলেছেন, 'এই দেখ আমার মেয়ের চেহারা।' ছবি দেখেই সুজনের মনে হয়েছে এ যেন স্বর্গের অ প্সরী। তার পর সুজন যখন শুনল যে রাজকন্যা তার হরবোলার ডাক শুনে মোহিত হয়ে গেছে, তখন গর্বে তার বুকটা ভরে উঠল। আর তাছাড়া রাজামশাই ইনামও দিয়েছেন ভালো; একটা হীরের আংটি আর একশত স্বর্ণমুদ্রা। সুজন জানে, এই টাকায় তাদের বাকী জীবনটা স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

কেবল একটা কথা ভেবে তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ওই রাক্ষসটাকে যদি সায়েস্তা করা যেত!

।। ৪ ।।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে সুজন বেশ কয়েকবার কাছাকাছির মধ্যে অন্য শহরে গিয়ে হরবোলার খেলা দেখিয়ে আরো কিছু রোজগার করে নিয়েছে, আর সে রোজগারের প্রায় সবটুকুই সে দেশে গিয়ে তার বাপের হাতে তুলে দিয়েছে। সে বেশ বুঝতে পারছে যে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যেটুকু সময় সে রাজবাড়িতে থাকে, তার অনেকটাই সে নতুন নতুন ডাক অভ্যাস করে কাটিয়ে দেয়। একথা সে কখনই ভুলতে পারে না যে সামনে বিয়ের সভায় তাকে খেলা দেখাতে হবে, জবরনগরের রাজার সুনাম তাকে রাখতে হবে।

যদিও বিয়ের ধুমধাম শুরু হয়ে গেছে, রাজকন্যা শ্রীমতীর মনের অবস্থা কী তা কেউ জানে না। তার জীবনটা যেমন চাপা, তার মনটাও তেমনি চাপা। তবে এটা ঠিক যে গত একমাসে তাকে হাসতে দেখেনি কেউ। সুজন প্রাসাদের নীচের ঘরে পাখির ডাক অভ্যাস করে, তার সামান্য কিছুটা শব্দ ভেসে আসে দোতলার অন্দর মহলের এই অংশে। সেই ক্ষীণ শব্দ শুনে শ্রীমতীর মনটা দুলে ওঠে। আশ্চর্য গুণ এই যুবকের। না জানি কথাবার্তায় সে কেমন!

এই কৌতূহল এক মাসে চরমে পৌঁছে গেছে। যে এমন সব ডাক ডাকতে পারে, যে এমন সুপুরুষ অথচ সরল, সে লোক কেমন সেটা শ্রীমতীকে জানতে হবেই। সে একদিন সুরধুনীকে কথাটা বলেই ফেলল।

সুরধুনী আজ পাঁচ বছর ধরে শ্রীমতীর সখী। শ্রীমতীকে যে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয় সেটা সুরধুনী পছন্দ করে না। সে শ্রীমতীর কাছে বর্ণনা দেয় সকালের ফুটফুটে রোদে গাছপালা নদনদী মাঠঘাটের। পাখি কেমন জিনিস সে এককালে দেখেছে সেকথাও সে বলে।

'তোকে ভাই একটা কাজ করতেই হবে,' শ্রীমতী বলল।

'কী কাজ?'

'সেই হরবোলার ঘরে যাবার রাস্তাটা জেনে নিতে হবে।

সুরধুনী কথা দিল সে জেনে দেবে। আর তারপর সত্যিই একদিন অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে প্রহরীকে শ্রীমতীর কাছ থেকে নেওয়া একটা মোহর ঘুষ দিয়ে সে নীচে এসে দেখে গেল সুজনের ঘর। সুজন তখন বসন্তবৌরীর ডাক অভ্যাস করছে।

সেই রাত্রে সুজন যখন খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় উঠতে যাবে তখন সুরধুনী এল তার ঘরে।

'এ কি!' বলে উঠল সুজন।

সুরধুনী ঠোঁটে আঙুল দিল। তারপর ইসারা করে ঘরে ডেকে নিল শ্রীমতীকে।

'তুমি! অবাক হয়ে বলল সুজন। 'তোমার ছবি আমি দেখেছি!'

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম,' ধীর কণ্ঠে বলল শ্রীমতী। 'তুমি আমার সামনে নতুন জগত খুলে দিয়েছ।'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কি কথা বলব? আমার ত বিদ্যে বুদ্ধি নেই। আমি পাঁচের নামতাও বলতে পারি না, আর তুমি শুনেছি অনেক লেখাপড়া করেছ। তাই—'

'তুমি সূর্য দেখেছ?'

'হ্যাঁ। রোজ দেখি। সূর্য যখন ওঠে তখন আকাশে সিঁদুর লেপে দেয়। আবার যখন ডোবে তখনও। সূর্য ওঠার আগেই পাখিরা গান শুরু করে। সূর্য ডুবলেই তারা তাদের বাসায় চলে যায়।'

আমার কিছুই ভালো লাগছে না।'

'কিন্তু তোমার যে সামনে বিয়ে। এখন ভালো না লাগলে চলবে কি করে? বিয়েতে কত আনন্দ!'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার মুখে পাখির

'এ কথা কেন বলছ?'

'আমি সেই রাক্ষসের গুহায় গিয়েছিলাম। তার এক ডাকে আমি পালিয়ে এসেছি। সে বড় ভয়ানক ডাক।'

'শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি এত বাঘ ভাল্লুকের ডাক ডাকলে, তোমার বুঝি সাহস আছে। যাই হোক্, যে এই বিহঙ্গভুক্‌কে মারতে পারবে আমি তাকেই বিয়ে করব।'

'এর নাম বিহঙ্গভুক্ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি বইয়ে পড়েছি। বিহঙ্গ মানে পাখি।'

এইখানেই কথার শেষ হল। সুরধুনীর সঙ্গে শ্রীমতী আবার নিজের ঘরে চলে গেল।

।। ৫ ।।

পরদিন সুজনের যেতে হল মরকতপুর।

সেখানের রাজা হরবোলার ডাকে খুশি হয়ে সুজনকে ভালো বকশিস দিলেন। সুজন জবরনগরে ফিরে এল। শ্রীমতীর ফরমাশ মতো একবার রোজ তাকে পাখির ডাক শোনাতে হয়, আর রাজা রোজ তাকে বকশিস দেন।

এদিকে রাজার মনে গভীর চিন্তা। তার মেয়ে বেঁকে বসেছে, যে রাক্ষসকে মারতে পারবে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। আজবপুরের যুবরাজ রণবীর তাই কালই সকালে আসছে জবরনগর। তাকে একা যেতে হবে আকাশীর গুহায়। সে সফল হলে তবেই শ্রীমতীকে বিয়ে করতে পারবে। সাহসী যোদ্ধা হিসেবে রণবীরের নামডাক আছে, তাই জবরনগরের রাজার ভরসা আছে সে হয়ত এই পরীক্ষায় সফল হবে।

এদিকে সুজন মনে মনে ভাবছে—যা ডাক শুনেছি রাক্ষসের, সে ত কোনদিন ভুলতে পারব না। এমন যার ডাক, তার চেহারা না জানি কেমন, আর শরীরের শক্তিই বা না জানি কেমন! আজবপুরের রাজকুমার কি পারবে মারতে এই রাক্ষসকে?

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার কিছু পরেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে আজবপুরের যুবরাজ জবরনগর এসে হাজির হল। তার গায়ে, বর্ম, কোমরে তলোয়ার, পিঠে তূণ, হাতে ধনুক। তাছাড়া ঘোড়ার পাশে খাপের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে একটা বল্লম।

এছাড়া রাজকুমারের সঙ্গে ছিল দুইজন অশ্বারোহী যারা জালে করে শ্মশান থেকে ধরে এনেছিল তিনটে শকুনি। জাল সমেত এই শকুনিগুলোকে ফেলা হবে গুহার মুখে, তাহলেই রাক্ষস বোরোবে—এই ছিল তাদের মতলব।

জবরনগরের বেশ কিছু লোকও গুহার উল্টোদিকে সমতল ভূমিতে জড়ো হয়েছিল এই যুদ্ধ দেখার জন্য। জবরনগরের রাজা নিজে না এলেও, দূত পাঠিয়েছিলেন সংগ্রামের ফলাফল জানার জন্য।

যুবরাজ রণবীর এখন তৈরি। এইবার তার দুজন সহচর জাল সমেত শকুনিগুলিকে গুহার সামনে ফেলে শিঙায় ফুঁ দিয়ে জানিয়ে দিল যে তারা উপস্থিত। তারপর তারা দুইজন সরে গেল, শুধু ঘোড়ার পিঠে রইল রণবীর।

দর্শকের ভীড়ের মধ্যে যারা ছিল তাদের একজনের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। সে হল সুজন হরবোলা। খবর পেয়ে সে সবার আগেই গিয়ে হাজির হয়েছে গুহার সামনে। কিন্তু কেন সে জানে না, তার মন বলছে যুবরাজ সফল না হলেই ভালো।

কিন্তু কই? রাক্ষস বার হয় না কেন? তার জন্যে এমন টোপ ফেলা হয়েছে, তবুও কেন সে গুহার মধ্যে বসে?

এদিকে যুবরাজের ঘোড়া অস্থির হয়ে ছটফটানি শুরু করেছে। এবার যুবরাজ সাহস করে গুহার দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিঙাও বেজে উঠল তিনবার, আর তার পরেই সকলের রক্ত হিম করে দিয়ে শোনা গেল এক বিকট হুঙ্কার, যার ফলে যুবরাজের ঘোড়া সামনের পা দুটো আকাশে তুলে যুবরাজকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে উল্টো মুখে দিল ছুট। তখন যুবরাজকেও ছুটতে হল ঘোড়ার পিছনে। বোঝাই গেল সে রাক্ষসের কাছে হার স্বীকার করেছে; যার এমন গর্জন তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস যুবরাজের নেই।

ভীড় করে যারা এসেছিল তারাও যে যেদিকে পারে চম্পট দিল। কেবল একজন—সুজন হরবোলা—মুখ গম্ভীর করে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরপদে ফিরতি পথ ধরল।

রণবীরের পর আরও সাতটি দেশের সাতটি যুবরাজ বিহঙ্গভুককে মারতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তার ডাক শুনে পালিয়ে বাঁচল, আর সেই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েও পিছিয়ে যেতে লাগল, রাজার কপালেও দুশ্চিন্তার রেখা দিনে দিনে বাড়তে

লাগল।

এই আটজন যুবরাজের শোচনীয় অবস্থা সুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে; দানবের হুঙ্কারে শুধু ঘোড়ার নয়, ঘোড়সওয়ারের মনেও যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে সেটা সুজন নিজের চোখে দেখেছে।

এই আটজন হার মানার ফলে আর কোনো দেশের কোনো রাজপুত্র সাহস করে জবরনগরের এই দানব সংহারে এগোতে পারল না।

ন দিনের দিন সকাল বেলা রাজা মন্দির থেকে পুজো সেরে যেই বেরিয়েছেন অমনি দেখলেন সুজন হরবোলা তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। রাজার মন খুব খারাপ, তাই গম্ভীর ভাবেই বললেন, 'কী সুজন, তোর আবার কী প্রয়োজন?'

সুজন বলল, 'মহারাজ, আমাকে একটা বল্লম দিতে পারেন?

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, কী হবে বল্লম দিয়ে?

'আমি বিহঙ্গভুক্‌কে মারার একটা চেষ্টা দেখব।

'তোমার কি মতিভ্রম হল নাকি?'

'একবার দেখিই না চেষ্টা করে, মহারাজ। সে যখন প্রাণী, তখন তার প্রাণ আছে, আর প্রাণ যদি থাকে তাহলে তার কলিজা আছে। সেই কলিজায় যদি বল্লমটা গেঁথে দিতে পারি ত সে নির্ঘাৎ মরবে।'

'কিন্তু সে ত গুহা থেকে বারই হয় না।'

'ধরুন যদি আজ বেরোয়! তার মতিগতি ত কেউ জানে না।'

রাজা একটু ভাবলেন সুজনের দিকে চেয়ে। তার স্বাস্থ্যটা যে ভাল, শরীরে যে শক্তি থাকার সম্ভাবনা, সেটা তাকে দেখলে বোঝা যায়।

অবশেষে রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, বল্লমের অভাব নেই। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোর হাবভাবে মনে হয় তুই এ কাজটা না করে ছাড়বি না।'

বল্লম জোগাড় হল অল্পক্ষণের মধ্যেই। এবার সুজন ঘোড়াশাল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে বল্লম হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আকাশীর দিকে রওনা দিল।

এদিকে রাজার সুজনের উপর একটা মমতা পড়ে গেছে; ছেলেটার কী হয় দেখবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে চললেন পাহাড়ের দিকে।

সুজন গুহার সামনে পৌঁছানর আগেই ঘোড়াটা ছেড়ে দিল। সে জানে সে যদি ঘোড়ার পিঠে থাকে তাহলে ঘোড়া ভয় পেয়ে ছুট দিলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পালাতে হবে।

গুহার ভিতরে দিনের বেলা রাতের মতো অন্ধকার, কারণ গুহাটা উত্তরমুখী।

ইতিমধ্যে রাজাও পৌঁছে গেছেন; তিনি একটু দূর থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপেই ঘটনাটা দেখবেন। আজ লোকের ভীড় নেই, কারণ শহরে ঢ্যাঁড়া পড়ে গেছে যে আর কোনো রাজপুত্র রাক্ষসকে মারতে আসবে না।

সুজন হাতে বল্লম নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল গুহার দিকে। চারিদিক নিস্তব্ধ। পাখি নেই, তাই এই অবস্থা, না হলে সকালে পাখি না ডেকে পারে না।

এবার সুজন ঠাকুরের নাম জপ করে একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিরাট একটা দম নিয়ে সেই দম ছাড়ার সময় তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই নদিনে শেখা একটা ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ল। এই ডাকে রাজার ঘোড়া ভড়কে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু রাজা কোনো মতে তাকে সামলালেন।

এইবার এল সেই হুঙ্কারের জবাব—আর সেই সঙ্গে গুহা থেকে এক লাফে বাইরে রোদে এসে পড়ল যে প্রাণীটা সেটা মানুষ না জানোয়ার তা কেউই সঠিক বলতে পারবেনা। বরং বলা চলে তিনে মিশে এক কিম্ভুত কিমাকার প্রাণী যাকে দেখলে মানুষের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়।

সুজন হরবোলা কিন্তু আর কিচ্ছু দেখল না, দেখল শুধু প্রাণীটার যেখানে কলিজাটা থাকার কথা সেইজায়গাটা। সেটার দিকে তাগ করে সে প্রাণপণে চালিয়ে দিল তার হাতের বল্লমটা। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হয়ে চোখ খুলে সুজন প্রথমেই দেখতে পেল সেই মুখটা যেটা আঁকা ছবিতে দেখে তার মনটা নেচে উঠেছিল।

শ্রীমতীর পাশেই রাজা দাঁড়িয়ে; বললেন, 'রাক্ষস মরেছে, তাই তোমার হাতেই দিলাম আমার মেয়েকে। আজ থেকে সাতদিন পরে বিয়ের লগ্ন। তোমার বাপ-মাকে খবর দিতে লোক যাবে ক্ষীরা গ্রামে। তারাও এখানেই থাকবে বিয়ের পর, আর তুমিও থাকবে।'

'আর আমার লেখাপড়া?'

শ্রীমতী হেসে বলল, 'আমি বলেছি সে ভার আমার। পাঁচের নামতা দিয়ে শুরু—বিয়ের পর দিন থেকেই। আর যদ্দিন না দেশে পাখি আসছে তদ্দিন তুমি আমাকে পাখির ডাক শোনাবে।'

'তাহলে একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'তুমি আর ঘরের মধ্যে বন্দী থেকো না।'

'না, আর কোনোদিন না।'

'আর তোমার হীরামনটাকে ছেড়ে দাও। খাঁচায় পাখি রাখতে নেই। ওরা আকাশে উড়তে পারে না, ওদের বড় কষ্ট হয়।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

(বৈশাখ-১৩২৬)

ছবি: সত্যজিৎ রায়

বিচিত্র যান

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় চড়েছিলুম গরুর গাড়ি
জাহাজ চড়ে পরে দিলুম সাগর পাড়ি
আর কেউ নয়, সেই আমি।

আরও পরে বিমান চড়ে বারেবারে
পাখির মতো উড়ে গেলুম আকাশপারে
আর কেউ নয়, সেই আমি।

মহাশূন্যে নভোযানে পর্যটন
এই জীবনে ঘটবে না সে অঘটন,
ঘটবে যখন দেখবে তখন
নেই আমি।

নভোযান সত্যি হবে ধরে রেখো
মহাশূন্যে ঘোরার জন্য তৈরি থেকো
তোমরা যাবে যদিও তখন
নেই আমি।

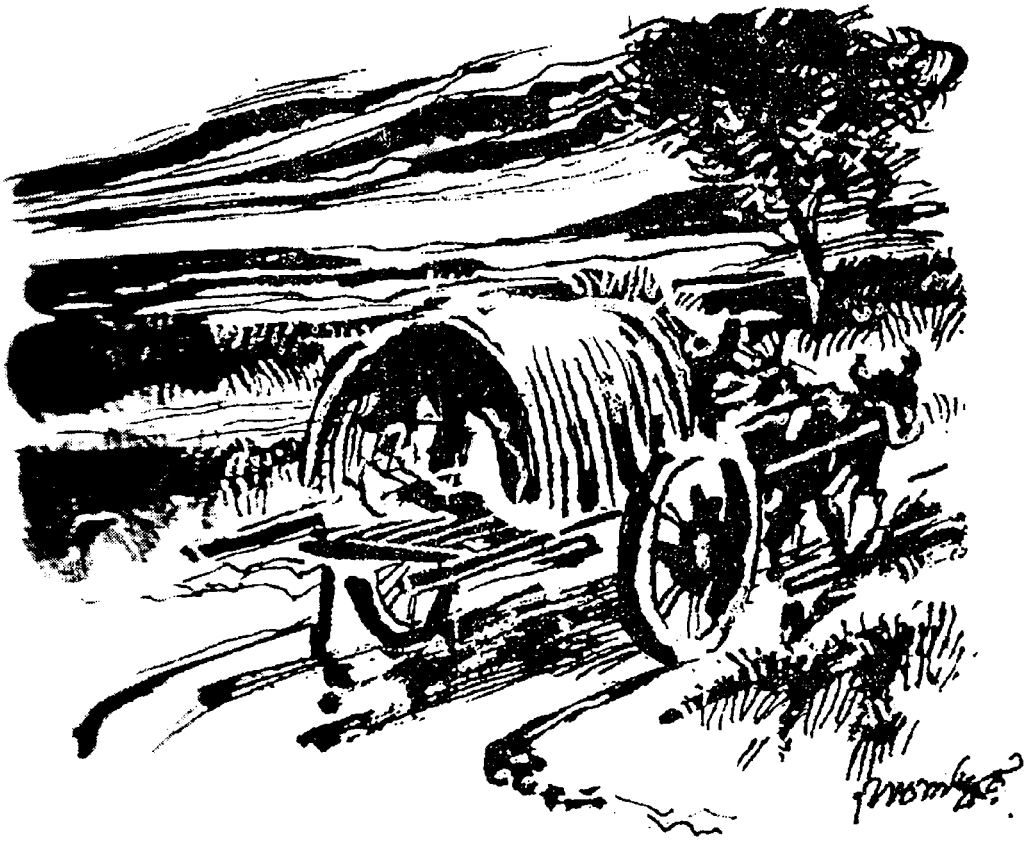

(শারদীয়া- ১৪০৭)

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

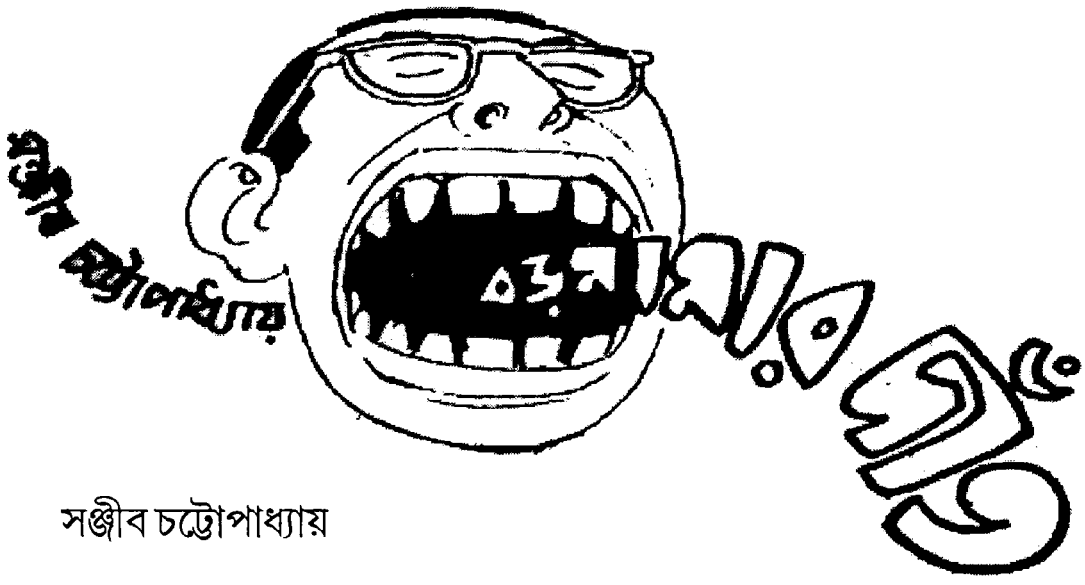

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়মামা সত্যি সকালেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ তেমন সুবিধের নয়। এই সময় কেউ সুপ্রভাত বললে, খ্যাঁক করে উঠবেন।

পেয়ারের কুকুর লাকি, সুপ্রভাত জানাবার জন্যে সোফা থেকে নেমে এল তড়াক করে। এতদিন কুকুরের সঙ্গে থেকে থেকে কুকুরের ভাষা বুঝতে শিখে গেছি। কুকুরের ভাষা ল্যাজে। মুখ দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে যা বেরোয় তার কোনও মানে নেই। মানুষ যখন ঢেকুর তোলে, তার কোনও মানে থাকে? একটাই মানে, পেট খুব ভরে গেছে। কুকুর কথা বলে ল্যাজে।

লাকি সামনে দু-পা তুলে ধেই ধেই করে নাচছে, আর পুটুক পুটুক ল্যাজ নেড়ে বলছে—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।

বড়মামা লাকিকে ইংরিজিতে এক ধমক লাগালেন, 'স্টপ দ্যাট নুইসেন্স।' বলেই মনে পড়ল জীবজন্তুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে নেই—তারা মানুষ নয়, ছাত্র নয়, কর্মচারী নয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলেন, 'সরি, সরি লাকি।' লাকি চক চক করে হাত চেটে দিয়ে জানিয়ে দিলে, ক্ষমা করলুম।

বড়মামার ভুরু কুঁচকে আছে। আমার দিকে তাকালেন। এমন মুখ এর আগে আমি কখনও দেখিনি। বেশ ঘাবড়ে গেলুম। এ মুখ প্রধান শিক্ষকের হতে পারে, আমার বড়মামার কখনই নয়।

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

'বলুন।'

'ওই সাজিটা নাও।'

'ফুল তুলতে হবে?'

'ব্যস্ত হয়ো না। ওয়েট। কি করতে হবে, আমিই ত বলব।'

'না, সাজিতে ত ফুলই তোলে। তাই?'

বড়মামা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'তাহলে তাই তোলো, আমার উপকার তোমাকে আর করতে হবে না।'

'আচ্ছা বলুন, কি করতে হবে?'

'এক সাজি কচিকচি পেয়ারা পাতা তুলে নিয়ে এসো।'

'ছাগলকে খাওয়াবেন বড়মামা?'

'আবার প্রশ্ন!'

বড়দের কথাবার্তা বোঝা দায়। এই বলবেন, 'যতক্ষণ না বুঝবে ততক্ষণ প্রশ্ন করবে। প্রশ্নের খোঁচা মেরে মেরে সবকিছু জেনে নেবার চেষ্টা করবে। এই তো তোমাদের জানার বয়েস। আবার একবারের বেশি দু-বার প্রশ্ন করলে রেগে কাঁই।

একসাজি পেয়ারাপাতা এনে বড়মামার টেবিলে রাখলুম। আমার কাজ আমি করেছি। লাকি এসে পরিদর্শন করে গেল। কুকুরের সঙ্গে বসবাস করে আমি নিজেও একটা কুকুর হয়ে গেছি। অগৌরবের নয়, গৌরবের কুকুর। কুকুরের বোঝা আমিও বুঝি। কুকুর চোখ দিয়ে দেখে না, দেখে নাক

দিয়ে। আমাদের বোধশক্তি যেমন মাথায় কুকুরের বোধশক্তি তেমনি নাকে। নাক দিয়ে পাতা দেখে কুকুর সরে গেল লক্ষ্মী মেয়ের মত।

বড়মামা চোখ বুজিয়ে ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন। পাতা এনেছি শুনে চোখ খুললেন। বেলপাতায় শিবপুজো হয়, পেয়ারা পাতায় কি পুজো হয় কি জানি! মুখের যা চেহারা প্রশ্ন করে জানার সাহস আর নেই।

বড়মামা টেবিলে একটা খবরের কাগজ বিছোলেন, তারপর মুঠো মুঠো পেয়ারা পাতা মুখে পুরে, চোখ বুজিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। এ আবার কি ধরনের আয়ুর্বেদিক ব্রেকফাস্ট! চিবনো পাতা ফেলতে লাগলেন কাগজে। লাকি পাশের চেয়ারে প্রসাদের লোভে এসে বসেছিল, অবাক হয়ে বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। লাকি বিস্কুট বোঝে, মাংস বোঝে, এমন সাত্ত্বিক আহার দেখে তার হাসি পাচ্ছে। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বড়মামা বাগানের শামুকের মত চিবিয়ে চিবিয়ে, চিবনো পাতার একটা স্তূপ তৈরি করে ফেলেছেন।

লাকি ভৌ করে প্রশ্ন করলে, এ তোমার হচ্ছেটা কি?

হঠাৎ বড়মামার কোঁচকান ভুরু সমান হয়ে গেল। মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ ওঠার মত, মুখে একটা হাসির ভাব খেলতে লাগল। যাক বাবা, বড়মামা এতক্ষণ পরে ফিরে আসছেন তাহলে!

চোখ খুলে বললেন, 'গোইং গোইং গন। চলে গেছে।' প্রশ্ন করার সাহস ফিরে এল। 'কি হয়েছিল বড়মামা? গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল?'

'না।'

'তাহলে শোঁয়া পোকা?'

'আজ্ঞে না। দাঁতের যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। জব্দ করে ফেলেছি। ভেষজের কি গুণ দেখেছিস? আমি ডাক্তারি ছেড়ে এবার কবিরাজি ধরব! চরক সুশ্রুত। অ্যালোপ্যাথি বোগাস! কাল থেকে আমি মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খেয়েছি। কিছুই হল না। পেয়ারা পাতার গুণ দেখ?দিশি দাওয়াই। বসবাস গাছে। তোরা সব সায়েব, বিলিতি বিলিতি করে হেদিয়ে গেলি! আঃ, মুখটা একেবারে ফ্রেশ হয়ে গেল। মুখে যেন দুধের দাঁত ফিরে এল।'

মাসীমা চা নিয়ে এলেন।

বড়মামা বললেন, 'এই নে, তোর জন্যে কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'কি আবার বাঁচালে?'

'পেয়ারা পাতা। তোর দাঁত কন কন করছে না?'

'শুধু শুধু দাঁত কন কন করবে কেন?'

'বলা যায় না, কুসী করতেও পারে। কথা বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। চিবিয়ে রাখ, চিবিয়ে রাখ। ভবিষ্যৎ ভেবে মানুষের কাজ করা উচিত।'

চায়ের কাপ রেখে মাসিমা চলে গেলেন। বড়মামার সারাদিনের সব উপদেশ পালন করতে হলে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে মুখটা কেমন যেন করলেন। আর এক চুমুক খেয়ে বললেন, 'যার সঙ্গে যে জিনিস! চায়ের সঙ্গে বিস্কুটই চলে। পেয়ারা পাতার সঙ্গে চা তেমন জমে না। গাছে গাছে কি শত্রুতা দেখ। চা-ও গাছ, পেয়ারাও গাছ, দুজনে তেমন মিল নেই। সব মানুষের স্বভাব পেয়ে যাচ্ছে।

ধরাচুড়া পরে বড়মামা মিলের হাসপাতালে চলে গেলেন। যে কটা পাতা বেঁচেছিল যাবার সময় পকেটে পুরে নিয়ে গেলেন। বলা যায় না আবার যদি কন কন করে। দাঁত নাকি মানুষের চেয়েও অপরাধ প্রবণ। সারা জীবনে অনেক পাপ কাজ করে। পাঁঠা চিবোয়, মুরগির ঠ্যাং ভাঙে, মাছের জীবন নাশ করে। দাঁতের সব কাজই হল নাশকতামুলক, একটাও গঠনমুলক কাজের দৃষ্টান্ত নেই। সারাজীবন খিঁচিয়ে গেল, চিবিয়ে গেল, কামড়ে গেল। আর পাপের বেতন কি?

উত্তরে বললুম, 'মৃত্যু।'

'রাইট। তাই মানুষের আগে দাঁত যায়।'

ন-টার সময় বড়মামা গেলেন। খেল শুরু হল, বেলা এগারোটা থেকে।

প্রথমেই এলেন এক ভোজপুরী হিন্দুস্থানী। বিশাল চেহারা। স্যান্ডো গেঞ্জি। বুকের ওপর পেতলের পদক। বাজখাঁই গলা। গলা শুনে মাসীমা ভয়ে দরজার আড়াল থেকে বললেন, 'কি চাই?'

'হ্যাঁ, লিজিয়ে।' বলে দৈত্যের মত লোকটি কাঁধ থেকে একগাদা ডালপালা উঠোনে ফেললেন। 'ডাগ্‌দারবাবুকে লিয়ে দাঁতন। কোঠারি আছে, কোঠারি?'

লোকটির গলা বড়মামার ছ-টা কুকুরের ছ'রকম ডাকে

ভাল করে শোনা যাচ্ছেনা। মেজমামা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বার বার জিজ্ঞেস করছেন, 'কি হল কি, ডাকাত পড়েছে? কি হল কি ডাকাত পড়েছে?'

আমরা যতবার বলছি, 'না, না। দাঁতন এসেছে।' কিছুতেই শুনতে পাচ্ছেন না। অনেক কষ্টে শোনান গেল। তখন বললেন, 'বসতে বল।'

কোঠারি কি জিনিস মাসীমার মাথায় ঢুকছে না। কোঠারি ত অবাঙালীদের একটা পদবী। কোঠারি এ বাড়িতে আসবে কেন? বড়মামার মিলের ম্যানেজারের নাম ত কোঠারি হতে পারে।

মাসীমা বললেন, 'কোঠারিসায়েব মনে হয় মিলে আছেন।'

'নেহি, নেহি—কাটনে কা কোঠারি।'

'ওঃ হোঃ কাটারি।'

লোকটি কাটারি নিয়ে বসে গেলেন নিম দাঁতন কাটতে। ছ-টা কুকুর চিল্লে কাবু হয়ে গেল। তিনটে বিরক্ত হয়ে তিন দিকে শুয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে।

পাতা ছাড়িয়ে, সাইজ করে কেটেকুটে বান্ডিল বেঁধে, মাল বুঝিয়ে দিয়ে লোকটি উঠে পড়লেন। হাত ঘড়ি, কাঁধে তোয়ালে। একটা দাঁতন চিবোতে চিবোতে বাগানের রাস্তায় পড়ে বিকট সুরে গান ধরলেন, আরে এ রাম ভজুয়ারে! দাঁতন মুখে সে এক বিকটা গান। ঘুমন্ত কুকুর তিনটে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, আবার চেল্লাতে শুরু করল।

আধ ঘণ্টা পরে ফেজ মাথায় এক ভদ্রলোক এলেন। মুখে চাপ দাড়ি। গায়ে চিকনের পাঞ্জাবি। তিনি এলেন স্কুটার চেপে। পেছনে একগাদা ডালপালা।

আমাকে দেখে বললেন, 'হাঁ, লিজিয়ে জনাব, ইয়ে ডক্টারসাবকে লিয়ে।' দোতলায় মেজমামাকে দেখে বললেন, 'সালাম আলেকুম প্রোফেসরসাব।'

একের পর এক আসতে লাগল, গাবভ্যারেন্ডা, অ্যাসশ্যওড়া, নিসিন্দা—উঠোনে একটা জঙ্গল তৈরি হয়ে গেল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কি রে কুসী? আজ কি বনমহোৎসব?'

'না মেজদা। বড়বাবুর দাঁতের যন্ত্রণা, এসব হল রুগীদের ভেট। বড়দাকে ত চেন, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই হয়ত বলছে দাঁতের যন্ত্রণায় বলছে—দাঁতের যন্ত্রণায় কি করা যায় বল ত?'

'তা ডেনটিস্টের কাছে যাচ্ছে না কেন? দাঁতের যন্ত্রণায় একমাত্র দাওয়াই উপড়ে ফেলা।'

'দাঁড়াও, অতই সোজা! বড়দাকে চেন না। কবিরাজী হবে, হাকিমী হবে, টোটকা হবে, সন্ন্যাসী ধরবে, তন্ত্র হবে, তারপর একদিন উপড়ে আসবে। উনি ত ধাপে ধাপে উঠবেন।'

মেজমামা বললেন, 'ওকে চিনিস না, ভীতুর ডিম। কাটাছেঁড়া নিপাতন উৎপাটনের নাম শুনলেই বড়বাবু কাত। নিজের শরীরে ওসব চলবে না। সব চলুক পরের শরীরে।'

লাকি এসে একটা নিসিন্দের ডাল সামনের দু-পায়ে চেপে ধরে হাড়ের মত চিবোতে শুরু করল।

।। দুই ।।

বড়মামার দাঁতের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। ঠাণ্ডা জল সহ্য হচ্ছে না, গরম জলও নয়। কেবল বলছেন, বডি টেমপারেচার। মাসীমা গরম আর ঠাণ্ডা , ঠাণ্ডা আর গরম করতে করতে পাগল হয়ে গেলেন।

খিচুড়ি ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য দাঁত নিচ্ছে না।

বসার ঘরে উপদেষ্টারা বড়মামাকে ঘিরে বসেছেন। তাঁদের চা চলছে, বিস্কুট চলছে, পাঁপড় চলছে। বড়মামা শুধু দেখে যাচ্ছেন আর শুনে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দাঁতের গোড়ায় ক্লোভ অয়েল ঠুসছেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, 'ওকে কিছু হবে না ডাক্তার। দাওয়াই আছে আমার বড়বউমার কাছে। দাঁড়াও এনে দি এক জালা।'

রামবাবু বললেন, 'জিনিসটা কি শুনি?'

'তামাকের মাজন।'

'ও, গুড়াকু। অতি বাজে জিনিস। ডাক্তার, খবরদার ওর কথা শুনো না। একবার ধরেছ কি মরেছ।'

'হ্যাঁ, তুমি তো সব জেনে বসে আছ। মেয়েরা ব্যবহার করছে।'

'সে তো মাতঙ্গিনী হাজরা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। তোমার বউমা রীরাঙ্গনা হতে পারে, সবাই ত আর বীর নয়।'

দুজনে ঝটাটি বাঁধে আর কি, বড়মামা উঁহু, উঁহু করে উঠলেন।

বসাকবাবু পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে বললেন,

'গোড়ায় এক টিপ টিপে ধরো। একেবারে অব্যর্থ। আমাদের সাধন কি কষ্টই না পাচ্ছিল! সারা ঘরে কেঁউ কেঁউ করে ঘুরছে আর বলছে—এর চেয়ে আত্মহত্যাই ভালো। পকেট থেকে ডিবে বের করে বললুম, এক টিপ লাগাও, চেপে ধরো দাঁতের গোড়ায়। দুম্ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, এ জের অ...বাঘের নাকে গুঁজে দিলে জঙ্গল ছেড়ে পালাবে। পরের দিন দেখি কি মোল্লার চকে সাধন মাংসর দোকানে লাইন দিয়েছে। আমাকে দেখেই ছুটে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—মামাবাবু, আপনি ধন্বন্তরি।'

অক্ষয়বাবু বিড় বিড় করে বললেন, 'তোমার মাথা। সাধন ওপর নিচে ষোলোটা দাঁত তুলিয়েছে। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে পারলেই হল।'

'রামবাবু বললেন, 'ডাক্তার তুমি কর্নেল বিশ্বাসকে দেখাও।'

বসাকবাবু বললেন, 'সে হাত আর নেই, বয়স হয়েছে। দেখাতে হলে বোসই বেস্ট। সিক্সটিতে আমার আক্কেল দাঁত এক ছুরির খোঁচায় এমন করে দিলে, বেরিয়ে এল যেন খোল থেকে শামুক বেরলো।'

রামবাবু বললেন, 'এটা কত সাল? এইট্টি-টু। বাইশ বছর আগের হাত আর এখনকার হাত!'

অক্ষয়বাবু বললেন, 'গুপ্তকে দেখাও। ছোকরার যেমন গুণ্ডার মত চেহারা তেমনি অসুরের মত শক্তি। একটানে শেকড়বাকড় উপড়ে আনবে।'

বসাকবাবু বললেন, 'পয়সা খরচ করে গুপ্তর কাছে যাবার কি দরকার। গুপেগুণ্ডার কাছে গেলেই হয়। দু-চারটে গরম গরম কথা হল ফি। এক ঘুষিতে গোটাছয়েক ঝরিয়ে দেবে।'

সিদ্ধান্তে আসার আগেই সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা কুঁই কুঁই করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। লাকিও চলল পেছন পেছন ল্যাজ নাড়তে নাড়তে। ল্যাজের ভাষা কি করতে পারি, কি করতে পারি!

।। ৩।।

রাত আটটা নাগাদ অবস্থা চরমে উঠল।

দাঁতের গোড়া থেকে মন ঘোরাবার জন্যে বড়মামা প্রথমে চালালেন স্টিরিও রেকর্ডপ্লেয়ার। প্রথমে শ্যামা সংগীত। হল না। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ। পরপর এলেন, চলে গেলেন। টপ্পা, খেয়াল হার মানল। যাত্রাপালা নটীবিনোদিনী। ওষুধ ধরল না। রাগপ্রধান কিচ্ছু হল না। এল ইংরিজি, অ্যাবা, ভেনচারম রনগডউইল ওসিবিসা বসি এম। কিছুতেই কিছু হল না। টিভিতে বাংলা দেশ—

মেজমামা এসে বললেন, 'নিউক্লিয়ার অ্যাটাক ছাড়া ও মন ঘুরবে না। যা বলি শোনো—আমার সঙ্গে ডক্টর পালের কাছে চলো। কোনও ভয় নেই।'

মাসীমা বললেন, 'আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। বাচ্চা ছেলেও দাঁত তোলাতে ভয় পায় না।'

মেজমামা বললেন, 'তোলার কথা আসছে কেন? তোলার হলে তুলবে, না হলে শুধু ওষুধ দেবে।'

শিশুকে যেভাবে ভোলায়, সেইভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে বড়মামাকে ডক্টর পালের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হল। পেছনে সাহস যোগাতে যোগাতে চললুম আমরা। মেজমামা মাঝে মাঝে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'শরীর হল আত্মার পোষাক। আত্মা এমন এক বস্তু, জলে গলে না, আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রে কাটা যায় না। গুপেগুণ্ডা কিছু করতে পারে না। দাঁত আত্মা নয়। দাঁত হল পোষাকেরই একটা অংশ। দু-চারটে গেলে কিছু এসে যায় না। শেষ বয়েসে দাঁত পড়ে যাবেই। ঠাকুরদার পড়েছিল, বাবার পড়েছিল, মায়ের পড়েছিল, আমাদেরও পড়বে। দাঁত কখনও আপন জন হয় না। হলে যন্ত্রণা দিত না। ভাগনে যেমন কখনও আপন হয় না, দাঁতও সেই রকম।'

আমাকে আর প্রতিবাদ করতে হল না। মাসীমাই এগিয়ে এলেন, 'মেজদা কথা যখন বলবে একটু ভেবেচিন্তে বুজেসুঝে বলবে।'

'কেন কেন, অন্যায়টা আমি কী বলেছি? আমি শাস্ত্রের কথাই বলছি। জন, জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা।'

'ওটা জন নয়, যম।'

'তুই আমার চেয়ে বেশি জানিস? জন মানে তৃতীয় ব্যক্তি, থার্ড পার্সন।'

'আজ্ঞে না! ওটা যম।'

'আজ্ঞে না! ওটা জন।'

সারাটা পথ জন আর যমে জমজমাট লড়াই চলল।

ডক্টর পালের চেম্বার একেবারে ভর ভরাট। কাঁচের শো-কেসে তিনপাটি দাঁত, হাসছে না খিঁচিয়ে আছে বলা শক্ত।

দাঁত একবার মুখের বাইরে বেরিয়ে এলে তার ভাব আর ভাষা বোঝা দায়।

বড়মামা গাড়ি থেকে নেমে চেম্বারের সিঁড়িতে পা রাখতেই ডাঃ গুপ্ত অ্যাপ্রন পরে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'আরে ডাক্তার এসো, ডাক্তার এসো। কি সৌভাগ্য আমার।'

লম্বা চওড়া, বিশাল চেহারা। আমেরিকার বাস্কেটবল প্লেয়ারদের মত চিউয়িং গাম চিবোচ্ছেন। হাতে এত লোম মনে হচ্ছে ভাল্লুকের হাত।

বড়মামা ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'দাঁত নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি ডাক্তার।'

'আরে ও তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। ধরব আর টকাস্ করে তুলে দোব।'

বড়মামা থেমে পড়লেন। করুণ গলায় ডাকলেন, 'কুসী, এই দ্যাখ, কি বলছে?'

মেজমামা সাহস দিলেন, 'আরে উনি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তুললেই হল? আমরা আছি না!'

কোণের দিক থেকে গালফুলো এক রুগী নাকি সুরে ডাকলেন, 'ডাঁকতাঁর বাঁবু।'

ডঃ গুপ্ত ডাকে কোনও সাড়া দিলেন না।

আমরা সদলে তাঁর ভেতরের চেম্বারে ঢুকে পড়লুম। দাঁত তোলার চেয়ারে বেল্ট বেঁধে একজনকে ফেলে রেখেছেন। বড়মামাকে সাধারণ একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'হাঁ করো, দেখি কি অবস্থা করে এনেছ। আমাদের কাছে তো সব শেষের সময় হরি নাম করতে আসে।'

বড়মামা হাঁ করলেন। ডাঃ পাল টর্চের আলো ফেলে লোহার একটা স্টিক দিয়ে দাঁত বাজাতে আরম্ভ করলেন। দাঁত যদি জলতরঙ্গ হত, এতক্ষণে শুরু হয়ে যেত কনসার্ট। রসগ্রহণ করলেও দাঁত বড় নিরস।

বড়মামা হঠাৎ একসময় বাঘের মত আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আঁউ।'

'আ হিয়ার ইজ দি কালপ্রিট। ব্যাটা, তুমি কোণে বসে কেরামতি দেখাচ্ছ! তোর একদিন কি আমার একদিন।'

ভারি ওজন তোলা আগে মানুষ যেভাবে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, ডাঃ পাল বুক চিতিয়ে সেইভাবে নিঃশ্বাস নিলেন। বড়মামা করুণ মুখে আমার দিকে তাকালেন।

আমরা সমস্বরে বললুম, 'কোনও ভয় নেই।'

'তোমার ভয় করছে ডাক্তার! তাহলে দ্যাখো।'

হাতে একটা যন্ত্র নিয়ে চেয়ারের লোকটির দিকে তেড়ে গেলেন। পিছন দিক থেকে তাঁর মাথাটা চেয়ারের উঁচু হেডরেস্টে ঠেসে ধরে, মুখে যন্ত্র পুরে ডালাখোলা বাক্সের মত হাঁ

করিয়ে দিলেন। পাশের ট্রে থেকে চকচকে সাঁড়াশির মত একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে দাঁতে চেপে ধরলেন। কড়াক করে একটা শব্দ হল।

বড়মামা শিউরে উঠে চোখ বুজলেন। কড়ড় মড়ড় শব্দ হতে লাগল আর ডাক্তার রেগে রেগে বলতে লাগলেন, 'সব শেষ সময়ে এসে মরবে। আসবে একেবারে বারোটা বাজিয়ে।'

প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মারলেন। লোকটির শরীর টান টান হয়ে গেল। সাঁড়াশির মুখে ধরা বর্ষার ফলার মত দাঁতের অংশ আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন, 'শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

দাঁতটা ঠকাস করে একটা ডিশে ফেলে দিয়ে মুখে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে খানিকটা ওষুধ স্প্রে করে দিয়ে চেয়ার থেকে লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি সামনে কুঁজো হয়ে টলতে টলতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ডাঃ পাল বললেন, 'কি বুঝলে ডাক্তার?'

বড়মামা চোখ ঢেকে বললেন, 'উঁ।'

'এ সব আমাদের কাছে জলভাত। দাঁত একটা জিনিস— ধরো আর ফেলো। নাউ কাম হিয়ার।'

বড়মামার চোখমুখ ছাইবর্ণ। আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। পরীক্ষা-টরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'দাঁড়াও, একটা ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে ব্যথাটা আগে কমাই। দাঁতটার অবস্থা তেমন ভাল নয় হে। ভেতরে ভেতরে বেশ বিগড়ে বসে আছে।'

মাড়ির পাশে পাশে পুটপুট করে কয়েকবার ছুঁচ ফোটালেন ফোটালেন ডাক্তারবাবু। ইন্‌জেক্‌সনেও বড়মামার ভয়। সিঁটিয়ে আছেন।

ইন্‌জেক্‌সান শেষ হতেই বড়মামা বললেন, 'চলি, তাহলে?'

'ব্যস্ত হচ্ছ কেন ডাক্তার! একটু বসে যাও। সারা রাত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দু-দশ মিনিট বসে যাওয়া ভাল। তুমি ওই ডেক চেয়ারে বসো।'

বড়মামা বসলেন ডাঃ পাল চেয়ারে টেনে আনলেন এক ভদ্রমহিলাকে। সেই এক ব্যাপার, দাঁত আর দাঁতের মালিককে ধমক-ধামক চলল। প্রতিবাদ করার উপায় নেই, মুখে যন্ত্র পোরা। ডাক্তারবাবু সাট্ করে এক টান মেরেই হিস হিস করে উঠলেন। তারপর ভদ্রমহিলার দাঁতের সারি থেকে এক হ্যাঁচকা টানে আর একটা দাঁত তুলে আনলেন।

মহিলা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ডাক্তারবাবু বললেন, 'বুঝলে ডাক্তার, অ্যানেসথেসিয়ার এই দোষ, যার দাঁত তুলছি সেও বোঝে না কি তুলছি, যে তুলছে সেও বোঝে না কি তুলছে। ইস, মহিলার একটা ভাল দাঁত টেনে তুলে দিয়েছি।'

'বড়মামা বললেন, 'আমি এবার উঠি ডাক্তার।'

'উঠবে, উঠবে। জিভ দিয়ে দ্যাখো তো দাঁতের চারপাশটা বেশ অসাড় হয়েছে কি না।'

বড়মামা বললেন, 'জিভ নাড়াতে পারছি না। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে ভাল আর কি হবে?'

'তাই নাকি! কই দেখি, চেয়ারে একবার বোসো দেখি, একটু রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করে দি। আসলে ভাল হলে ত হবে না,সাড়ে ভাল হতে হবে ত।'

বড়মামা চেয়ারে বসলেন।

মেজমামা আর মাসীমা দুজনে ফিস্ ফিস্ করলেন। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। চোখে চোখে আঙুলের ইশারায় কোন একটা পরিকল্পনা পাকা হতে চলেছে। এর মধ্যে একজন কিছুই জানে না, বাকি সবাই জানে। ঘরের বাতাস উৎকণ্ঠায় থম থম করছে। যে কোন মুহূর্তে একটা খুন হবে। মানুষ নয়। খুন হবে একটা দাঁত। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'বড়মামা পালান।'

ডাঃ পাল বললেন, 'দেখি, হাঁ কর ত ডাক্তার।'

বড়মামা হাঁ করলেন।

আমার চোখ ডাক্তার পালকে অনুসরণ করছে। তাঁর ডান হাতটা ধীরে ধীরে দাঁত তোলার সাঁড়াশির দিকে সরছে। অনর্গল কথা বলে চলেছেন, বড়মামাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে। ধীরে ধীরে সাঁড়াশিটা হাতে তুলে নিলেন। বড়মামাকে মাথার পিছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন হঠাৎ।

উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সাঁড়াশি উঠতে উঠতে বড়মামার ঘাড় পর্যন্ত উঠেছে।

আর পারলুম না। 'বড়মামা, সাবধান!' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম।

আমার চিৎকারে আর দাঁত তুলে দেবার আতঙ্কে বড়মামা একেবারে জেমস বন্ডের মত হয়ে গেলেন। চেয়ার চরকিপাক খেল। কি হচ্ছে বোঝার আগে বড়মামা বাঘের মত লাফিয়ে উঠে সুইংডোর ঠেলে একেবারে রাস্তায়।

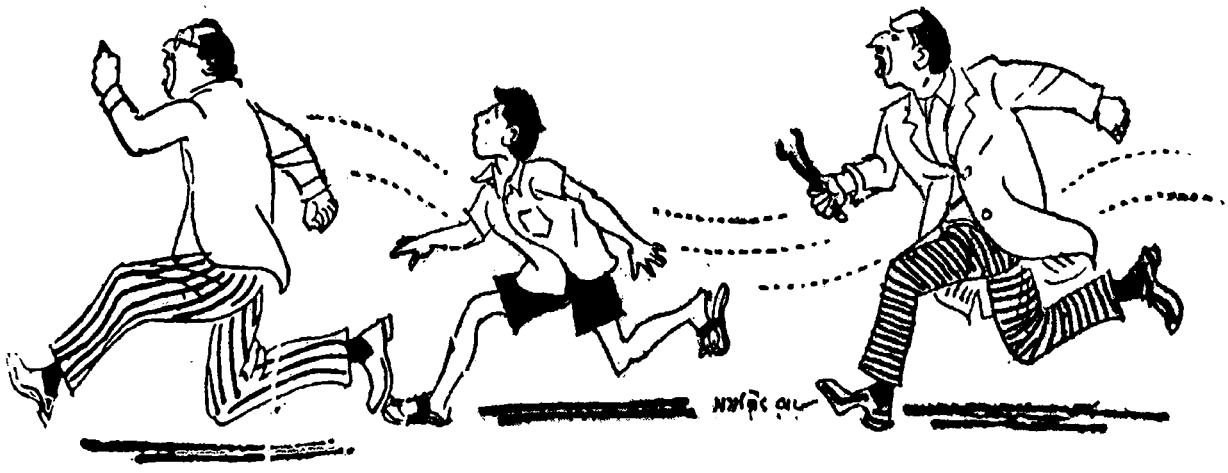

বড়মামা ছুটছেন, দুহাত পেছনে আমি ছুটছি। আমারদের পেছনে পেছনে ধর ধর করে ছুটে আসছেন সাঁড়াশি হাতে ডেনটিস্ট, মেজমামা, কয়েকজন পেশেন্ট। প্রাণভয়ের দৌড়ের সঙ্গে মিলখা সিংও পাল্লা দিতে পারবেন না।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে হাইওয়ে পেরিয়ে আমরা শুকচরে ঢুকে পড়েছি। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ, হেডলাইটের আলো ভেসে এল। বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমার গাড়ি চেপে আমাকেই ধরতে আসছে। কুইক, নেমে পড়ো ওই মাঠের ঝোপে।'

সাপের ভয় নেই, ব্যাঙের ভয় নেই। আমার দুজনে ঝোপের মধ্যে। ওপরের রাস্তা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বড়মামার গাড়ি। বড়মামা ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'তুই আমাকে বাঁচালি। মেজোকে বলিস, ভাগনেই একমাত্র আপনজন।'

'বড়মামা, আপনার দাঁত!'

'দাঁত? দাঁত এখন মুখ ছেড়ে মাথায় উঠে গেছে রে!'

(শারদীয়া ১৩৮৯)

ছবি: সত্যজিৎ রায়

With Best Compliments from :

K. N. Group

খুদে ডাকাত মানে ছোট্ট ডাকাত নয়। ওর নাম ছিল ক্ষুদিরাম। সবাই ওকে 'খুদে' বলে ডাকত। বড়রাও ডাকত, ছোটরাও। ও ছিল কোয়ালী। মানুষের বাড়ি গরু-বাছুরের অসুখ হলে ও সারাত ঝাড়ফুঁকে, মন্তরে, ওষুধে। তারপর গোয়ালিয়া গাইত। তার আগে গোয়াল পরিষ্কার করতে হত। যে গাই-বাছুর সারাল, তাদের পরে ওর ছিল ভারি মমতা। অনেকদিন অব্দি ও খবর নিতে যেত, তারা কেমন আছে।

বৈরাগী স্বভাবের লোক ছিল। পাঁচুড়ে গ্রামের ক্যাওট-পাড়ার লোকজন ওকে একটা চালা তুলে দেয়। গোয়ালিয়া গেয়ে ও যে চাল ডাল ও পয়সা পেত, এনে দিত আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়ি। যাদের বাড়ি তারাই রেঁধে দিত। সেখানে খেয়েদেয়ে ও নিজের ঘরে গিয়ে মাচাঙে শুয়ে পড়ত। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা, তাই ওদের খাট।

ইংরিজি ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে পাঁচুড়েতে নানা বিপদ ঘটে যায়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা খুব মেতে ওঠে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে। গ্রামের মানুষ নানারকম খাজনা দিতে দিতে জেরবার হয়ে পড়ে।

তারপর আশ্বিন মাসে হয় ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীঝড়। পাঁচুড়ে তো দীঘারই কাছে। ফলে সমুদ্রে লোনা জলে গ্রামের ধানখেত নষ্ট হয়ে যায়।

তারপর এল পঞ্চাশের মন্বন্তর। কি দুর্ভিক্ষ যে লাগল! কারা যে সব ধান, সব চাল কিনে নিল! তারপর তার দাম হল হীরেমুক্তোর সমান। ধান-চাল কিনতে পারল না বলে মানুষ না খেয়ে পথে পড়ে পড়ে মরল।

এরই পরে শোনা গেল, পাঁচুড়ের আশপাশ দিয়ে ভীষণ ডাকাতি শুরু হয়েছে। একটা লোক নাকি দু'হাতে দুটো খাঁড়া ধরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, পেছনে মশাল হাতে কারা যেন নাচছে। আর ধানের বস্তা, টাকা কাপড় যা পাচ্ছে তাই নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরা খুব মুশকিল। আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে, কোথাও সে দু'বার যায় না।

ডাকাতি হচ্ছে মহাজন আর জোতদার আর বড় বড় চাষীদের গদীতে আর বাড়িতে।

পুলিশের খাতায় তার নাম উঠে গেল। কুসুমবনিতে থানা। দারোগা মৈজুদ্দীন খুব দুঁদে লোক। তিনি বললেন, 'ডাকাত তো হবেই মানুষ। আকালের পর মানুষ চুরি ডাকাতি ধরে না?'

'শুধু বড় বড় চাষী-মহাজন...'

'গরিব চাষীর বাড়ি যাবে?'

'না, তা নয়!'

'তবে আবার কি। বকরবকর কোর না। যেখানে ডাকাতি হচ্ছে, সেখানে গিয়ে জেনে এস, লোকটা কত লম্বা, কি রকম বয়স, গলার আওয়াজ কি রকম, তাকে কেউ চিনেছে কি না?'

জিগ্যেসবাদের ফলে যা জানা গেল, তা প্রায় ধাঁধার মত।

প্রাণহরি সাহা বলল, 'লোকটা বেজায় লম্বা, কুচকুচে

কালো, বাজখাঁই গলা, ইয়া মোটা।'

রামকান্ত দত্ত বলল, 'কি ফর্সা রং, যেন শিবঠাকুর! কি প্রশান্ত চেহারা! কাঁধ অব্দি জটা, আমায় বললেন, অনেক টাকা করেছিস, অনেক টাকা করবি, এখন চাবি দে! মধুমাখা গলা!'

হারামণি পাড়ুই বলল, 'বেঁটে গুড়গুড়ে, তার এক পা খোঁড়া, ঢাকের মত গলা, লেংচেলেংচে নেচে আমায় বলল, গোলার চাবি? চাবি দিয়েই আমি মূর্ছা গেলাম।'

মৈজুদ্দীন দারোগা বললেন, 'অ! বোঝা গেছে। এখন খবর নাও, আশপাশে কে কে বহুরূপী সাজে। মজিদকে ধর না, ও আমার বাড়ি থাকে। বহুদিন জ্বরে শুয়ে আছে। এই খবরটা আসলেই ডাকাত ধরে ফেলব।'

আশপাশের গ্রামে বহুরূপী কোথায়? বহুরূপী সাজে যারা, তারা হয় অকালে মরেছে, নয় পুলিশের গুঁতো খেয়ে ভেগেছে দেশ ছেড়ে।

মৈজুদ্দীন গোঁপ চুমরে বললেন, 'খোঁজ চালাও। আর গাঁয়ে গাঁয়ে হাটবারে জানিয়ে দাও, ডাকাতের সঠিক খবর আনলেই একশো টাকা।'

পাঁচুড়ে গ্রামেও সে খবর পৌঁছল। ক্যাওটপাড়ায় এখন হালচাল অন্যরকম। খুদে যে কোথায় কোথায় গোয়ালিয়া গাইছে, কে জানে! রোজ না হোক, দু-তিন দিন অন্তর সে চাল-ডাল-তেল-মশলা এনে বাড়ি বাড়ি দিচ্ছে। খুব রাঁধাবাড়ার ধুম, খুব খাওয়াদাওয়া।

দুখে হল রতন ক্যাওটের ছেলে। বয়স বছর চোদ্দ। বাবুদের গরু চরায়। খুদের ভারি ন্যাওটা। খুদেকে ও বলল, 'একশো টাকা তো তুমিই পেতে পার। কত জায়গায় যাচ্ছ, চোখ-কান বুজে না থেকে একটু ঠাওর করে দেখো।'

'বল কি দুখে? একশো টাকা?'

'হ্যাঁ খুদে।'

খুদেও কম নয়। পরদিনই কুসুমবনি গিয়ে বলল, 'একটা লোককে আমার সন্দেহ হচ্ছে। সন্ধে হলেই লোকটা বেরিয়ে পড়ে আর বনের মধ্যে ঢুকে যায়। বনের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িও আছে।'

দেখা গেল লোকটা একজন গোয়ালা। বনের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে ওর বাথান আছে।

দুদিন বাদে খুদে বলতে গেল, 'এই গ্রামের হারাণ মুদী ডাকাত নয় তো? কি বাজখাঁই গলা! ও রাতেভিতে চাদর মুড়ি দিয়ে বেরোয়।'

দারোগা রেগে বললেন, 'তাস খেলতে যায়। তাসের নেশা ওর।'

খুদে বলল, 'তা হলে আমাকে দিয়ে হল না। যে খবরটা আনছি, সেটাই ফক্কা? আপনারা থাকতে ডাকাতের ভয় বা এত বাড়বে কেন?'

'ডাকাত তোমার কি করবে?'

'বা, আমি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি, রাতেভিতে পাঁচুড়ে ফিরি, আমার ভয় নেই?'

'তোমার কাছে থাকে কি?'

'চালটা ডালটা বড়িটা!'

'যাও যাও, বোক না খুদে।'

খুদে গ্রামে ফিরে দুখেকে বলল, 'আমার কপালে একশো টাকা নেই দুখে। যাকে ধরতে বলি, দারোগা আমলই দেয় না।'

এর পরেই খাস কুসুমবনির হাটের দোকান থেকে এক গাঁটরি ধুতি-শাড়ি ডাকাতি হয়ে গেল। মৈজুদ্দীনের সে কী রাগ! তিনি নিজেই টাট্টু, ঘোড়া চেপে তদন্তে বেরোলেন।

এবার খুদে গাঁয়ে এসে দুখে আর দুখের মাকে গেরিমাটি ছোপানো নতুন ধুতি আর কাপড় দিল। বলল, 'আমদা গ্রামের রায়গিন্নি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, বুঝলে পিসি? এত দেব, ত্যাত দেব, তা বললাম, আমাকে কম দিন, দুখানা নতুন কাপড় দিন। দিতে হবে পিসিকে আর পিসির ছেলেকে।'

দুখের মা বলল, 'বেঁচে থাক খুদে।'

দুখে সব শুনল। শুনে বলল, 'খুদে, একবার আমি তোমার সঙ্গে যাব। কত জায়গা দেখ, কত মানুষ! একবারটি দেখে আসব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও না, গোয়ালিয়া গানটা আর ওষুধবিষুধও শেখাব। আমি ত চিরকাল থাকব না, তখন কি হবে বল?'

'শেখাবে? সত্যি?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

'তিন সত্যি কাড়লে কিন্তু!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।'

পরদিনই খুদে দু তিন দিনের মত ডুব মারল। কোথায় গেল, কি করল, কে জানে। খোঁজ নেই, আর খোঁজ নেই সাত

দিন। এদিকে এমন উত্তেজক খবর পাওয়া গেল, যে পাঁচুড়ের লোকের খাওয়া-ঘুম ছুটে গেল।

মঙ্গলদী গ্রামে হাট ছিল। হাট বন্ধ হয়ে যাবার মুখে মৈজুদ্দীন না কি হাটুরে সেজে এক গাঁটরি রামপুরী চাদর নিয়ে হাজির হন। হাট বন্ধ হচ্ছে দেখে গাঁটরি নিয়ে গরুর গাড়িতে শুয়ে থাকেন। রাতে সেই সর্বনেশে ডাকাত এসেছিল, সঙ্গে তার লোকজনও ছিল, দারোগা ডাকাতের পায়ে গুলি করেন। গুলি নিয়েই সে পালিয়েছে। এখন খোঁজ চলছে। পায়ে গুলি নিয়ে তো বেশি দূর পালানো সম্ভব নয়?

এ খবরের উত্তেজনায় সবাই খুদের কথা ভুলে গেল। দুখে বলল, 'গেল কোথায়?'

'কোথায় যাবে? ঠিক আসবে।'

'অ্যাত দিন তো দেরি করে না!'

'আসবে, আসবে।'

দুখে গেল গরু নিয়ে চরাতে। ও একা যায় না, আরো দু চারজন রাখাল যায়। তাদের কাছে গাইগরু রেখে দুখে গেল নদীর পাড়ে আমলকীর খোঁজে। গাছপাকা আমলকী এক কোঁচড় দিলে কবিরাজ মশাই ওকে দুটো পয়সা দেন।

আমলকীর গাছ এখানে অনেক। গাছের ওপারে শিবমন্দির। সেখানে ঠাকুর নেই। মন্দিরটায় দুখেরা এসে বসে।

'দুখে!'

কে ওকে ডাকল? দুখে অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, মন্দির থেকে বেরিয়ে খুদে ওকে ডাকছে। একটা লোকের কাঁধে ভর দিয়ে।

অসম্ভব অবাক হল দুখে। আমলকী ফেলে রেখে ছুটে গেল।

'তুমি? এখানে? পায়ে কি হল?'

'চুপ, চুপ!'

খুদে ওকে টেনে নিল ভেতরে। বলল, 'দারোগার গুলি লেগেছে।'

'তোমার পায়ে....?'

'হ্যাঁ দুখে। আমিই ডাকাতি করতাম।'

'এরা কারা?'

'আমার স্যাঙাৎ।'

'তুমি...।'

'শোনো। আজ ক দিন কিছু খাইনি। আমরা চারজন। চারটি মুড়ি নিয়ে এসো রাতে। আর খানিকটা ছাতু। এখন যাও, নইলে তোমায় খুঁজতে ওরা আসবে নির্ঘাত।'

দুখে ঘাড় নেড়ে চলে এল। চারটি আমলকী কুড়িয়েই ফিরল। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

বাড়ি ফিরে ও প্রথমে ভাবল, মাকে বলবে, কি বলবে না। তারপর আর থাকতে না পেরে মাকে বলেই ফেলল কথাটা।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, মা মোটেই অবাক হল না। বলল, 'এ তো আমি আগেই সন্দেহ করেছি। ইশ্! গুলিতে খুব লেগেছে?'

'সন্দেহ করেছ? কি করে?'

'আমি একা না কি? রতনের মা, বুড়োর জ্যেঠি, মানকের মাসি, আমরা সবাই এ কথা বলা কওয়া করেছি। আমদা গ্রামে রায়গিন্নি কাপড় দিছল? সেখানে রায়বাড়ি বলে কোনো বাড়িই নেই। আমি তখনি জানি।'

'কিছু তো বল নি?'

'নিজেরা জেনেছি, বলাকওয়া করেছি দুহাত তুলে আর্শীবাদ করেছি ওকে। যদ্দিন দেশঘরের অবস্থা মন্দ হয়নি। গোয়ালে গেয়ে যা পেত, এনে এনে আমাদের খাইয়েছে।'

রাত হতে রতনের মা, দুখের মা, বুড়োর জ্যেঠি, মান্‌কের মাসি, সবাই একে একে জমা হল, একসঙ্গে গেল দুখের সঙ্গে।

খুদেও কম যায় না। সেও অবাক হল না। বলল, 'মা লক্ষ্মীরা কত কি এনেছ মা?'

'কেন? তুমি সম্বস্থর খাওয়াতে পার আমরা একদিন খাওয়াতে পারি না?

'ওটা কি? ফোঁস ফোঁস করছে?'

'দুখে বাবুদের গাই-গরু চরায়, বাবুরা এই এঁড়ে মোষটা দিয়েছে ওকে।'

'ওর পিঠে তুমি চাপবে। ওরা হেঁটে যাক। খেয়ার কাছে যেয়ে মোষ ছেড়ে দিও। দুখে সঙ্গে যাচ্ছে। নৌকায় তোমাদের পার করে দিয়ে তবে আসবে। ওপার থেকে যা হয় করে চলে যেও মেচেদা।'

'এটা কি দিচ্ছ?'

'তোমার ঘরেই এই থলিটা ছিল। তোমার ওষুদ-বাকড়ের থলি? ঠ্যাং সারলে আবার গোয়ালে গাইতে গাইতে ফিরবে না? গোয়ালে গাওয়া! ওষুদ দেওয়া! যত সব ভিরকুটি!'

খুদে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'যদি দারোগা না ধরে, তবে ঠিক ফিরে আসব, তোমার ছেলেকে সব শিখিয়ে দেব।'

রতনের জ্যেঠি বলল, 'এই মাদুলিটা চুলে বেঁধে রাখ, কোনো বিপদ হবে না।'

খুদে মোষের পিঠে চাপল। তারপর দুখে আর ওর স্যাঙাৎরা রওনা হল। খেয়াঘাট অনেক দূর।

দুখের মা বলল, 'চল, আমরা ফিরি।'

ছবি: সত্যজিৎ রায়

(শারদীয়া-১৩৮৫)

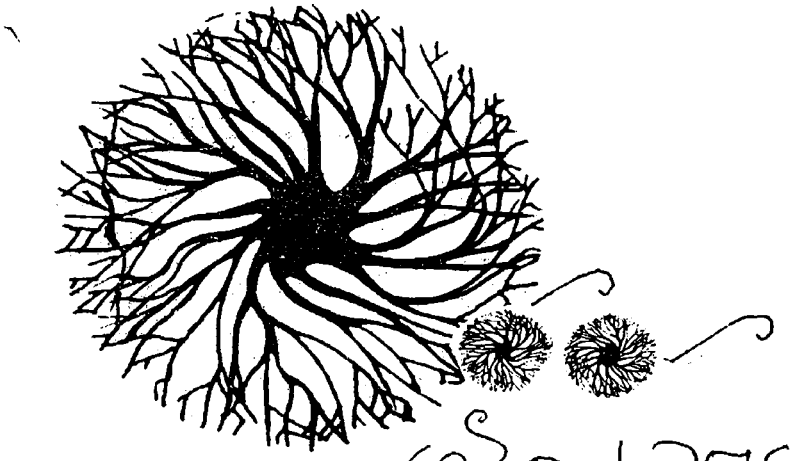

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভীত চন্দ্রমা

বিকেলের দিকে বৈজ্ঞানিক গয়েশ সামন্তর মাথা ধরেছিল। মাথা ধরার আর দোষ কি? সারাদিন তিনি তাপহীন আগুন নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখনো জিনিসটা তাঁর ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসেনি। কিন্তু মনে হচ্ছে হবে, পৃথিবীতে—শুধু পৃথিবীতেই বা কেন—সারা বিশ্বজগতে একটা বিশাল বিপ্লব ঘটে যাবে তাহলে। অবশ্য তাপহীন আগুনে রান্না করা যাবে কিনা তা এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে আলো জ্বলবে। যেমন জোনাকি পোকার আলো, যেমন বেড়ালের বা গরুর চোখের আলো, যেমন কিনা হাতঘড়ির ডায়ালের আলো। বৈজ্ঞানিক গয়েশ সেই সব আলো দেখেই তাপহীন আগুন আবিষ্কারের প্রেরণা পেয়েছেন। আবিষ্কৃত হলে সেই আগুনে অনেক কাণ্ড হবে। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাড়ি পুড়বে না, সেই আগুন হাতে বা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যাবে, তখন আগুন নিয়ে বাচ্চারাও খেলা করতে পারবে।

সাফল্যের খুব কাছাকাছি এসে গয়েশ খুবই উত্তেজিত। দীর্ঘদিন একটানা সাধনা করার পর খুব ক্লান্তও। তাই বিকেলের দিকে মাথা ধরা ছাড়ানোর জন্য তিনি গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এলেন একটু পায়চারী করার জন্য।

কিন্তু পৃথিবীটা বড় নোংরা। চারদিকে ধূলো, আবর্জনা, বদ গন্ধ, গণ্ডগোল, নাক কুঁচকে, চোখ বুজে, কানে আঙুল দিলেন তিনি। তারপর সোজা ছাদের গ্যারেজ ঘরে গিয়ে একটা মাঝারি রকেট বেছে নিয়ে তাতে উঠে বসলেন।

সোঁ করে চলে এলেন চাঁদে। এ জায়গাটায় এখনো তেমন ভীড়ভাট্টা নেই। বাতাসের অভাবে ধূলো-টুলো ওড়ে না, কোনো গন্ধও আসে না নাকে। তবে এখানেও হরেক রকম গবেষণাগার হয়েছে, বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, কৃত্রিম উপায়ে বাতাস, মাধ্যাকর্ষণ ও আবহমন্ডল তৈরির চেষ্টা চলছে। লজ্জার কথা, চাষবাসের জন্যও নাকি তোড়জোড় হচ্ছে। এমনকি বৈজ্ঞানিকরা চাঁদের অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জমাট বরফ গলিয়ে নদী তৈরির চেষ্টাও করছেন। ফলে চাঁদের বিশুদ্ধতাও আর বেশীদিন থাকবে না।

মহাকাশচারীর পোশাকে গয়েশ সামন্ত তাঁর রকেট থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদের নির্জন এক মস্ত পাহাড়ের তলায় পায়চারী করতে লাগলেন। তাপহীন আগুনের চিন্তায় তাঁর মাথা গরম।

পায়চারী করছেন, এমন সময় সামনে টুক করে একটা ঢিল পড়ল। পৃথিবীতে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে। দুষ্টু ছেলের অভাব নেই সেখানে। কিন্তু চাঁদের এই নির্জন পাহাড়তলীতে ঢিল মারে কে! গয়েশ অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে থাকেন। হঠাৎ নজরে পড়ল মাটি থেকে হাত বিশেক ওপরে একটা গামলার মতো বিচ্ছিরি চেহারার শূন্যযান থেকে বৈজ্ঞানিক হারাধন খাঁড়া উঁকি মেরে তাঁকে দেখছে এবং ফিক করে হাসছে। হারাধনকে দু চোখে দেখতে পারেন না গয়েশ।

হারাধন জলগ্রহ নেপচুনে হাইড্রোলেকট্রিক প্ল্যান্ট বানিয়ে সেখান থেকে প্রজেক্টারের সাহায্যে পৃথিবীতে অঢেল বিদ্যুৎ

সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। তার খুব রবরবা।

গয়েশ বিরক্ত হলেও ভদ্রতার খাতিরে হারাধনের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

হারাধন তার গামলাটা নামিয়ে আনল। মহাকাশচারীর বর্মের মতো পোশাক পরা অবস্থাতেও হারাধন তার ঘাড় চুলকোবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে গামলা থেকে মাটিতে নেমে এসে স্পিকিং টিউবের ভিতর দিয়ে বলল—কখন থেকে পোশাকের মধ্যে একটা ছারপোকা ঢুকে রয়েছে, জ্বালিয়ে খেলে।

গয়েশ তাঁর কথা বলার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বললেন—স্পেসসুটে আজকাল বড্ড ছারপোকা হচ্ছে। আমাকেও প্রায়ই কামড়ায়। একজন মার্কিন সায়েন্টিস্ট সেদিন দুঃখ করে বলছিলেন তাঁর একটা শখের স্পেশসুট নাকি উই পোকায় খেয়ে ফুটো করেছে, আর একটায় কাঁকড়া বিছে বাসা বেঁধেছে, বোঝো কাণ্ড!

হারাধন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—শুধু তাই নয়, পোকাগুলোকে কিছুতেই মারাও যাচ্ছে না। সবচেয়ে কড়া পোকা মারার ওষুধ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। ভারী মুস্কিল।

পোকামাকড়ের কথা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে আলোচনা করলেন দুজনে। তারপর হারাধন বলল—আজ বড় খাটুনি গেল গয়েশদা। নেপচুনে যন্ত্রপাতির কিছু গন্ডগোল ছিল। সেই রাত বারোটা থেকে সারাদিন, এখনো হাতমুখ ধোয়ার সময় পাইনি।

গয়েশ আঁতকে উঠে বললেন—হাতমুখ কি চাঁদের জল দিয়ে ধোবে নাকি? সর্বনাশ, এখানকার জল কিন্তু ভীষণ ভারী, বিচ্ছিরি সব মিনারেল রয়েছে এই জলে।

হারাধন হেসে বলে—আরে না, আমি প্লুটো থেকে হাতমুখ ধোয়ার বা স্নান করার জল আনি।

গয়েশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন—খাও কোন জল?

—নেপচুন, ও ছাড়া অন্য জল সহ্যই হয় না। আমাশা হয়ে যায়।

গয়েশ ম্লান মুখে বলেন—আমারও। নেপচুনের জলে শুনেছি অনেক ট্রেস এলিমেন্ট আছে। আমার জন্য খানিকটা পাঠিয়ে দিও তো। পেটটা কয়েকদিন ধরেই বড় ভুটভাট করছে।

হারাধন ম্লান মুখে বলে, ভুটভাটের কথা আর বোলো না দাদা। আমিও ঐ ভুটভাটের রুগী।

তাঁরা কিছুক্ষণ পেটের গোলমাল আর জলবায়ু নিয়ে কথা বললেন।

হারাধন হঠাৎ বললেন—আরে ভাল কথা; ইনজিনিয়ারদের সব মাইনে বাড়ল শুনেছো নাকি!

বিরস মুখে গয়েশ বলেন—শুনছি তো তাই।

—তো আমাদের সায়েন্টিস্টদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা হল না তাহলে এবারও?

—কৈ আর হল!

—এ ভারী অন্যায় গয়েশদা। তোমাকে এই বলে রাখছি, সরকার যদি সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে সৎমার মতো ব্যবহার করে তবে কিন্তু তারা ধর্মঘট করতে বাধ্য হবে। এবার স্পেস সায়েন্সের জন্য নোবেল প্রাইজ কাকে দিয়েছে জানো।

—না, গয়েশ খুব সতর্ক গলায় বলেন। আসলে তিনি শুনেছেন, ডিসেম্বর মাসের আগে যদি তিনি তাপহীন আগুন আবিষ্কার করতে পারেন তবে নোবেল প্রাইজ তাঁকেই দেওয়া হবে। মহাকাশযানে ব্যবহারের জন্য তাপহীন আগুনের বড়ই দরকার।

এবার তাঁরা কিছুক্ষণ বেতন বৃদ্ধি এবং প্রাইজ নিয়ে কথাবার্তা চালালেন। তারপর হারাধন তাঁর গামলার মতো শূন্যযানে চড়ে চলে গেলেন হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম নিতে।

চাঁদ থেকে আকাশের রং ঘোর কালো দেখায়। গয়েশ অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। নিকশ কালো আকাশে প্রচণ্ড তেজে সূর্য জ্বলছে। আগুনকে তাপহীন করার পদ্ধতি যদি তিনি আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে একদিন সূর্যের তাপকেও নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হবে না। ভ্রু কুঁচকে এইসব ভাবতে ভাবতে আর অবিরল পায়চারী করতে করতে তাঁর একটু ক্ষিদে পেল।

গয়েশের রকেটটা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রকেটের গায়ে চৌম্বক খিল দিয়ে একটা চমৎকার হালকা কাচতন্তুর শূণ্যযান লাগানো। দেখতে অনেকটা পিরিচের মতো। গয়েশ পিরিচটা খুলে উঠে বললেন। চোখের পলকে চাঁদের গবেষণাগারের কাছে লোকবসতির মধ্যে এসে নামলেন। ঢুকলেন মাটির তলার ক্যান্টিনে।

এখানে কৃত্রিম আবহমণ্ডল থাকায় স্পেস সুট খুলে ফেললেন গয়েশ। জল ছুঁলেন না, একটা রশ্মিযন্ত্রের কাছে গিয়ে সুইচ টিপে নানারকম রশ্মি দিয়ে হাত মুখ বীজানুমুক্ত

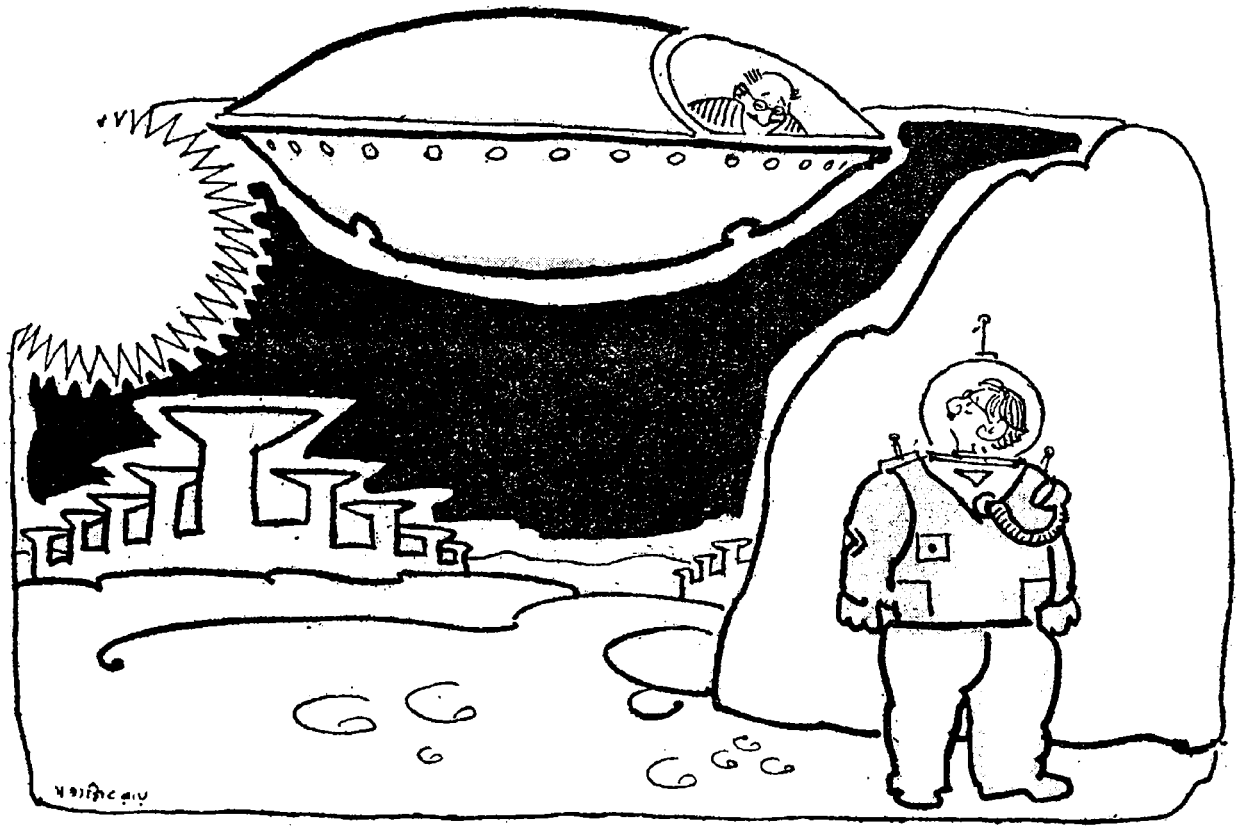

করলেন। তারপর মস্ত হলঘরে গিয়ে বসলেন। হলঘর একেবারে ফাঁকা। তবে প্রায় সিকি মাইল লম্বা হলের একেবারে শেষ প্রান্তে বুড়ো বৈজ্ঞানিক সাধন হাজরা বসে আপনমনে বিড় বিড় করছেন। ব্যর্থ ও উন্মাদ বৈজ্ঞানিকদের যে তালিকাটি গতবছর বেরিয়েছে তাতে সাধনের নাম সবার উপরে। লোকটা খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু আবিষ্কার করার জন্য খুব গোপনে গবেষণা চালাচ্ছিল। আর সেই গবেষণা করতে করতেই কেমন যেন পাগলাটে আর একাচোরা স্বভাবের হয়ে গেল। পৃথিবীতে নিজের বানিতে আর যায় না। চাঁদের ক্যান্টিনেই সারাদিন বসে বসে সময় কাটিয়ে দেয়। তাকে কেউ ঘাঁটায় না।

গয়েশ বসতেই বেশ স্মার্ট চেহারার একটা রোবট বেয়ারা এসে টেবিলটা একটা ভ্যাকুয়াম যন্ত্রে পরিষ্কার করে দিয়ে বলল—কী খাবেন?

গয়েশ বিস্বাদ মুখে ভাবতে লাগলেন। খিদে পেলেও তাঁর মুখে রুচি নেই। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না, আবার সব কিছু পেটে সহ্যও হয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—মুড়ি আর ছাগলের দুধ।

রোবট চলে গেল। একা মস্ত হলঘরটায় বসে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন গয়েশ। বড্ড ফাঁকা আর একা লাগছে। ওদিকে বহু দূরে বুড়ো বৈজ্ঞানিক সাধন হাজরা আপনমনে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছে। এক একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখছেন গয়েশ।

হঠাৎ একবার চোখে চোখ পড়তেই সাধন হাজরা হাতছানি দিয়ে ডাকল গয়েশকে। একটু দোনোমোনো করে গয়েশ উঠলেন। ভাবলেন পাগল হোক ক্ষ্যাপা হোক একজন সঙ্গী তো বটে।

কাছে গিয়ে বলতেই সাধন গয়েশের কানে কানে বলল—কাল অবশেষে জিনিসটা আবিষ্কার করেছি।

গয়েশ বললেন—কী?

—একটা চশমা। এটার নাম হল ভৌত চশমা। বলে সাধন পকেট থেকে একটা চশমার খাপ বের করে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখে। গয়েশ দেখলেন, চশমাটায় নানারকম ক্ষুদে যন্ত্রপাতি লাগানো। কাচটা গাঢ় কালো। সাধন ফিস ফিস করে বলল, দেখবে?

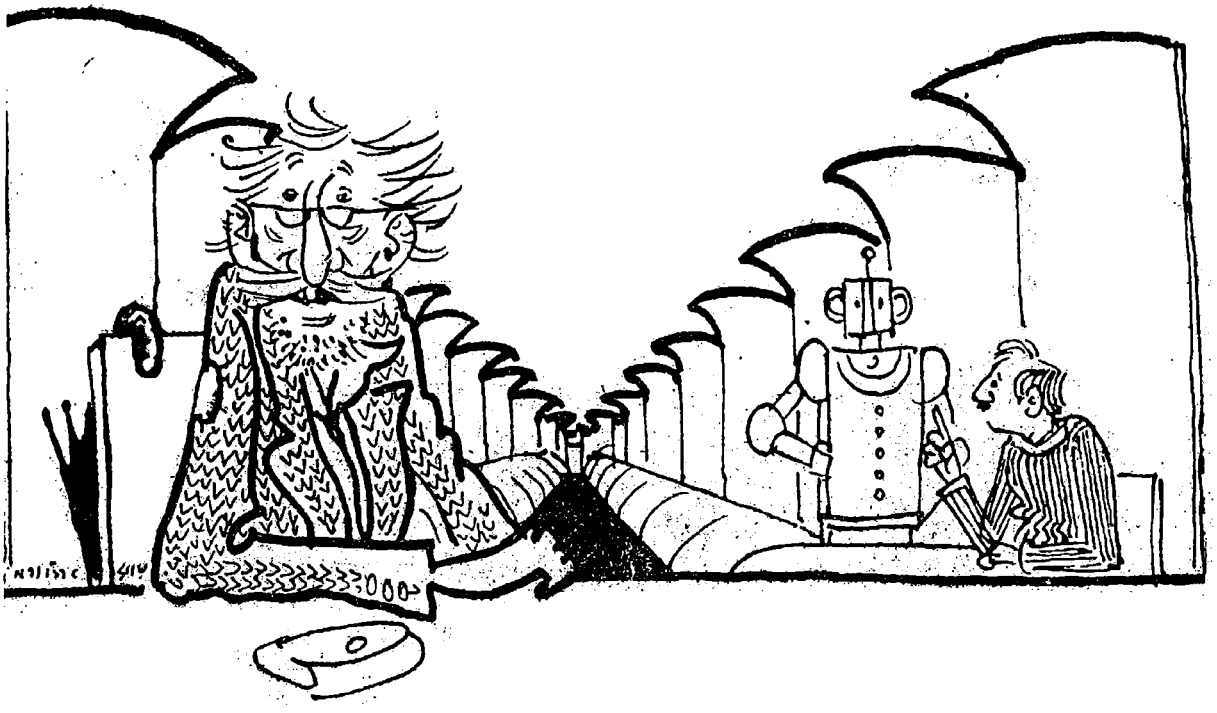

গয়েশ অবাক হয়ে বলেন—কি?

সাধন বলে—বহুদিন ধরেই টের পাচ্ছি যে তেনারা, আছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যত সব বৈজ্ঞানিকদের পাল্লায় পড়ে কিছুতেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইত না। তখনই ঠিক করেছিলুম, যেমন করে হোক একটা এমন যন্তর বের করতে হবে যা দিয়ে তেনাদের চাক্ষুস দেখা যায়। তখন তো আর অবিশ্বাস করতে পারবে না! এতদিনে বের করেছি। দেখবে!

গয়েশ ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার আগেই হঠাৎ সাধন চশমাটা তুলে খপ করে পরিয়ে দেয় গয়েশকে। চশমাটাও এমন ব্যাদড়া যে চোখে বসে যেন আঠা হয়ে লেগে গেল।

প্রথমটায় গয়েশ কিছুই দেখতে পেলেন না অন্ধকার ছাড়া। তারপর দেখেন তাঁর চারধারে হলঘরটা যেন একটা কালচে আলোয় ভরে উঠল। কিংবা ঠিক আলোও নয়, অনেকটা এক্স-রে-র মতো যেন দেখা যাচ্ছে সব কিছু। দেখতে দেখতে হঠাৎ ভীষণ আঁৎকে ওঠেন গয়েশ। এ কী? ফাঁকা হলঘরটা যে লোকে ভর্তি! শুধু ভর্তি নয়, একেবারে গিজগিজ করছে ঠাসাঠাসি সব মানুষ! শুধু মেঝেতে নয়, শূণ্যে একেবারে সিলিং পর্যন্ত একের ঘাড়ে আর একজন চেপে বসে আছে। তারা ভাসছে ঘুরছে, হাঁটছে. হাসছে, হাঁচছে, কথা কইছে, দেয়াল ফুঁড়ে খুশিমতো বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢুকছে!

গয়েশ চেঁচিয়ে উঠলেন—একী? এরা কারা?

কানের কাছে সাধন ফিস ফিস করে বলল— তেনারা। এখন বিশ্বাস হলো তো! বড় যে ভূতে বিশ্বাস করতে না?

—ভূ—? বলে কোনোক্রমে অজ্ঞান হতে হতে নিজেকে সামলে নিলেন গয়েশ। চশমাটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে ছুটলেন হলঘরের দরজার দিকে। কোনোক্রমে স্পেস সুটটা পরে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাইরে। পিরিচে উঠে বিদ্যুৎবেগে চালিয়ে দিলেন সেটা রকেটের দিকে। আর সারাক্ষণ বড় বড় চোখ চেয়ে বিহ্বল গলায় বলতে লাগলেন—ভূ...ভূ...ভূ...ভূ...

(শারদীয়া-১৩৮৫)

ছবি: সত্যজিৎ রায়

নাম রহস্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার জ্ঞাতি ভাই গজানন গাঙ্গুলী ফোঁৎ করে নাক দিয়ে আওয়াজ করলেন একটা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাগলের কী কী নাম হতে পারে হে প্যালারাম?'

এমন একটা বেয়াড়া প্রশ্নে আমি ঘাবড়ে গেলুম। ছাগলের কী নাম হতে পারে এ নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন কোনোদিন আসেনি।

আমি ঘাড়টাড় চুলকে বললুম, 'ছাগলের নাম কী আর হবে! যারা বাঁদর নাচায়, তাদের সঙ্গে তো প্রায়ই একটা ছাগল থাকে দেখি। তারা তাকে গঙ্গারাম বলে ডাকে। আমার ধারণা সব ছাগলেরই নাম গঙ্গারাম।'

বিকট মুখ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার মুণ্ডু! নিজের নাম প্যালারাম, তাই ছাগলের নাম গঙ্গারাম ছাড়া আর কীই বা ভাববে তুমি? অথচ তুমি না পরীক্ষায় বাংলায় লেটার পেয়েছিলে?'

বাংলায় লেটার পাওয়াটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার, স্বীকার করতে হল সেকথা। ছাগলের নাম কী কী হতে পারে এ যার জানা নেই, তার লেটার পাওয়ার এক্তিয়ার নেই কোনো।

আমার খুব অপমান বোধ হল। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ছাগলের কী আবার নাম হবে? রুম্‌কি, টুম্‌কি, মেনি'—

যেই মেনি বলেছি, গজাননদা অমনি ফ্যাঁচ করে উঠলেন।

'মেনি? তোমার মাথা। মেনি তো একচোটে বেড়ালের নাম, ছাগলের হবে কী করে? বোর্ডের উচিত, তোমার লেটারটা কেটে দেওয়া।'

এবার আমি চটে গিয়ে বললুম, 'তাহলে আপনিই বলুন না, ছাগলের কী কী নাম হয়।'

'আমিই যদি জানব, তাহলে তোমায় জিজ্ঞেস করব কেন হে? ভেবেছিলুম তোমার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছ, তুমি একটা বাত্‌লে দিতে পারবে। এখন দেখছি তোমার মাথায় স্রেফ ড্রায়েড্ কাউ ডাং—অর্থাৎ কি না ঘুঁটে।'

বৌদি বাড়ির ভেতরে তালের বড়া ভাজছেন, বাতাসে তার প্রাণকাড়া গন্ধ আসছে। বৌদি আবার বলে গেছেন, দুটো তালের বড়া খেয়ে যেয়ো প্যালারাম, তালক্ষীরও করে রেখেছি।' এসব জটিল ব্যাপার না থাকলে অনেক আগেই উঠে পড়তুম আমি—ছাগলের নাম নিয়ে এ অপমান কে সহ্য করত এতক্ষণ।

আমি বললুম, 'আপনিই বা এত নিয়ে এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ছাগলের নাম যা খুশি হোক না, আপনার তাতে কী! আপনি তো আর ছাগল পোষেন না।'

গজাননদা থেমে থেমে একটা আধপোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে চটপট বাঁ-কানটা চুলকে নিলেন। তারপর মুখ বাঁকা করে বললেন, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আরে—টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি রুপিজ।'

'অ্যাঁ!'

'অ্যাঁ আবার কী! আড়াই শো টাকা। ক্যাশ।'

'কার টাকা? কিসের টাকা?' আমি কাকের মতো হাঁ করে চেয়ে রইলুম গজাননদার দিকে।

'অমন জগদ্দল একটা হাঁ করেছ কী বলে?' গজাননদা এবার ডানদিকের কানটা চুলকোতে লাগলেন ঃ 'টাকা আমার ব্রহ্মময়ী মাসিমার। তাঁরই ক্যাশ।'

তালের বড়ার সঙ্গে বেশ উৎসাহ বোধ করতে করতে আমি ঘন হয়ে বসলুম।

'কিছু বুঝতে পারছি না, খুলে বলুন।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গজাননদা সবটা বিশদ করলেন।

মেসোমশাই অনেক টাকা রেখে অনেক দিন আগে স্বর্গে: গেছেন। ব্রহ্মময়ী মাসিমা সেই টাকা দিয়ে এতদিন তীর্থ-টির্থ করছিলেন। মেসোমশাই নামকরা ব্রহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, অনেক শিষ্যও তাঁর ছিল। সেই শিষ্যদের একজন হালে মাসিমাকে একটা ছাগলছানা দিয়েগেছেন প্রণামী হিসেবে।

এখন মাসিমার তো ছেলেপুলে নেই—এই

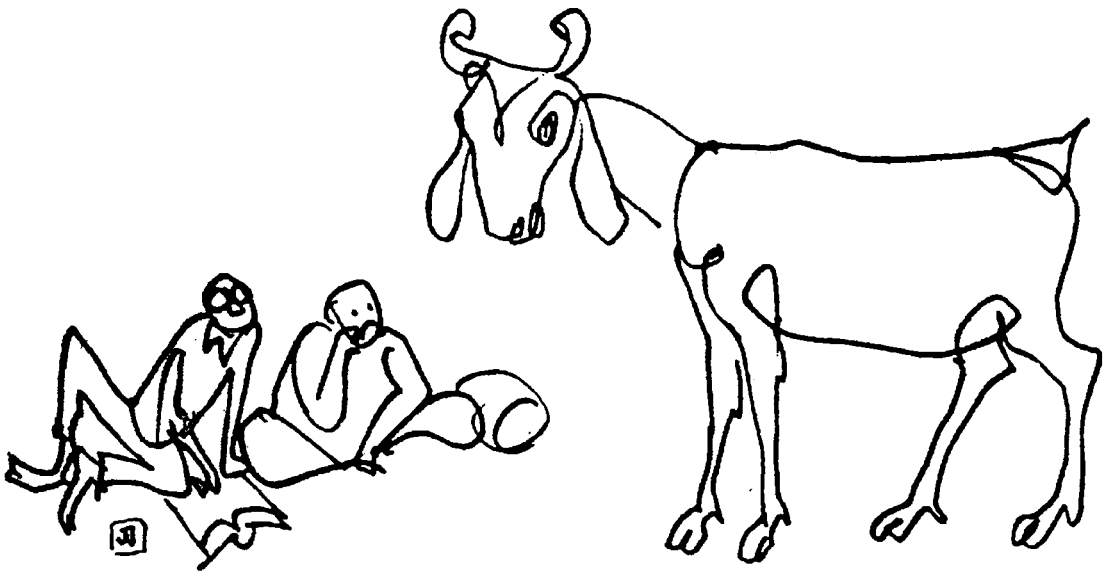

ছাগলছানাটাকে ভীষণ ভালবেসেছেন তিনি। এর জন্যে স্পেশাল ছোলা-কলা বরাদ্দ, মায় ছোট্ট একটা খাট—তাতে নেটের মশারি পর্যন্ত। কিন্তু মুশকিল হল, এমন আদরের ছাগলের জন্যে কোনো নামই তিনি ঠিক করতে পারছেন না। এর এমন একটা নাম চাই যা শুনলে কান জুড়িয়ে যাবে, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। তাই ব্রহ্মময়ী মাসিমা ডিক্লেয়ার করেছেন, তাঁর ছাগলের জন্যে নাম যে ঠিক করে দেবে—তাকে তিনি আড়াইশো টাকা প্রাইজ দেবেন। ক্যাশ!'

ছাগলের এই আপ্যায়ন শুনে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। মনে মনে ভাবলুম, শ্রীমান প্যালারাম না হয়ে ব্রহ্মময়ীর ছাগল হতে পারলে জন্মটা সার্থক হত।

গজাননদা বললেন, 'বুঝলে, সেই জন্যেই—'

বললুম, 'ওপন কম্পিটিসন গজাননদা?'

'উঁহু!'—ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে গজাননদা বললেন, 'তুমি যদি প্রাইজটা মেরে দেবার তালে থাকো, তাহলে সেগুড়ে বালি। কম্পিটিসন মাসিমার বোনপোদের মধ্যে স্ট্রিক্‌ট্‌লি রেস্ট্রিক্‌টেড্। আর তাও কি কম নাকি?'

ব্রহ্মময়ী মাসিকে ছেড়ে দিয়ে আমার নাম আর বাকী পাঁচজনের ছেলেমেয়ে নীট্ বত্রিশজন! জানো তো আমার দুবোনের বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের বলেছিলুম তোরা পার্টিসিপেট করিসনি—তা হলে দু-জন কম্পিটিটর কম হয়, তারা বললে, আড়াইশো টাকা যদি ফাঁকতালে পেয়ে যাই, ছাড়ব কেন? কি রকম মীননেস দেখেছ?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়।'

'তাহলে প্যালারাম—' কাতর হয়ে গজানন দা বললেন, দাওনা একটা নাম-টাম বলে। বাংলায় যখন লেটার পেয়েছ, তোমার অসাধ্য কী আছে? আর যদি পাই; বুঝেছ প্যালারাম—পঁচিশ টাকা কমিশন দেব তোমাকে।'

একথা শুনে আমার মনটা নরম হল একটু। পঁচিশ টাকা বা মন্দ কী! পাঁচ টাকাই বা কে দিচ্ছে আমাকে!

'শুধু একটাই নাম পাঠাতে হবে?'

'না—সেরকম বাঁধাবাঁধি নেই কিছু।'

'তাহলে এক কাজ করা যাক। অনেকগুলো নাম পাঠিয়ে দিই। একটা লেগে যাবে নির্ঘাৎ।'

'সে কথা ভালো। আমি কাগজ পেনসিল নিয়ে আসি বরং।'

গজাননদা কাগজ-পেনসিল আনলে আমি বললুম, 'তা বলে প্রথম অ দিয়ে শুরু করা যাক।'

'অ?' গজাননদা আঁতকে উঠলেন ঃ তোমার মতলব কি হে? গোটা স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ কপচাতে চাও নাকি?'

'আমি বললুম, 'ডিসটার্ব করবেন না। আমার মুড আসছে লিখে যান। প্রথম লিখুন অঞ্জনা।'

'অঞ্জনা? অঞ্জনা মানে কী?'

'অঞ্জনা মানে কাজল। অঞ্জনা মানে কাজলের মতো যার রং, অর্থাৎ কিনা —কালো।'

'ধুৎ!—গজাননদা আপত্তি করলেন: 'ছাগলটা মোটেই কালো নয়। লাল-সাদা-কালো-হলদে এসব মিশিয়ে বেশ চিত্তির-বিচিত্তির চেহারা।'

'অ—চিত্তির-বিচিত্তির। তাহলে তা হলে—অপরূপা।'

'এটা বেশ হয়েছে—' খুসি হয়ে গজাননদা বললেন, 'লেগে যেতে পারে। দিই পাঠিয়ে।'

'ব্যস্ত হবেন না—চান্স নিয়ে লাভ কী? আরো লাগান গোটা কতক। এবারে আ। আ-আ—লিখুন আজীবনী।'

'আজীবনী! সে আবার কী?'

'মানে সারা জীবন বেঁচে থাকবে, এই আর কী! নামের ভিতর দিয়ে আশীর্বদা করা হল চাগলকে!'

গজাননদা বলেন, 'সারাজীবন তো সবাই-ই বেঁচে থাকে, যখন যারা যায় তখন একবারেই মারা যায়। এ নামের কোনো মানে হয় না!'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আপনি তো বি-কম ফেল, সাহিত্যের কী বোঝেন? যা বলছি লিখে যান। লিখুন আজীবনী।'

আজীবনী লেখা হল।

'এবারেই। ই-ই-ই—আচ্ছা, ইন্দ্রলুপ্তা হলে কেমন হয়?'

'ইন্দ্রলুপ্তা?' —গজানন খাবি খেলেন: 'সে কাকে বলে? ওতো—ইন্দ্রলুপ্ত মানে টাক!'

'এ তুমি কী বলছ হে প্যালারাম! ছাগলের নাম টাক হলে মাসিমা আমায় প্রাইজ দেবেন?'

'তাহলে ওটা থাক। আচ্ছা, ইন্দীবরী?'

'ইন্দীবরী?' গজাননদা ভুরু কোঁচকালেন।

'ইন্দীবরী মানে নীলপদ্ম।'

'নীলপদ্ম? বাঃ—বেড়ে।' গজাননদা বেশ ভাবুকের মতো হয়ে গেলেন: 'আহা নীলপদ্ম। চোখ জুড়োয়, প্রাণ জুড়োয়। ছাগলটার রং তো নীল নয়?'

'তাতে কী হয়েছে? আমাদের নীলিমাদির রঙও তো নীল নয়, ফুটফুটে ফর্সা। পাড়ার কাঞ্চনাবুর রং মোটেই সোনার মত নয়। স্রেফ কুচকুচে কালো। জানেন তো কবি বলেছেন—নামে কি বা করে—'

গজাননদা ফিল-আপ করলেন ঃ 'ছাগল যে নামে ডাকো—ডাকে ব্যা-ব্যা করে। ঠিক ইন্দিবরীও থাক।'

বললুম, 'এবার উ। লিখুন—উপ্-উপ্-উপ্—'

'হনুমানের মতো উপ্-উপ্ করছ কেন?'

'উপেন্দ্রবজ্রা।' —এই জাঁদরেল নাম শুনে গজাননদা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেনঃ ভীষণ কড়া নাম হে—উচ্চারণ করতেই হৃদকম্প হয়! কাকে বলে?'

কাকে বলে সেকি আমিই জানি! কোথায় যেন দেখেছিলুম কিছু মনে আসছে না। আর উর্ধ্বময়ী নাম দিলে—'

গজাননদা বললেন, 'মাসিমা ভাববেন—তাঁর ছাগলের উর্ধ্বলোক, মানে মৃত্যু কামনা করা হচ্ছে। তাহলেই প্রাইজের আশা ফিনিশ! ওসব চলবে না। তাছাড়া প্যালারাম, তুমি যেভাবে অ-অ-ই-ঈ চালাচ্ছ—' 'ঈ বাদ দিয়েছি তো। ওতে ঈশ্বরী ছাড়া আর কিছু হয় না।'

'না, না, ঈশ্বরী নয়। ঈশ্বরী ছাগল মানে স্বর্গীয় ছাগল, উর্ধ্বময়ীও তাই। ডেনজারাস্। আমি বলি কি প্যালারাম—এই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের প্যাঁচ ছাড়ো, নইলে গোটা দিনেও শেষ হবে না যে—'

গজাননদা কাতর হয়ে বললেন, 'ওদিকে তালের বড়াগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

তালের বড়ার নামে আমাকেও প্ল্যান বদলাতে হল!

'তাহলে শর্টকাট করা যাক। লিখুন—ক-এ কুসুমিকা, খ-এ, আচ্ছা খ থাক—গ-এ গরবিনী, ঘ-এ ঘোরাননা? না—ঘোরাননা বাজে, মাসিমা ভাববেন তাঁর ছাগলের মুখ ঘোড়ার মতো বলা হচ্ছে—চ-এ চিত্রলেখা।'

'না, না। চিত্রলেখা তোমার বৌদির নাম!'গজাননদা আর্তনাদ করলেন ঃ 'ছাগলের ও নাম দিলে তোমার বৌদি রক্ষে রাখবে না, তালের বড়া আর তালক্ষীর একেবারে গেল।'

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন। তাহলে চা-এ চারুপ্রভা, ছ-এ—ছ-এ ছাগলিকা, জ-এ জয়ধ্বজা, ঝ-এ ঝঞ্ঝিকা—'

'ঝঞ্ঝিকা! ঝড়-টড় নাকি? না,না, ওসবের মধ্যে যেয়ো না।' গজাননদা ছটফট করতে লাগলেন ঃ 'প্লীজ প্যালারাম, শর্টকাট কর, তালের বড়াগুলো—'

'ঠিক—তালের বড়াগুলো।' —আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলুম ঃ তাহলে আর বর্ণমালা নয়—অ্যাট র‍্যানডম—

মানে যা মনে আসে। লিখে যান—বিচিত্রিতা, নবরূপা, মনোহরা—'

'মনোহরা কি একটা খাবার নয়? মাসিমা ভাববেন কে তাঁর ছাগলকে কেটে খাওয়ার—'

'তাহলে মনোরমা। লিখুন পল্লবিকা—পাতা-টাতা খায়—ফুল্লনলিনী—দেবভোগ্যা—'

গজাননদা আবার বাধা দিলেন ঃ দেবভোগ্যা ! সে তো ঘিয়ের বিজ্ঞাপন হে। তুমি কি ঘি দিয়ে ছাগল রান্নাটান্নার পরামর্শ দিচ্ছ?'

'থাক—থাক। লিখুন দেবকন্যা, টঙ্কারিণী, ডামরী—'

'বেজায় শক্ত ঠেকছে।'

'হোক শক্ত। ব্রহ্মময়ী নামটাই বা কি এমন নরম? অমন নাম যাঁর, কড়া নামেই হয়তো তিনি খুশি হবেন। লিখেযান শূরসুন্দরী, সুখময়ী—'

লিস্টি যখন শেষ হল, তখন পুরো আটাশটা নাম।

আমি বললুম, 'আরও দুটো মনে পড়ছে। য-র-ল-ব-হ-ক্ষ—লিখুন হংসপদিকা, ক্ষুরেশ্বরী—'

'ক্ষুরেশ্বরী?'

'ক্ষুরের ঈশ্বরী যে। অর্থাৎ কি না মাসিমার ছাগলের মতো ক্ষুর আর কোনও ছাগলেরই নেই।'

'রাইট। ক্ষুরেশ্বরী চলতে পারে। কিন্তু প্যালারাম, লিস্ট একটু বড় হল না?'

'তা হোক। লটারীতে বেশি টিকিট কিনলে প্রাইজের আশা বেশি— বুঝতে পারেন তো? দিন দিন পাঠিয়ে—একটা লেগে যাবে নির্ঘাৎ।'

'ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে।'

'ফুল-চন্দনের আগে তো তালের বড়া পড়া দরকার। আর পঁচিশ টাকা কমিশন।'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়। সে আর বলতে। তবে পঁচিশ টাকা একটু বেশি হল না প্যালারাম! যদি কুড়ি টাকা দিই?'

'আমি চটে বললুম, 'বলো কি? লিস্ট ফেরত দিন আমার।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, পঁচিশ টাকাই থাক। চলো—তালের বড়া খেয়ে আসা যাক।'

বিস্তর খাটুনি হয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে তালের বড়া খেতে গেলুম।

খেতে খেতে এবার মিটমিট করে হাসতে লাগলেন গজাননদা।

'কী হল হাসছেন যে?'

'জানো, ভুতো এসেছিল কাল।'

'ভুতোদা?'

'হাঁ, আমার এক মাসতুতো ভাই। এক নম্বর গবেট। আমার কাছ থেকে আবার নামের সাজেসন চায়!' —গজাননদা বললেন, 'তা দিয়েছি বলে।'

'কী বলে দিলেন?'

'আন্দাজ করো দিকি?'—চোখ মিটমিট করতে লাগল তাঁর।

'বলতে পারলুম না।'

'গঙ্গারাম। ও যেমন হাবা গঙ্গারাম—তাতে ও নাম ছাড়া ওকে কী দেব?' শুনে ধন্যি হয়ে চলে গেল। হা—হা—হা—'

শুনে আমি হাসলুম—হা-হা-হা!

প্রাইজের রেজাল্ট বেরুবে পরের রবিবার। পঁচিশ টাকার আশায় খবর জানতে গেলুম।

দেখি গজাননদা আরশোলার মতো মুখ করে বসে।

'পাননি প্রাইজ?'

'নাঃ!' হাঁড়ি ফাটাবার মতো আওয়াজ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার ইন্দীরবী—আজীবনী—অপরূপা—ফুল্লনলিনী—হংসপদিকা—সব চিৎ। প্রাইজ কে পেয়েছে জানো? ভুতো।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, সেই গঙ্গারাম! একত্রিশ জন বোনপো-বোনঝি বাংলা ডিক্শনারী উজাড় করে দিয়েছিল। মাসিমা বললেন—ছাগলের নামে ওসব কাব্যি দিয়ে কী হবে! গঙ্গারাম! আহা—মা গঙ্গা, তায় রাম নাম। নাম করতেই পূণ্যি! বলে ছাগলটার পায়ে ঢুপ করে একটা পেন্নাম করে প্রাইজটা ভুতোকেই দিয়ে দিলেন।'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। আজও বাড়ির ভেতর থেকে ভাদ্র মাসের তালের বড়ার গন্ধ আসছিল, কিন্তু বৌদি যে সে বড়া আমায় খেতে দেবেন, সে ভরসা আর হল না আমার।

(শারদীয়া-১৩৭৬)

ছবি: সত্যজিৎ রায়

মেহেবুব টেলার্স ক্যালকাটা নাইন

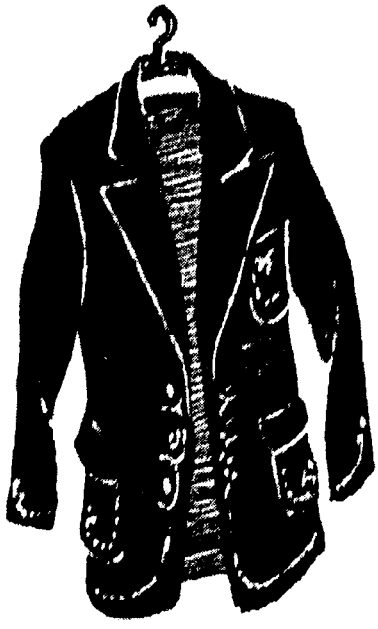

নবনীতা দেবসেন

রঞ্জন এসে বলল—'বাব্বাঃ, যা বিশ্রী কেলেংকারি হতে চলেছিল আজ। উঃ! আরটু হলেই থানায় নিয়ে যেত!'

'কী রে, কী হয়েছে?'

'বসন মামার কাণ্ড! সেই যে গত সপ্তাহে যে কোটের কথা বলেছিলাম না, তারই জের মিটল আজ।'

গত সপ্তাহে রঞ্জন বলেছিল বটে একটা কোটের ঘটনা। তারপর থেকেই খুঁজছিল ক্যালকাটা নাইনটা কোথায়।

'পেলি না কি ক্যালকাটা নাইন?'

'পেলাম না? ওঃ, সে কী পাওয়া! মেহেবুব টেলার্সও পেয়েছি।'

আমি বরং রঞ্জনের গল্পটা গোড়া থেকেই বলি। ঠিক ও যেমন করে বলেছে, তেমনি।

'বসন্তমামার গায়ে সেদিন দেখি এক কালো কোট। গার্ডের ইউনিফর্মে রোজ যেমন কোট পরেন প্রায় তেমনিই, কেবল এটার বোতামঘরায়, পকেটে, আর হাতার মুখে জরির কাজ করা। অনেকটা রাজা-রাজড়ার মতো, বা ব্যাণ্ডপার্টির লোকেদের মতো। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

'রঞ্জু—মঞ্জু—মণ্টু! কই সব? দেইখ্যা যা, কো-ট! সদা-পচা-মেন্তী! আয় এই দিকে, কো-ট?'

সদা-পচারা পাশের বাড়ির। ওরা ছিল না, রঞ্জু-মঞ্জু-সণ্টু দৌড়ে এলাম তিনজনে।

'কই কোট? কোট কই?'

বসনমামা ফ্যাশন মডেলের মত কোমরে দুই হাত রেখে ঘুরে নিলেন গোড়ালিতে ভর দিয়ে। ঘূর্ণি থামিয়েই ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—

'দ্যাখছস? দারুণ না? পাক্কা ইংলিশ কোট। গোরা সাহেবের কোট বইল্যা কথা!'

তারপর কোটের তলার দিকটা আঙ্গুলে তুলে বললেন—'কাপড়খান দ্যাখ্ একবার। খাইস বিলাতী টুইড। এক্কেরে হীটার ফিট করা। কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পরাইয়া দিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা গইল্যা যায়। ছুইয়া দ্যাখ একবার। হাত লাগাইলেই লনডন বেড়াইবার সুখ হয়।'

আমরা সবাই অমনি একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে একটু কোটটা ছুঁলাম। কম্বলের মতো কুটকুটে। এই নাকি লন্ডন?

তারপর ব্যায়ামবীরের মতো দুই হাত নিজের দুই কাঁধে রেখে মাসল দেখানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'পুট দ্যাখ পুট।

এক্কেরে পারফেক্ট !'

ঠিক যেন বলছেন—দ্যাখ কী বাইসেপস, দ্যাখ কী গুলি দ্যাখ হাতে আমার।'

'আর সেন্ত?' বলে ডান হাতটা সামনের দিকে ঘুঁষি মারার ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলেন স্যাৎ করে। —'দ্যাখ সেন্ত দ্যাখ!'

আমরা সবাই অমনি একটু পিছিয়ে গেলাম একসঙ্গে। মঞ্জুটা বলে ফেলল—'ওখানে আবার সেন্ত কোথায়? সেন্ত তো ঘাড়ে না কাঁধে কোথায় যেন হয়!'

'ওই একই হৈল।' বসনমামা একটু লজ্জা পান বোধ হয়।

'যাঁহা বায়ান্ন তাই হৈল গিয়া তেপান্ন,
যারে কয় হাতা হোই তারেই কয় সেন্ত!
তুই আমারে টেইলারিং টার্মস শিখাস্?
দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন! ওঃ—'

বসনমামা রেগে যাচ্ছেন দেখে মঞ্জু বলে, 'সরি, আর বলব না।'

খুশি হয়ে বসনমামা আবার শুরু করেন, 'কী কইতাসিলাম? ওঃ হ্যাঁ, সিলাই। সিলাই দ্যাখছস? সুইসুতার কামডা কী ফার্স্টক্লাশ? আর পকেট দ্যাখছস? পকেট আর বুতামঘরা? এক্কেরে জরিদার কাশ্মীরী শাল। ফাইন এমব্রয়ডারি, বোঝলা? এইয়া সহজ কাম না! পয়সা লাগে! আর দ্যাখায় কী? হাইক্লাশ! য্যান নিজামের সিপাই!'

কিছুক্ষণ ড্রামাটিক এফেকেটের জন্য চুপ করে থেকে বসনমামা বলেন—

'এইবারে ঝুলটা দ্যাখ। পারফেকট ঝুল। জাস্ট্ আপটু থাই।' হাত দিয়ে টেনেটুনে কোটটা খানিকটা নামান বসন্তমমামা। বলেন—

'ওঃ কী ফিটিং! য্যান বাঘের গায়ে বাঘের চাম। অল পারফেক্ট!'

আমাদের কিন্তু কেমন কেমন লাগে। মনে হয় একটু ছোটই হয়েছে। হাতদুটোও কেমন খাটো খাটো। খুশিতে ভাসতে ভাসতে বসনমামা কিন্তু এবার বোতামে চলে যান।

'বুতাম দ্যাখছস? বুতাম? ভাল কইর‍্যা দেইখ্যা ল'। জার্মানীর বুতাম। চামড়ার। হিটলার যে ইহুদির চামড়া দিয়া বুতাম বানাইত? সেই স্টাইল। অবশ্যই ইহুদির চামড়ার না। বিন্ধ্যপর্বতের নীল গাইয়ের স্কিন।'

মঞ্জু বলল—'চামড়ারই নয় বসনমামা, প্লাস্টিক!'

'চামড়াই না বসনমামা, প্লাস্টিক!' বসনমামা মঞ্জুকে ভেংচে ওঠেন। 'তোমার কানটাও তাহলে প্লাস্টিক? দেখুম নাকি টাইন্যা?'

মঞ্জু দুইহাতে কান ঢেকে দূরে পালায়। তৃপ্তি বোধ করে বসনমামা বলেন—

'মাইয়াডার এট্টা ধ্যাও চ্যাও নাই। চামড়ারে কয় পেলাস্টিক!...

...এইবার ল্যাপেল দ্যাখ! কতোটা চওড়া! এমুন চওড়া ল্যাপেল আইজকাইল কেউ দ্যাখতেই পায়না। হে-ই ফর্টিথ্রিতে যখন প্রিন্স অব ওয়েইলস ইনডিয়া ভিজিটে আইসিল তখনই ফেশন হইসিল চওড়া ল্যাপেল কোট। অহন এতটা কাপড়ই বা খরচা করে কোন শালা? এই কাটই বা জানে কোন টেইলর? ... কলারটা দ্যাখ এইবার!'

একহাতে কলারটা উঁচু করে ধরে অন্যহাত পকেটে ঢুকিয়ে ঘরের এধার থেকে ওধার স্মার্টলি একবার মার্চ করে এলেন গুজস্টেপে।

'রয়্যাল কাট—এই কাটেরে কয় রয়্যাল কাট।'

সন্টু হঠাৎ বলে ফেলল—'ফর্টিথ্রিতে প্রিন্স অব্ ওয়েলস কে ছিল বসনমামা? ফিফটিথ্রিতে তো দ্বিতীয় এলিজাবেথ রাণী হলেন?' এবং মঞ্জু বলল—'ফর্টিথ্রিতে যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ইনডিয়াতে তো কোনো রাজা আসেইনি!'

'শাটাপ! ফুটানি মাইরলে এক থাবড়া দিয়া পিঠ ফাইড়্যা ফ্যালাইমু। যা বাইরাইয়া যা সব। অপোগন্ডের দল। মেজদি! ক্যাবল আপনেই শোনেন কোটের কাহিনী।

স্টার্চ-দ্যাওয়া হোয়াইট পেন্টুলুনের উপর এই কোটখান চড়াইয়া, হ্যাট্ মাথায় দিয়া হাতে ফ্ল্যাগটা লইয়া যখন গোমো স্টেশনের এই মাথা থিক্যা ওই মাথা পর্যন্ত পায়চারি করুম না মেজদি, পেসেনজাররা কইবো ইওরোপীয়ান গার্ড যাইতাসে বুঝি! সেইসব টাইম তো অরা দ্যাখেই নাই। অরা আর এই কোটের মর্ম বুঝবো কী কইর‍্যা?'

বসনমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিছন ফিরে বসার জন্যে চেয়ার টেয়ার কিছু খুঁজলেন।

মা বলে ফেললেন—

'ও বসন্ত, তোমার কোটের পিছনে যে ফুটো?'

'ওঃ, ঐটা? গুলির ফুটা! গুলির! এইটা ফ্রিডম ফাইটের কালের কোট তো?

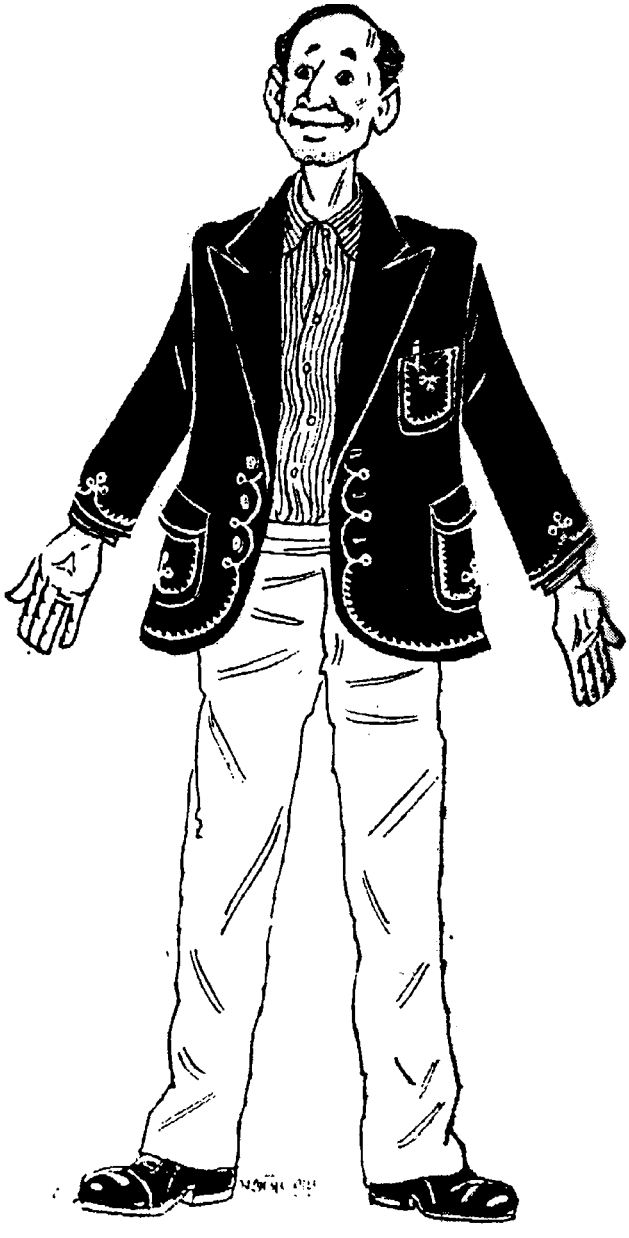

ওঃ—মেজদি কী দিনই গেছে গিয়া। পন্‌পন্ কইর‍্যা ছুটত্যাসি পথে, পিছে পুলিশ লইয়্যা—শন্‌শন্ কইর‍্যা ছুটত্যাসে গুলির ঝাঁক—বন্‌বন্ কইর‍্যা ঘুইর‍্যা পড়ত্যাসে মানুষগুলান সটাসট্ উনডেড হইয়্যা—আর তাগো বুকের রক্তে কালা পিচের পথা রাঙ্গা হইয়া যাইত্যাসে—'

হঠাৎ মঞ্জু বলল 'লোকেদের পিঠে গুলি লাগলে 'বুকের রক্ত' কেন বলে বসনমামা?'

এই রে! আবার প্রশ্ন! মঞ্জুটাকে বাঁচাতে সন্টু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—'তুই থাম দিকি মঞ্জু। জানিসনা শুনিসনা সবতাতে কথা! আচ্ছা বসনমামা, তোমার পিঠে যে-গুলিটা লেগেছিল সেইটের—'

'আমার পিঠে গুলি লাগবো ক্যান? যাইট্! গুলি লাগুক গিয়া আমার শত্রুগো পৃষ্ঠে।' কিন্তু মঞ্জুকে রুক্ষে করবে কোন দাদা? আবার মঞ্জু বলল 'কিন্তু তোমার কোটের ফুটোটা তো পিঠের দিকে!' ওর কথাটায় থাবা মেরে বলে উঠল সন্টু 'তোমার কি তবে বুকেই গুলি লেগেছিলো বসনমামা?'

অদম্য মঞ্জুকে থামায় কে? মঞ্জু চট্‌পট্ বলে দেয় উল্টোকথাটা 'তবে যে তুমি বললে পেছনে পুলিশ নিয়ে তুমি ছুটছিলে? পেছন থেকে বুকে কেমন করে গুলি লাগবে?' ভীষণ রেগে গিয়ে বসনমামা জিবে-টাগরায় চুক্ চুক্ করে শব্দ করে বলে উঠলেন—'আঃ হা! আমার বক্ষে গুলি লাগাইয়া তোমাগো কামডা ক্যান? গুলি? আমার দেহে গুলিই বা লাগবো ক্যান? আমি কোথায় কইতাসি চিরস্মরণীয় শহীদ ফ্রীডম ফাইটারগো কাহিনী, আর তোমরা কও ক্যাবলই আমার কথা। আমি কী শহীদ?'

সন্টু চুপ করে যায়। কিন্তু মঞ্জু চুপ করে নান। 'কিন্তু কোটের ওই ফুটোটা'—

'আঃ। কোটে ফুটা ত' আমার কী? তার কথা আমারে জিগাও ক্যান? কোটের ফুটা কোটের ফুটা!' বসনমামা বিরক্তমুখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন। এই উত্তরে কারও মুখে আর কোনো কথা যোগায় না। চমৎকৃত হয়ে চুপ করে যাই প্রত্যেকে। এমনকি মঞ্জুও। সকলেই মনে মনে একটা যুৎসই প্রশ্ন ভাবছি, এই বিচিত্র উত্তরের মানেটা কী করে জেনে নেওয়া যায়? এমন সময়ে কখন হারানজ্যাঠা ঘরে ঢুকেছেন।

জেঠিমা মারা গেছেন সেই ক-বে! তাঁর এই অতিআদুরে ছোট ভাইটি জ্যাঠারও অতি আদরের। সেই সূত্রেই আমাদের মামা বসনমামাকে দেখেই খুব খুশি হয়ে হারাণজ্যাঠা জিগেস করে বসলেন—'বাঃ! বেড়ে জরিদার কোট ত?—কোথায় বানিয়েছ বসন্ত এমন কোটখানা?'

'এই তো জামাইবাবু ল্যাখাই আছে'—চট করে হেসে দিয়ে, পিছু ফিরে চেয়ারের মত হয়ে আধো-বসে পড়েন বসনমামা।

কলারটা উল্টে ফেলে তলা থেকে একটা লেবেল দেখান। সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ আউড়ে যান—'দ্যাখেন, ল্যাবেল

দ্যাখেন, মেহবুব টেইলার্স, ক্যালকাটা নাইন।'

'ক্যালকাটা নাইনটা আবার কোনদিকে?'

'তা জানে কেডা? আমি তো রেলের গার্ডমানুষ। অ্যাড্রেস আপনে বরং পোস্ট অফিসের পিওনরে জিগান গিয়া। আমি জানি স্টেশনের খবর। বাস্।'

'সেকি? তোমার দর্জি, তুমি জান না কোন্ পাড়া?'

'আমাগো দরজি কেডায় কইল? আমাগো দরজি তো যতীন বাবু, বাহার টেইলার্স, ক্যালকাটা টুয়েন্টিনাইন।'

'তাহলে এই কোট?—'

অধৈর্য হয়ে বসনমামা বলেন—'আহাঃ, এতো কোট কোট করেন ক্যান? কোটের আমি জানি কী?'

'—মানে?'

'—মানে, কোট কি আমার?'

'—তবে কার কোট?'

'—হেইডাই বা আমি জানম কী কইর‍্যা?' এবার হারানজ্যাঠা স্পষ্টত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। 'তার মানে?' মা, সন্টু, মঞ্জু, সক্কলে মিলে কোরাসে হারান জ্যাঠার সঙ্গে গলা মেলাই।

—'তার মানে?'

'—তার মানে?'

'—তার মানে?'

'—আঃ হা! আমি তো এইডা আইজই কুড়াইয়া পাইলাম! কে জানি ফেলাইয়া গেছিল! গার্ডের কামরায়। তা ফাটা ফুটা পুরানা কোট,ওইয়া আর ফিরাইয়া নিবে কেডা? তাই ভাবলাম আমিই কোটটা পরি। গরম আছে বেশ! দ্যাখেন, হাত দিয়া দ্যাখেন জামাইবাবু?'

বলে বসনমামা একটু লাজুক হাসেন।

'কই মেজদি, চা হইল?'

এত পর্যন্ত ঘটেছিলো গত সপ্তাহে। রঞ্জন বলল, 'তারপরে আজকে কি হলো জানো নবনীতাদি? বললে বিশ্বাস করবে না। এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম আমরা, হঠাৎ চমকে দেখি গলির মুখে একটা ছোট্ট দোকান তাতে সত্যি সত্যি সাইনবোর্ডে লেখা—'মেহবুব টেলার্স, ক্যালকাটা নাইন।' তিনজন দর্জি একটা গ্যারাজে বসে বসে পা-মেশিনে মশারি সেলাই করছে। নীল নীল নাইলন নেটের স্বপ্নের মতো সব মশারিতে ঘরের মেঝে ভর্তি।

আমি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছি—'আপনারা কি কোটও বানান?'

চিকনের শাদা টুপি মাথায়, মেহেদী লাগানো দাড়ি নেড়ে বুড়ো দর্জি গোল গোল বাইফোকাল লেন্সের নিকেলের চশমা দিয়ে তাকালেন। তারপর বললেন—'না তো। ক্যানো বলুন দিকি?'

'মানে, কোটের গায়ে আপনাদের লেবেল দেখেছি—'

বুড়ো দর্জি হাফপ্যান্টপরা ন্যাড়া মাথা সদ্য পৈতে-হওয়া সন্টুকে একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর ফোকলা মুখে অপূর্ব এক হাসি হেসে বললেন—

'—কোট তৈরি করি না বটে, তবে লেবেল লাগিয়ে দি।'

'—তার মানে?'

'—মানে চোরা বাজার থেকে কোট নিয়ে এলে, আমরা তার লেবেলটা পালটে দি আরকি। আগে ছিল একটাকা পার লেবেল, এখন হয়েছে পাঁচ টাকা।' তার পরে বুড়ো দর্জি নাকি নতুন দাড়ি গোঁপ ওঠা রঞ্জনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে, ওর হাতে ঝোলানো কলেজের ব্লেজারটার দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে একটা চোখ টিপে নিচু গলায় বলেছিল—'কেন খোকা? আছে নাকি কোট? বেশতো, নিয়ে এসো, তিনটাকায় করে দিচ্ছি! এ লাইনে পেরথম কাজ বলেই মনে হচ্ছে?'

'—বাপরে বাপ। চোরই ভেবে নিয়েছিল ওরা আমাদের, নবনীতাদি! আরটু হলেই হয়ত পুলিশে ধরত! বসনমামারও যেমন কান্ড। কোত্থেকে প'রে এসেছেন এক চোরের ফেলে-দেওয়া কোট।' রঞ্জন হাঁপাতে থাকে, আমি হাঁ করে থাকি। ধন্যি বসন্তমামা! ধন্য তাঁর কোট।

ছবি: সত্যজিৎ রায়

(শারদীয়া -১৩৮৬)

জেনি মেমসাহেব নয়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জেনি। নাম শুনে ভেবো না মেমসাহেব। আসলে জেনি মানুষই নয়। জেনি ছিল বনমানুষ। ছিল বলছি, তার কারণ সে আজকের কথা নয়। আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রথম ওরাংওটাং আসে ১৮৭৬ সালে। সাহেবরা তখন এদেশের হর্তাকর্তা। কাজেই মেমসাহেবদের নাম তার নামে দেওয়া হল জেনি। চিড়িয়াখানার এক ছোট্ট খাঁচায় জেনিকে রাখার ব্যবস্থা হল। একটা কাঠের চৌকো বাক্স, তাকে খড়ের বিছানা আর গায়ে দেবার পাতলা একটা কম্বল; খাঁচার এককোণে মাটির ঘড়ায় খাবার জল আর একটা টিনের মগ। ব্যাস, জেনির ঘরে আসবাব বলতে এই। মগ থাকলে কী হবে, মগে ক'রে জল খেতে জেনিকে খুব কম সময়ই দেখা যেত।

জেনির যখন সবে ছ বছর বয়স, তখনই তাকে দেখাত যেন এক ছিয়াশি বছরের বুড়ো। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, সব সময় ভয়-ভয় ভাব। সারা শরীর যেন পুঁটুলি পাকিয়ে আছে ঠাণ্ডায়।

জেনিকে যে দেখাশুনো করত, জেনি ছিল তার ভারি ন্যাওটা। সব সময় তার পায়ে পায়ে ঘুরত। একটু চোখের আড়াল হলেই অমনি জেনি তাকে খুঁজে বেড়াত। জঙ্গলের জীব হলে কী হয়, জেনি ছিল বেজায় ভীতু। ভাল্লুক কিংবা কোন বড় জন্তু একটু নড়াচড়া করেছে কি অমনি জেনি সেখান থেকে দে ছুট।

পরে খাঁচা গিয়ে জেনির জন্যে ভাল ঘর হল। ইঁটের পাকা দেয়াল, তাতে জানলা ফোটানো; মাথায় খড়ের চাল। জেনির যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্যে মেঝেয় উঁচু করে তক্তা বসানো হল। কিন্তু জেনি তখন দারুণ ডানপিটে হয়ে উঠেছে। যখন একা একা ঘরে থাকে টেনে টেনে খড় বার করে। চালে আর কাঁহাতক খড় গুঁজে পারা যায়! কাজেই তখন বাধ্য হয়ে খড়ের চাল বদলে কাঠের ছাদ ক'রে দেওয়া

হল। এর পেছনে জেনিরই কোন চাল ছিল কিনা কে জানে?

জেনিকে শীতের সময় খুব সাবধানে রাখতে হত, যেন একটুও ঠাণ্ডা না লাগে। রাত্রে জেনির বুকে গরম সেঁক দিতে হত। সন্ধ্যেয় তাকে খাওয়ানো হত মুরগির সুপ। অবশ্য একটু বড় হয়ে জেনি রাঙা-আলু সেদ্ধ, পাঁউরুটি এসবও

খেতে শিখল। অর্থাৎ বনমানুষ জেনি চিড়িয়াখানায় এসে পুরোপুরি মেমসাহেব ব'নে গেল। ক্ষিধে পেলে রেগে মাটিতে গড়াগড়ি দিত, খেয়ে পেট ঠাণ্ডা হলে জেনি তার এঁটো খাবার যে তাকে-দেখত তার মুখে জোর ক'রে গুঁজে দিত। ওটা ছিল তার আদর করার ধরন।

মেমসাহেব! তাহলে জেনি বিলেতে গেল না কেন? জেনি বিলেত গিয়েছিল বৈকি। শুধু কি সে একা গিয়েছিল— এক দেশী বেড়ালকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল— তাকে বিলেতফেরত করবার জন্যে। সে গল্প পরে বলছি।

জেনি খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন এক ছেলে ওরাংওটাং আলিপুর চিড়িয়াখানায় এসে ভর্তি হল। জেনির সঙ্গে দুদিনে তার দারুণ ভাব হয়ে গেল। দুটিতে সারাদিন টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু হলে হবে কী, ছেলে ওরাংওটাং ছিল বেজায় রোগা-পট্‌কা। অত দস্যিপনা তার সহ্য হল না। কিছুদিনের মধ্যেই অসুখে ভুগে সে মরে গেল।

বন্ধুকে হারিয়ে জেনি কিছুদিন খুব মনমরা হয়ে কাটাল। তারপর এক ভারি মজার ব্যাপার ঘটল।

জেনির দুধে ভাগ বসাতে কোত্থেকে এসে জুটে গিয়েছিল এক দেশী বেড়াল। এই সময় জেনির খুব একা একা লাগছিল ব'লেই বোধহয় হঠাৎ বেড়ালটার ওপর তার খুব মায়া প'ড়ে গেল। দেখতে দেখতে দুজনের গলায় গলায় (না ল্যাজে ল্যাজে?) ভাব হল। বেড়ালটার সঙ্গে জেনির যেমন ভাব তেমনি দিনরাত খুনসুটি লেগে থাকত। সামনে তেঁতুলগাছে উঠত জেনি বেড়ালটার ল্যাজ ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে।

এদিকে ভাল খেয়েদেয়ে জেনির চেহারায় চেকনাই এসে গেল। চুল চকচকে আর গা তকতকে ঝকঝকে হল। তার আর সেই ভয়-ভয় ভাব নেই। আর সে কুঁকড়ে থাকে না। বিকেলে যখন তার চুল আঁচড়ে দেওয়া হত তখন আরশি হাতে নিয়ে নানারকম সে মুখভঙ্গি করত। আহা, মরি মরি! কী রূপ! তেমনি স্বভাব। শীত যখন এল, সাহেববাড়ি থেকে তৈরি হয়ে এল তার গরম ফ্ল্যানেলের সুট। দুদিনও গেল না; জেনি সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল।

বছর দুই পরে খাস বিলেতে তাকে তলব ক'রে নিয়ে গেল লণ্ডন জু।

জেনি কিন্তু বায়না ধরল দেশী বেড়াল-বন্ধুটিকে না নিয়ে সে নড়বে না। পাছে সে ধর্মঘট করে, সেই ভয়ে জেনির সঙ্গে বেড়ালটাকেও লণ্ডন পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বেড়ালটা পরে এদেশে ফিরে এসেছিল কিনা জানি না। যদি এসে থাকে তাহলে সেই বোধহয় এদেশের প্রথম বিলেত-ফেরত বেড়াল।

ছবি : রেবতীভূষণ

(বৈশাখ-১৩৬৮)

শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তিন প্রধান অতিথি—নীতিশ মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন ও দেবাশীষ দেব

ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি

বিজয়া রায়

ছোটবেলা আমাদের ভারি আনন্দে কেটেছে। আমাদের পাটনার বাড়িটা ছিল বাংলো টাইপের। চারিপাশে জমি, গাছ ও বাগান দিয়ে ঘেরা মনোরম পরিবেশ। টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ফুলের বাগান, বাবার অতি শখের গোলাপ বাগান আর গাছ—হরেক রকমের গাছ—আম গাছ, নিম গাছ—যার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে ছিল আমাদের বাগানের চারিপাশে সুরকি ঘেরা রাস্তার উপর। তাছাড়া কুল গাছ, পেয়ারা গাছ, বেল গাছ, আরো কত কি! পেয়ারা গাছে চড়ে মনের সুখে পেয়ারা চিবিয়েছি। আম গাছের ডাঁসা আম পেড়ে, তেল, নুন, লঙ্কা মেখে কি স্বর্গীয় সুখে খেয়েছি সে কথা ভাবলে এখনও জিভে জল আসে! নিম গাছটা খুব উঁচু ছিল, তাতে মালি আমাদের জন্য দোলনা টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। কত দোল খেয়েছি সে দোলনায়।

একবার একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল, যেটা ভাবতে এখনও গা শিউরে ওঠে।

আমরা চার বোন মিলে বারান্দার সিঁড়ির উপর বসে গল্প করছিলাম। আমার ঠিক ওপরের বোন জয়া, যাকে আমি 'সেজদি' বলে ডাকতাম, সে হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে, সুড়কি ঢালা রাস্তায় কি একটা চিক্‌চিক্ করতে দেখে তার সন্ধানে নেমেছিল। বাবা, মা কোথায় যেন বেরিয়েছিলেন। আমাদের সামনের গেটটা খোলা ছিল। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, সেই গেট দিয়ে একটা বিরাট ষাঁড়, লেজ তুলে সিং বেঁকিয়ে তীর বেগে ঢুকলো। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'সেজদি, তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে আয়!' কিন্তু সেজদি তখন ভয় পেয়ে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ব করল, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়টাও সেজদির পিছনে ধাওয়া করল। সেজদি প্রাণের ভয়ে ছুটছে আর ষাঁড়টাও হিংস্রভাবে ওকে তাড়া করেছে। আমরা ত ভয়ে কাঠ! বাড়িটা দু'বার চক্কর দেবার পর বুঝলাম সেজদির দম ফুরিয়ে আসছে—মালি, জমাদার সব কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি সেজদির শেষ সময় উপস্থিত। হঠাৎ দেখি বাবার খাস বেয়ারা দেওচাঁদ একটা দড়িতে 'কাউ বয়' ধরণের ফাঁস লাগিয়ে অব্যর্থ লক্ষে ষাঁড়ের গলায় ছুঁড়ে মেরে, দিল একটা টান—এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবাজী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বড়দি আর মেজদি তাড়াতাড়ি নেমে সেজদিকে প্রায় পাঁজাকোলা করে বারান্দায় তুলে আনল। আর ষাঁড়টা? দেওচাঁদ টানতে টানতে তাকে গেটের বাইরে নিয়ে গেল। গেটটা বন্ধ করার আগে তার পেছনে সজোরে একটা লাথি মারতে ভুললো না!

আমরা প্রায় প্রত্যেক ছুটিতেই কাকার কাছে কলকাতা যেতাম। কাকারাও মাঝে মাঝে আসতেন। একবার ওঁরা আসার পর আমার হঠাৎ সখ হল একটা ছোট্ট নিজস্ব বাগান করবার। বাড়িতে বাগানের অভাব নেই, কিন্তু নিজের হাতে গাছ পুঁতে ত কখনও বাগান করিনি, মালিই সব করত। মা'র কাছে অনুমতি চাইলাম—পেয়েও গেলাম। মানিককে বললাম, 'বাগান করবে? আমরা দুজনে মিলে করব, কেমন?' ও ত তক্ষুনি রাজি। ওদের গড়পার রোডের বাড়িতে বাগান ছিল— কিন্তু কাকাদের বাড়িতে নেই। জায়গাও ঠিক হল। টেনিস কোর্ট আর গোলাপ বাগানের মাঝে বেশ খানিকটা জায়গা খালি ছিল। মালিই জায়গা ঠিক করে দিল। এবার মাটি খোঁড়ার পালা। কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়ার মত বয়স আমাদের দুজনের একজনেরও ছিল না, কাজেই সেই ভারটা মালিকেই দিতে হল। তখন মরসুম ফুলের সময়। মানিককে জিজ্ঞেস করাতে দেখলাম ও ফুলের নামটাম বিশেষ জানে না। আমি আর মালি মিলে ঠিক করলাম ফ্লক্স (Phlox), পিটুনিয়া (Petunia) আর ক্যান্ডিটাফট (Candytuft) ফুলের চারা লাগাব। চারা কেনা হল, মহাসমারোহে লাগানো হল। নিয়মিত পালা করে আমি আর মানিক মহা উৎসাহে ঝাঁঝরি থেকে জল ঢালতাম। চোখের সামনে চারাগুলো বড় হতে লাগল। কিন্তু

বেচারা মানিকের ভাগ্যে ফুল ফোটা দেখা হল না—তার আগেই ওকে কলকাতা চলে যেতে হল। ফুল যখন বাগান আলো করে ফুটল, তখন আমি আমাদের পাতানো বিহারী ভাই অম্বিকাদা'কে দিয়ে ছবি তুলিয়ে মানিককে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

একবার আমি স্কুলে ড্রইং-এ ফার্স্ট হলাম। কী করে হলাম, জানিনা, কারণ আমাদের বাড়িতে কেউ কোনদিন আঁকতে পারত বলে শুনিনি। গানের গলা সকলেরই ছিল, কিন্তু ড্রইং-এ ফার্স্ট হব, এ কল্পনাও করতে পারিনি। মা, বাবা ত মহা খুশি।

সেবার যখন কলকাতায় গেলাম, মা খুব গর্ব করে সবাইকে আমার ড্রইং-এ ফার্স্ট হবার কথাটা বললেন।

আমি সকলেরই খুব প্রিয় পাত্রী ছিলাম, তার কারণ আমার গানের গলা সত্যিই খুব ভালো ছিল—স্বভাবও শান্ত, ঝগড়াঝাটির মধ্যে নেই বললেই চলে আর প্রচন্ড শখ ছিল বই পড়ার।

মা'র কথা শুনেই ছোটপিসি (কনক বিশ্বাস) বলে উঠলেন—'মঙ্কু আবার আঁকতেও পারে? আজকেই তাহলে মানিকের সঙ্গে ওর কম্পিটিশন হয়ে যাক্।' আমি ত অবাক! মানিক আমার চেয়ে বয়সে ছোট, ওর সঙ্গে আবার কী কম্পিটিশন হবে?

ঠিক হল দুপুরবেলা খাবার পর আমরা দুজনে আঁকতে বসব। যারটা বেশি ভালো হবে, সে একটা প্রাইজ পাবে।

মানিক ঠিক কতখানি ভালো আঁকে আমার জানা ছিল না। ছোটবেলায় একসঙ্গে অনেক সময় কাটালেও, আমরা থাকতাম পাটনায়, আর ও কলকাতায়। আমি মনে মনে একশো ভাগ নিশ্চিন্ত ছিলাম যে প্রাইজটা আমিই পাব।

দুপুরে খাবার পর ছোটপিসি বই থেকে একটা ছবি বেছে বললেন, 'এই ছবিটা দেখে দেখে দুজনে আঁকবে। যারটা বেশি ভালো হবে, সেই প্রাইজ পাবে।'

ছবিটা এখনও আমার পরিষ্কার মনে আছে—একটি ছোট্ট মেয়ে সুন্দর পোষাক পরা, মাথায় রিবন বাঁধা, হাতে এক টুকরো খাবার নিয়ে একটা খাঁচায় বন্ধ পাখির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। পাখিটা টিয়া। মেয়েটির অন্য হাতে একটা পুতুল ঝুলছে। ছবিটা মাঝখানে রেখে দুজনে বসলাম। সহজ ছবি, আঁকতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। আঁকা শেষ ক্‌রে আমি একটু আগেই উঠলাম। মানিকের মা, ছোটপিসি, আমার মা ও কাকীমা খাটে বসে গল্প করছিলেন। তাঁদের হাতে আঁকাটা তুলে দিলাম। সবাই দেখে বললেন, 'বাঃ! সুন্দর হয়েছে ত!' ছোটপিসি মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বড় বৌঠান, মঙ্কুকে গাইয়ে হিসাবেই জানতাম, এখন দেখছি আঁকেও ভালো।'

এর একটু পরে মানিক তার আঁকা শেষ করে তার মা'র হাতে দিল। উনি একবার ভালো করে তাকিয়ে কিছু না বলে অন্যদের হাতে চালান দিলেন। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি ভাবলাম ওর আঁকা বোধহয় ভালো হয়নি, তাই ওর মনে দুঃখ না দেবার জন্য কেউ কিছু বলছেন না। ছোটপিসিই প্রথম মুখ খুললেন, 'দেখ বড় বৌঠান, মানিক কেমন এঁকেছে। এখন তুমিই বল প্রাইজটা কে পাবে।'

মা মানিকের আঁকাটা দেখে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে না, 'প্রাইজটা মানিকেরই প্রাপ্য!' কথাটা শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য হতবাক। তারপরই কেঁদে মা-র কোলে মুখ লুকালাম।

মা আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'ছিঃ মা, কাঁদে না। ছবিটা দেখ, দেখলেই বুঝতে পারবে কত সুন্দর এঁকেছে মানিক। সব জিনিসেই হার জিত আছে। হেরে যদি কাঁদো তাহলে লোকে আনস্পোর্টিং বলবে—সেটা খুব লজ্জার কথা। মুখ তোল, মানিকের আঁকাটা একবারটি দেখ।'

কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুললাম। আঁকাটা দেখে চোখের জল শুকিয়ে গেল। সত্যি, কি সুন্দর এঁকেছে মানিক! আমি অনেক জায়গায় রাবার ব্যবহার করেছি, যার ফলে কিছু কিছু জায়গা একটু অপরিষ্কার হয়ে গেছে। মানিক একবারও রাবার ব্যবহার করেনি, পেনসিলের টানই আলাদা। যে ছবিটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল, মানিকের আঁকাটা যেন তার চেয়েও সুন্দর। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রাইজটা যে ওরই প্রাপ্য সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। মানিকের বয়স তখন পাঁচ বছর!!

(শারদীয়া-১৪০২)

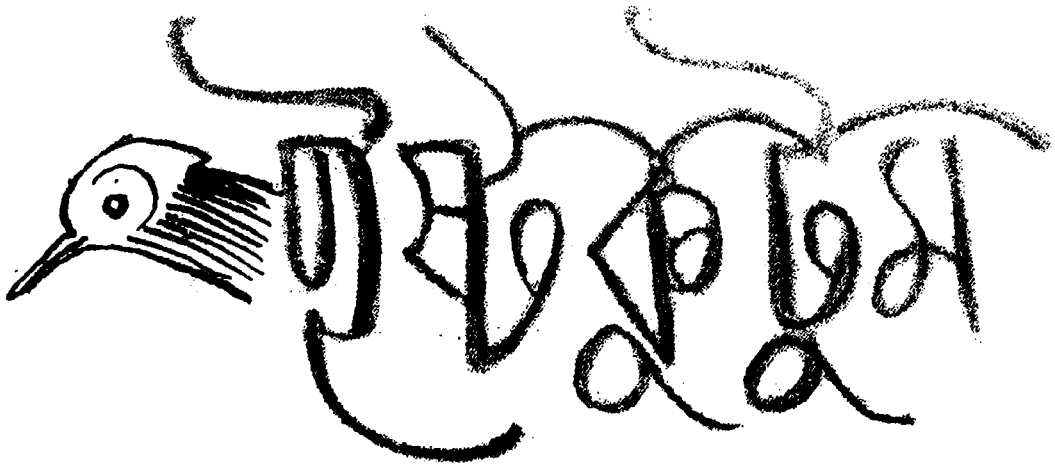

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বটুকদাদা গেরুয়া ঝোলাটা থেকে একটা ছোট্ট ডিম বার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের ডিম বল তো?'

আমরা তিন-চারজন এক সঙ্গে বললুম, 'কই, দেখি, দেখি!'

বটুকদাদা হাত উঁচু করে বললেন, 'না। কেউ হাতে নিতে পারবে না। দূর থেকে দেখে বলো।'

পিংপং বলের চেয়েও বেশ ছোট সেই ডিমটা, ছাই ছাই রঙের। দেখে মনে হয়, সাধারণ একটা পাখির ডিম। কিন্তু বটুকদাদার কাছে তো সাধারণ জিনিস কিছু থাকে না। বটুকদাদা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ান, মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হন তাঁর ঝুলি ভর্তি গল্প আর নানান রকম আজব জিনিস নিয়ে।

সেইজন্যই মন্টু বললো, 'ওটা কুমিরের ডিম!'

রতন বললো, 'ড্রাগনেরও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমার মনে হচ্ছে ঈগল পাখির!'

বটুকদাদা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এই নীলুটা অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। তবে ঈগল পাখি নয় রে। ধনেশ পাখির ডিম এটা! এবারে আসামের এক জঙ্গলে গেসলুম, বুঝলি সেখানে —'

রতন বলল, 'বটুকদাদা, তুমি তো সকাল বেলায় বললে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলে। সেখান থেকে আসাম বুঝি কাছে?'

বটুকদাদা বললেন, 'কাছে কি দূরে তা জেনে তোর দরকার কি? মুর্শিদাবাদ গেলে বুঝি আসাম যাওয়া যায় না? আসামও বলতে পারিস, ভুটানও বলতে পারিস। সেই জঙ্গলটার নাম মানস। জঙ্গলটার আদ্ধেক আসামে আর আদ্ধেক ভুটানে। কি গভীর বন, কত বাঘ, কত হাতি, একদিন একটা পাগলা হাতির পাল্লায় পড়ে...আচ্ছা, সেই হাতির গল্পটা আর একদিন বলবো! সেই জঙ্গলে মাঝে মাঝেই শোঁ-শোঁ করে ঝড়ের শব্দ পাওয়া যায়। অথচ হাওয়া নেই, গাছের পাতা নড়ে না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি বিরাট বিরাট ডানা মেলে এক রকমের পাখি উড়ে যাচ্ছে। প্রথম ভাবলুম গরুড় না রক পাখি? একটা পাখির ডানায় এত শব্দ! তারপর একদিন দেখি নদীর ধারে সেই দুটো পাখি বসে আছে। তখন মস্ত বড় লম্বা ঠোঁট দেখেই বুঝলুম, আরে, এ যে ধনেশ! এর আগে জ্যান্ত ধনেশ দেখি নি কখনো!'

আমরা অবশ্য জ্যান্ত কিংবা মড়া কোনো ধনেশ পাখিই দেখিনি। তবে ছবি দেখেছি বইতে।

বটুকদাদা বললেন, 'তাই ভাবলুম, একটা ধনেশ পাখির ডিম নিয়ে যাই। তোদের দেশে তো এ পাখি নেই।'

মন্টু জিজ্ঞেস করলো, 'বটুকদাদা, অতবড় ধনেশ পাখির এত ছোট ডিম?'

বটুকদাদা এক গাল হেসে বললেন, 'এত বড় বড় বট গাছের কত ছোট ফল হয় দেখিস নি? কত কষ্ট করে জোগাড় করতে হল এই ডিমটা। ধনেশ পাখি ডিম পাড়ে প্রকান্ড

গাছের মগডালে। এই বয়েসে অত উঁচু গাছে ওঠা কি সোজা কথা? তবু তোদের কথা মনে করেই আনলুম।'

রতন জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি এই ডিম ফুটে বাচ্চা হবে?'

বটুকদাদা বললেন, 'আলবৎ হবে! দ্যাখ না, কি সুন্দর খড়ের বিড়ে বানিয়ে রেখে দেবো। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। আমি অবশ্য এবারে দু' তিন দিনের বেশি থাকবো না। তোরা মধু জোগাড় করে রাখবি, ওরা মধু খেতে ভালবাসে!'

আমি বললুম, 'বটুকদা, আমি একটু ডিমটা একবার ছোড়দিকে দেখিয়ে আনবো।'

মন্টু আর রতন এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'না, না, না, এই ডিমে কারুর হাত দেওয়া চলবে না!'

আমি বটুকদাদার চোখের দিকে তাকিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বললুম, 'ছোড়দির খুব অসুখ! ছোড়দি তো এখানে আসতে পারবে না!'

বটুকদাদা বললেন, 'ও তাইতো, ছোটনের অসুখ। আচ্ছা, ওকে একবারটি দেখিয়েই কিন্তু নিয়ে আসবি।'

মন্টু জিজ্ঞেস করল, 'ধনেশ পাখির জন্য খাঁচা বানাতে হবে না?'

বটুকদাদা বললেন, 'অত বড় পাখি কি খাঁচায় রাখা যায়? ধনেশ পাখি ডানা ছড়ালে কত বড় হয় জানিস? এই অ্যাত্ত বড়! ছোট বেলা থেকে পোষ মানাবি বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে, ও সেইখানেই থাকবে!'

মন্টু আর রতন ঝগড়া করতে লাগল কার বাড়ির ছাদে ধনেশ পাখিটা থাকবে তাই নিয়ে। আমি ডিমটা নিয়ে এক ছুটে চলে গেলুম ছোড়দির ঘরে।

ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেছে এক বছর আগে। জামাইবাবুর সঙ্গে ছোড়দি থাকে লাদাখে। সে যে কত দূর! জামাইবাবু সেখানে ভূতাত্ত্বিকের কাজ করেন। ছোড়দি চলে যাওয়ার পর বাড়িটা যে কি খালি খালি লাগতো। আগে ছোড়দি আমাকে কত বকুনি দিত, এখন মনে হয়, সেই সব বকুনিও কত মিষ্টি ছিল!

এতদিন পর ছোড়দি আবার এসেছে। কিন্তু এ যেন অন্য ছোড়দি। আগের মতন আর দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে না, চেঁচিয়ে আমাদের নাম ধরে ডাকে না! পেয়ারা গাছেও ওঠেনি একবারও। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা এত বদলে যায়? ছোড়দি হঠাৎ বড় হয়ে গেছে। ছোড়দি এখন আমাদের সঙ্গে বেশি মেশে না, মা, পিসিমা আর বড় বৌদির সঙ্গেই তার যত গল্প।

সাত দিন থাকার পরেই ছোড়দি অসুখে পড়ল!

এ কি রকম অদ্ভুত অসুখ, সব সময় জ্বর। জ্বরে ছোড়দির মুখখানা ঝাঁ ঝাঁ করে, চোখ লাল হয়ে যায়, ডাক্তারবাবু এসে ওষুধ দিয়ে গেলেন কত। তবু সেই জ্বর কমে না।

দু' সপ্তাহ বাদেই ছোড়দির চলে যাবার কথা। জামাইবাবু মানে প্রকাশদার এসে নিয়ে যাওয়ার কথা। প্রকাশদা লাদাখ থেকে এসে ছোড়দিকে নিয়ে আন্দামান চলে যাবেন। ছোড়দির কি মজা, কত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবে!

কিন্তু কুড়ি দিন হয়ে গেল, প্রকাশদা এলেন না, তাঁর কোনো চিঠিও পৌঁছালো না। লাদাখ থেকে চিঠি আসতে কতদিন লাগবে কে জানে!

সেইজন্য, ছোড়দির শুধু জ্বর নয়, খুব মন খারাপ! ছোড়দি হাসে না, গল্প করে না, শুধু শুয়ে থাকে। ছোড়দিকে নিয়ে বাড়ির সবার সেইজন্য খুব চিন্তা। ছোড়দিকে খুশি করার জন্য যে কি করা যায়, তাই ভেবে পাই না। তবে ছোড়দি এক সময় খুব পাখি ভালোবাসতো, নিশ্চয়ই এই ডিমটা দেখে খুশি হবে!

ছোড়দির ঘরে ছোড়দি নেই। বিছানা খালি। ছাদেও ছোড়দিকে পাওয়া গেল না। অনেক সময় রান্না ঘরে ছোড়দি মায়ের পাশে বসে থাকে, এখন দেখি রান্না ঘরে মা একা।

খুঁজতে খুঁজতে দেখি পুকুর ধারে ছোড়দি একলা বসে আছে। জলে পা দুটো ডোবানো। অনেকখানি ভিজে গেছে শাড়ীটা। মাথাকর চুলগুলো খোলা, ছোড়দি গুণগুণ করে একটা গান গাইছে, সেটা দারুন দুঃখের গান মনে হলো!

আমার পায়ের শব্দ শুনে ছোড়দি মুখ ফিরিয়ে এমনভাবে তাকাল যে আমাকে যেন চিনতেই পারছে না।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার কি হয়েছে, ছোড়দি?'

ছোড়দি বললেন, 'কিছুই হয় নি তো!'

আমি বললুম, 'তুমি এই দুপুরবেলা একা একা বসে আছো কেন?'

ছোড়দি বললো, 'এমনিই বসে আছি। আমার কিছুই

ভালো লাগছে না রে, নীলু!'

আমি তখন আলতো করে ধরা ডিমটা দেখিয়ে বললুম, 'জানো, এবার বটুকদাদা কি এনেছে? এই দ্যাখ, ধনেশ পাখির ডিম!'

ছোড়দি ভুরু কুঁচ্‌কে বললো, 'কি পাখির ডিম বললি?'

আমি বললুম, 'ধনেশ পাখি! সেই পাখি কত বড় জানো, বটুকদাদার দু'হাতের চেয়েও বড়। আর তার ঠোঁটটা আমার পায়ের চেয়েও লম্বা!'

ছোড়দি হাত বাড়িয়ে ডিমটা নিয়ে বললো, 'ধ্যাৎ, কে বললো, এটা ধনেশ পাখির ডিম। বাজে কথা।'

আমি জোর দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, এটা ধনেশ পাখির। বটুকদাদা আসামের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছে!'

ছোড়দি বললো, 'বটুকদাদা আর গুল মারবার জায়গা পায় না? বটুকদাদা আবার আসামে গেল কবে? ধনেশ পাখির ডিম জোগাড় করা মোটেই সহজ নয়।'

ছোড়দির কথা আমার বিশ্বাস হল না। বটুকদাদা কি আমাদের জন্য একটা যা তা পাখির ডিম আনতে পারেন?

আমি বললুম, 'ঠিক আছে, তোমার দেখা হয়ে গেছে তো? এবার ফেরৎ দাও।'

ছোড়দি এক ধমক দিয়ে বলল, 'না, দেবো না। যা ভাগ! পাখির ডিম নিয়ে ছেলেখেলা আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

আমি বললুম, 'এটা আমার জিনিস নয়, বটুক দাদার জিনিস! তুমি দিয়ে দাও! মন্টু আর রতন আমাকে মেরে ফেলবে!'

ছোড়দি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যা বাড়ি যা পড়তে বোস গিয়ে। খালি আড্ডা! এই বয়সেই বড্ড আড্ডা দিতে শিখেছিস!'

ডিমটা হাতে নিয়ে ছোড়দি দৌড়ে চলে গেল পুকুরপাড় দিয়ে।

আমার এসব খারাপ লাগল! বটুকদাদাকে এখন আমি কী বলি? মন্টু আর রতন আমাকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু ছোড়দির শরীর খারাপ আর মন খারাপ, এখন তার ওপর রাগ করা যায় না।

আমি বটুকদাদার ঘরে গিয়ে তার গা ঘেঁসে বললুম, 'বটুকদাদা, আমার হাত থেকে পড়ে ডিমটা ভেঙ্গে গেল! তুমি আমায় মারবে?'

বটুকদাদা আরাম করে হুঁকোয় তামাক টানছিলেন। আমার মাথার চুল ধরে আদর করে বললেন, 'জানি, তুই মিছে কথা বলছিস! তোর ছোড়দি ভেঙ্গে ফেলেছে, তাই না? যাক গে যাক যা হয়ে গেছে! আমি আবার আসামে যাচ্ছি, এবার এক সঙ্গে তিনটে ডিম আনবো!'

আমি নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললুম, 'মন্টু আর রতন যদি ছোড়দির নামে কিছু বলে?'

বটুকদাদা বললেন, 'ওদের আমি বলে দেব এখন যে আমার হাত থেকেই ডিমটা পড়ে গেছে। প্রকাশের চিঠি আসেনি, ছোটনের খুব মন খারাপ। তাকে কেউ কিছু বলবে না।'

এর পরের দিন ছোড়দির খুব জ্বর বাড়লো। তার পরের দিন আরও একটা ঘটনা ঘটলো!

বাবা পোস্ট অফিস থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়ে মুখ কালো করে বাড়িতে এলেন। সেই কাগজ দেখালেন জ্যাঠামশাইকে। তারপর দাদা, মা, বৌদি, পিসিমা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন খবরের কাগজটার ওপরে।

প্রথম পাতাতেই একটা চৌকো জায়গায় খবর বেরিয়েছে। লাদাখে ধস্ নেমে সাতজন লোক মারা গেছে। তাদের মধ্যে একজন বাঙালী!

কোনো লোকেরই নাম দেয়নি অবশ্য, কিন্তু লাদাখে আরও কি বাঙালী থাকতে পারে? মা প্রায় কাঁদতে শুরু করে দিলেন, পিসীমা বললেন, 'চুপ, চুপ, এখুনি ছোটনকে কিছু জানিও না। আগে পাকা খবর আসুক!'

বাবা পোস্ট অফিসে ছুটলেন টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য। পিসিমা আমাকে বললেন, 'নীলু, তুই ওপরের ঘরে গিয়ে ছোটনের পাশে গিয়ে বোস। খবর্দার, ওকে যেন কিছু বলবি না!'

খাটের ওপর একটা পাতলা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে ছোড়দি। মাথার কাছে জানলাটা খোলা। ছোড়দি জানলার দিকে ফিরে আছে। তার দু'চোখে জল।

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই রে, ছোড়দি শুনতে পেয়ে গেছে নাকি? ছোড়দির কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়ে গেল।

ছোড়দি একবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে বলল, 'আয় নীলু, বোস। তোর মাস্টারমশাই আসেনি? এখন পড়বি না।'

আমি বললুম, 'না। আমি তোমার কাছে একটু থাকবো? তুমি কেন সেদিন পুকুরে পা ডুবিয়ে বসেছিলে? তাই তো তোমার জ্বর বাড়লো!'

ছোড়দি সে কথায় কান না দিয়ে বললো, 'নীলু, দ্যাখ, এই পেয়ারা গাছটায় একটা কী সুন্দর পাখি এসে বসেছে। এটা কী পাখি, চিনিস?'

আমাদের বাড়ির পাশেও একটা বড় পেয়ারা গাছ। তার

ডালপালা দোতলার জানলা দিয়ে হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। পেয়ারা গাছটায় অনেক রকম পাখি এসে বসে পেয়ারা খাওয়ার জন্য। এখন অবশ্য গাছটায় একটাও পেয়ারা নেই। কিন্তু একটা নতুন রকমের পাখি খুব কাছেই এসে বসেছে।

পাখিটা অনেকটা গেরুয়া খয়েরি রঙের, শালিকের চেয়েও বড়, লম্বা লেজ। চোখে অবাক অবাক ভাব। আমি এই রকম পাখি আগে দেখিনি।

ছোড়দি বলল, 'একে বলে ইষ্টকুটুম পাখি। আমার দিকে কি রকম তাকিয়ে আছে দ্যাখ। ঠিক যেন আমার অসুখের কথা শুনে আমাকে দেখতে এসেছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এই পাখিটা কি রকম ডাকে? শিস দেয়?

ছোড়দি বললেন, 'একবার ডেকেছিল, চুপ করে বসে থাক, আবার ডাকতে পারে। জানিস নীলু সেদিন তোর কাছ থেকে যে ডিমটা নিয়েছিলুম সেটা আমি পুকুর ধারে একটা গাছে ফাঁকা পাখির বাসায় রেখে এসেছি। সেটা এই পাখিরই ডিম ছিল না তো?'

আমি বললুম, 'সেটা তো ছিল ধনেশ পাখির ডিম।'

ছোড়দি বললেন, 'ভ্যাট্, বাজে কথা! এই নীলু, আমি ভাল আছি, আমার জ্বর ছেড়ে গেছে এই কথাটা বলে দেনা পাখিটাকে!'

'আমি কী করে বলব, আমি কি পাখির ভাষা জানি?' আমি ছোড়দির কপালে হাত রাখলুম। সত্যিই জ্বর নেই।'

ইষ্টকুটুম পাখিটা টুইট করে একবার ডেকেই উড়ে চলে গেল। বেশ জোরে ডাকে তো পাখিটা!

তারপর ছোড়দির পাশে বসে বসে আমি গল্প করছি, বোধহয় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। হঠাৎ একতলায় একটা গোলমাল শোনা গেল। কিসের যেন আনন্দের হৈ চৈ। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এসে দাদা বললেন, 'এই ছোটন, আয়, আয়, নিচে আয়। প্রকাশ এসেছে! এই মাত্র এসে পৌঁছালো।'

ছোড়দি ধড়মড় করে উঠে বসল। আমি পেয়ারা ডালটার দিকে তাকালাম। ইষ্টকুটুম পাখি আমি আগে তো দেখিনি। কিন্তু মায়েদের কাছে গল্প শুনেছি, ঐ পাখি বাড়িতে এসে বসলে সে বাড়িতে অতিথি আসে। ইষ্টকুটুম পাখিটা কি আগেই ছোড়দিকে প্রকাশদার কথা জানাতে এসেছিল?

(শারদীয়া-১৩৯৫)

ছবি : সত্যজিৎ রায়

শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সুখচর পঞ্চমের ক্ষুদেদের অভিনয়

নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ

নলিনী দাশ

বড় মিস বিশ্বাসের ক্লাস, বিষয়বস্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ, তাতে আবার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ ঘনিয়েছে। প্রাণপণে হাই চেপে ছুটির ঘণ্টার প্রতীক্ষায় আছি। এমন সময়ে ডেস্কের তলা দিয়ে একখানা দলা-পাকানো কাগজ এসে আমার হাতে ঠেকল, —এমন চমকে গিয়েছিলাম যে আর একটু হলেই শব্দ করে ফেলতাম আর বকুনি খেতাম। পর-মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এ আমাদের 'গন্ডালু' দলের কোনো 'লু'-র কাজ! ও বাবা, মিস বিশ্বাস যে আমার দিকেই তাকাচ্ছেন! তাড়াতাড়ি ভালমানুষের মত মুখ করে পড়ায় মন দিলাম। ভয় আর কৌতূহলের মধ্যে দ্বন্দ্বে শেষে কৌতূহলেরই জয় হল, সাবধানে কোঁচকানো কাগজটা কোলের ওপর মেলে ধরলাম। ওমা! এযে দেখি পদ্য—মালুর কীর্তি নিশ্চয়!

স্কুলে ভর্তি হবার দিন কয়েক বাদেই মালু তার মাসির বাড়ি গিয়েছিল আর সেখান থেকে কালুকে পদ্যে চিঠি লিখেছিল :—

কালু ভাই, পেয়ে তোর পত্তোর
ভাবলাম 'দিতে হবে উত্তর'—
পেন নিয়ে বসে গেছি সত্বর,
চুল বেঁধে, করে সাজসজ্জা।।
হয় যদি কবিতাটা মন্দ
মিল ভাঙে, কেটে যায় ছন্দ,
তবু তোর হবে তো পছন্দ?
না হলেও নেই মোর লজ্জা।।

সেই থেকেই মালুর কবি-খ্যাতি সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের ক্লাসে উনিশটি মেয়ে ছিল বলে মালু সকলের নাম দিয়ে লম্বা একটি পদ্য লিখেছিল—'উনবিংশতি-রত্ন-কথা।'

'বিক্রমাদিত্যের সভাগৃহখানি
ন'টি রত্নের গুণে ভরেছিল জানি।
সংখ্যাটি আজি যদি বাড়ে, কিবা ক্ষতি?
রত্ন তো ন-টি নয়, উনবিংশতি
কলিকালে রাজসভা কোথা থেকে পাবে বলো?
ছোট ক্লাসরুম তারা করে থাকে আলো।

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে কয়েক ছত্র কবিতা লিখবার পরে নিজের বেলায় ফাঁকি দিয়েছিল—

'নিজ মুখে নিজ গুণ বলা নাহি যায়,
সরমেতে কালি মোর কলমে শুকায়।'

তারপর থেকে স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে, কাটা কুলগাছের শোকসভায় কি পরীক্ষার্থিনীদের সংবর্ধনায়, চাইতে না চাইতেই মালুর পদ্য প্রস্তুত!

মিস বিশ্বাসের চোখ এড়িয়ে কাগজটা ভাল করে দেখলাম—এ কি ব্যাপার আজ? এতো কেবল মালুর লেখা নয়—বাদলা হাওয়ায় সকলের মনেই কবিত্ব জেগেছে দেখি আজ!

প্রথমেই অবশ্য মালুর লেখা:—

'হে বোনেরা মোর
ঝরে আঁখি লোর,
কিবা গাব আজ কহ—
পচা পচা ক্লাস
করে বারো মাস
জীবন দুর্বিষহ!
তার চে অদ্য,
লিখিয়া পদ্য,
সারা পিরিয়ড ধরি,
নিখিল বঙ্গ
কবিতা সংঘ
আমরা স্থাপন করি।'

সমস্ত কাগজখানা জুড়ে নানারকম ছড়া। বড় বড় হরফে লেখা :—

'আমরা দুজন আছি দলে
কাজল এবং বীণা বলে।'

তারপরে লাল পেনসিলে লেখা—

'মোরা তোমাদের সংঘে
যোগ দেবে আজি রঙ্গে
লেখা যদি হল মন্দ
করবিনে তো ভাই দ্বন্দ্ব?'

তারপর প্রায় ডজনখানেক সই—ক্লাসের কোনো মেয়েই বাদ পড়েনি দেখছি! এককোণে বুলু ছোট ছোট করে লিখেছে—

'আমি তো নিশ্চয় আছি
সংঘ শুরু হলে বাঁচি!'

অন্য কোণে কার লেখা? নাম দেওয়া নেই, কিন্তু এ কালু না হয়েই যাবে না :

'আমি তো ভাই,
মিলটিল রেখে পদ্য লিখতেই চাই—
কিন্তু ছন্দ-টন্দ কিছু ঠিক থাকে না যে ছাই!
তা বলে দল থেকে আমাকে
একেবারে বাদ দিয়ে দিবি কি তাই?'

আর একটু হলেই হেসে ফেলেছিলাম। ও বাবা, মিস বিশ্বাস যে আমার দিকেই ঘনঘন তাকাচ্ছেন। নিশ্চয় সন্দেহ করছেন—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন নাকি? কি হবে, কিছুই তো শুনছিলাম না এতক্ষণ! বাঁচিয়ে দিল কালু। হাত তুলে সে নিজেই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। মিস বিশ্বাস তার দিকে তাকাতেই আমি চুপি চুপি লিখে ফেললাম—

'ক্লাসের মাঝারে কবিতা রচনা
সুবিধা কি ভাই হবে?
কোনদিন শেষে ধরা পড়ে যাব,
বকুনি খাব যে তবে!'

সন্তর্পণে লেখা কাগজটা আবার মালুর হাতেই ফেরত দিলাম। ঠিক তখনই ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা পড়ে গেল ঢং ঢং করে।

এই ভাবে ক্লাসের মধ্যেই আমাদের নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘের জন্ম হয়েছিল।

কাজ শুরু করতে গিয়ে কিন্তু দেখা গেল মহা মুশকিল! অধিবেশন করার উপযুক্ত সময় পাওয়াই দায়!

গন্ডালু-দলের—মানে আমরা চার বন্ধু মালু, কালু, বুলু আর আমি (টুলু)—উৎসাহ সব চেয়ে বেশি। কালুকে সভাপতি, বুলুকে তার সহকারী আর আমাকে কোষাধ্যক্ষ করে মালু নিজে হল সংঘ সম্পাদিকা। গালভরা নাম সব! কিন্তু সভা কই যে তার আবার সভাপতি? বাইরে থেকে যে মেয়েরা আসে, তারা তো ক্লাস শেষ হতে না হতেই বাড়ি চলে যায়। টিফিনের মাত্র আধ ঘণ্টা ছুটি, তখন টিফিন খাব, না কাব্যি করব? অবশেষে, বাইরের মেয়েরা ছেড়ে দিল, কেবল বোর্ডাররাই মেম্বার হল। 'কোষে' দু-দশ টাকা জমাও পড়ল। কিন্তু, সভা করব কখন?

মালু বলল, 'সাহিত্যচর্চা তো আর দশ পনের মিনিটে হুড়মুড়িয়ে সারা যায় না—অন্ততঃ ঘণ্টা দুই বসতে হবে সকলকে।'

বুলু বলল, 'তবেই হয়েছে! সকালে পড়া, বিকেলে খেলা, সন্ধ্যায় আবার পড়া, তারপরে খাওয়া আর ঘুম। দু ঘণ্টা সময় একসঙ্গে ফাঁক পাবে কখন শুনি?'

আমি বলতে গিয়েছিলাম 'রবিবার দুপুরে'—কিন্তু কথাটা শেষ না হতেই কাজল, ললিতা আর বিজলী আপত্তি করল, 'বা রে, রবিবার তো বাড়ি যাই আমরা—'

মালু বলল, 'তাহলে শনিবার বিকেলে—'

এবার আপত্তি তুলল বীণা, হাসি আর নন্দিতা, 'আমাদের যে গানের ক্লাস থাকে শনিবার বিকেলে!'

কালু রেগে বলল, 'তবে ক্ষ্যান্ত দে ক্ষ্যান্ত দে! নাচ শিখবি, গান শিখবি, বাড়ি যাবি আবার কাব্যিও করবি—অত শত পারা যাবে না!'

কাজল আর বীণাও চটে গেল, 'তবে অমন সভা চাই না, আমাদের নাম কেটে দে!'

তাড়াতাড়ি মিটমাট করবার চেষ্টা করল মালু। 'মাথা গরম করিস না—থাম্—ভেবেচিন্তে সকলের সুবিধামতন সময় ঠিক কর।'

'ভেবে ভেবে তো হদ্দ হলাম'—বিরসবদনে গাল ফুলিয়ে উত্তর দিল বুলু।

পশ্চিমের ডর্মিটরিতে সন্ধেবেলা বসে কথা হচ্ছিল। কদিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে। মাঠে-ঘাটে-রাস্তায় প্যাচপ্যাচে কাদা, কদিন ধরে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ, খেলা বন্ধ, রোজ-রোজ কেবল্ হল ঘরে ড্রিল হয়। সবাই অস্থির হয়ে উঠছি—মন মেজাজ খারাপ—'কি করি-কি করি' ভাব সকলের—'একটা নতুন কিছু চাই! একটা মজার কিছু চাই!'

'ইউরেকা!' চেঁচিয়ে উঠল কালু, 'আমাদের নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘের প্রথম অধিবেশন হোক রাত বারোটায়!'

'ও বাবা!'—'রাত বারোটা?'—'কোথায়?'—'কবে?'—'কি করে হবে?'—তাকে সবাই আমরা প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুললাম।

'ঝড়-বাদলের দিনে তো আর বাইরে করা যাবে না, আমার মনে হল খাবার ঘরেই সবচেয়ে ভালো হবে।'

'ধরা পড়ব না তো?'

'অত রাতে তো আর ওখানে কেউ থাকবে না। খুব সাবধানে পা-টিপেটিপে যেতে হবে—যেন কাক পক্ষীটিও টের না পায়, তাহলে ধরা পড়ব কেন?'

'খাবার ঘরে সভা হবে তার সঙ্গে একটা ভোজও জুড়ে দে না'—প্রস্তাব দিল হাসি।

'ঠিক ঠিক!'—'চমৎকার!'—সবাই সমর্থন জানাল।

'খুব চুপিচুপি সব ব্যবস্থা করতে হবে কেউ যেন টের না পায়!'

'যা ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিস—দুনিয়ার লোক তো এখনই সব জেনে গেল। দরজার বাইরে কে?'

'এই চুপ, চুপ—আস্তে কথা বল্—' সবাই উত্তেজনা সামলে নিল। বীণা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলে বলল, 'ও কেউ না, কেষ্টদাসী মণিকাদিদের ঘর ঝাঁট দিতে এসেছে—'

এরপরে আমাদের ফিসফিস করে পরিকল্পনা হল। কদিন ধরে সব কিছু কেমন যেন নীরস মনে হচ্ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সভার ব্যবস্থা হতেই যেন মন্ত্রবলে সকলের মন মেজাজ ভাল হয়ে গেল। একটা সাংঘাতিক গোপন উত্তেজনা, পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেই চোখ-টেপা আর চাপা হাসি। ক্লাসে পড়ায় অবশ্য সকলেই কেবল ভুল করতে লাগলাম আর বকুনিও খেলাম। কিন্তু কার সাধ্য যে আমাদের দমিয়ে দেয়।

বুলু দুই ক্লাসের ফাঁকে ফিসফিস করে বলল, 'আমার কিন্তু ভাই বড্ড ভয় করছে! মণিকাদির যেন কেমন রাগ-রাগ ভাব! তবে কি—'

নিজের মনের ভয় চেপে রেখে তাকে সাহস দিলাম, 'ভাগ, ভীতু কোথাকার! পড়া না পারলে তো রাগ করবেনই। দেখিস, এর পরের দিন ভাল করে পড়া শিখে এসে কত খুশি করে দেব।'

কালুর সব কাজই নিখুঁত। দুই ক্লাসের মধ্যে মধ্যে আমাদের কাছে ছোট ছোট একেকটা চিরকুট পাঠাতে লাগল—'সম্পাদিকার রিপোর্ট তৈরি আছে তো মালু?' —'বিস্কুট আনবার ভার তোর, মনে আছে হাসি?'—'পেয়ারা কিন্তু তোকে আনতে হবে বুলু।'—'পেয়ারা, বিস্কুট আর চিনেবাদাম কিনবার পয়সা বুলু, হাসি আর কাজলকে দিয়ে দিস টুলু।'

নিদারুণ উত্তেজনার দিন যেন আর কাটতে চায় না! দুপুর আর বিকেল হয় না, বিকালের পর সন্ধে হবার নাম নেই, তারপর রাত কিছুতেই হতে চায় না!

শেষে রাত যদিও হল, শোবার ঘণ্টাও পড়ল, 'কিছুতেই ঘুমোব না' পণ করে শুয়ে কখন যেন ঘুমিয়েও পড়লাম।

মাঝরাতে কালুর সাংকেতিক শিস শুনে ঘুম ভেঙে গেল—থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম প্রথমে—কি হবে?—কি যেন হবে?—ঠিক ঠিক, আমাদের কবিতা সংঘের প্রথম অভিবেশন হবে। মনে পড়তেই চট করে পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেলাম। বুলুটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, এক ধাক্কায় ওকে জাগিয়ে দিলাম। কোনোমতে জামাটা গায় দিলাম, চিরুনি খুঁজে পাচ্ছি না—যাকগে—মাঝরাতে কে আর আমার চুলের অবস্থা লক্ষ্য করতে যাচ্ছে! চুল না আঁচড়েই তৈরি হয়ে নিলাম।

ততক্ষণে মালু আর কালু গিয়ে পূর্বদিকের ডর্মিটরির মেয়েদেরও ডেকে নিয়ে এসেছে। খালি পায়ে অতি সাবধানে আমরা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে চললাম।

'কিঁচ'—সিঁড়ির দরজাটা সামান্য শব্দ করতেই কালুর চাপা ধমক—'আস্তে!'

কানে কানে বুলু বলল, 'ও বাবা—ভয় করছে!'

মাঝরাতে সব কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে। কাদের যেন নিঃশ্বাসের ফোঁসফাঁস, নড়াচড়ার খুসখাস আর কথা বলার ফিসফাস! দূর—সব নিশ্চয় আমাদের কল্পনা—মাঝরাতে আর কে কোথায় থাকবে? চারিদিকে নিস্তব্ধ, নিঝুম। কেবল দূরে একবার শেয়াল ডাকল।

মাঝরাতের ট্রেনটা চলে গেল। সকলের সামনে ছিল কালু। সাবধানে খাবার ঘরের দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল—পিছন পিছন হুড়মুড়িয়ে ঢুকলাম আমরা সকলে—আর ঢুকেই হকচকিয়ে থমকে দাঁড়ালাম!

সেদিনের হতভম্ব ভাব কি জীবনে কোনোদিন ভুলব? এ কি সত্যি না স্বপ্ন? ঘটনা না কল্পনা? মস্ত বড় খাবার ঘরখানা আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল—ঠিক স্কুলের

বার্ষিক উৎসবের সময় যেমন সাজানো হয়। মাঝের বড় টেবিলে শৌখিন সাদা ফুলকাটা চাদর পাতা ছিল। বড় বড় পিতলের ফুলদানিতে পদ্ম আর গোলাপ সাজানো ছিল। ভাল ভাল কাঁচের বাসনে অনেক খাবার সাজানো ছিল—আইসিং দেওয়া মস্ত বড় কেক, নানারকম সন্দেশ, আরো কি সব মিষ্টি, বড় বড় আপেল, মর্ত্তমান কলা। টেবিলের চারদিকে চেয়ার সাজানো ছিল, তারই একদিকে তাঁরা বসেছিলেন সবাই।

ভাল করে চোখ রগড়ে আমরা আবার তাকিয়ে দেখলাম—হ্যাঁ তাঁরাই তো—মণিকাদি, অণিমাদি, হিরণদি, এমন কি মিস বিশ্বাস পর্যন্ত। তাঁদের পরণে দামী দামী সিল্কের জামাকাপড়—যেন নেমন্তন্ন বাড়িতে বা বড় কোনো উৎসবে এসেছেন! তাঁরা মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমাদের স্তম্ভিত অবস্থাটা উপভোগ করছেন!!

আমরা ফ্যালফ্যাল করে পরস্পরের দিকে তাকালাম—চুলে তো কারোরই চিরুনি পড়েনি—, জামাকাপড় এলোমেলো, হুক বোতাম উল্টোপাল্টা লাগানো, হাসির ব্লাউজ উল্টো করে পরা আর কাজলের দুটো বেণীর একটা খুলে গেছে। সকলেরই মুখ শুকিয়ে আমসির মতন। নির্বিকারভাবে মণিকাদি মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক সময়েই এসেছ—' আমরা নিরুত্তর।

অণিমাদি ডেকে বললেন, 'এস—এস—দাঁড়িয়ে আছ কেন?' আমরা তো এক পাও নড়তে পাড়ছি না!!

ঘড়ি দেখে নিয়ে মণিকাদি কালুকে বললেন,— 'সভার কাজ শুরু করে দাও সভানেত্রী।'

ও বাবা, ওঁরা দেখি সব খবরই রাখেন!!!

এর পরে আর দেরি করা চলে না, কোনো মতে বসে পড়লাম। বুলু ফিসফিস করে বলল, 'আমার হাতে যে পেয়ারার থলি, কি হবে!'

আমি ততক্ষণে চিনেবাদামের ঠোঙা মাটিতে ফেলে দিয়েছি।

অণিমাদি আবার বললেন, 'মেয়েরা, খেতে শুরু কর।'

মণিকাদি বললেন 'সভা আরম্ভ হোক।'

এত ভাল ভাল খাবার, তাও যেন আমাদের গলা দিয়ে নামতে চায় না। আর এমন সপ্রতিভ ডানপিটে মেয়ে কালু, সেও অপ্রস্তুত ভাবে কাঁপা-গলায় শুরু করল—'ভদ্রমহিলা আর মহোদয়গণ!'

কে যেন ফিসফিস করে বলল, 'মহোদয় কেরে?' দু এক জনের চাপা-হাসি শোনা গেল।

মণিকাদি প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের সব কাজ কি কবিতায় হবে?'

কালু আবার শুরু করল,

'ভদ্রমহিলা আর মহোদয়গণ,
আসিনি করিতে আমি মিঠে আলাপন।
অকবি কাজের কথা বলে নেব আগে,
কবির কবিতা যাতে বেশি মিঠে লাগে।
আজিকার আলোচনা পরীক্ষার বিষয়,
কবিরা এবার বল যাহা মনে লয়।'

মণিকাদির হাততালির সঙ্গে আমরাও সকলে যোগ দিলাম।

হঠাৎ বুলুর হাতের পেয়ারার থলি কেটে গিয়ে ডজন খানেক ডাঁসা আর কাঁচা পেয়ারা মাটিতে ধপাধপ পড়ে চারিদিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, কিন্তু আমরা কিছুই শুনিনি-কিছুই জানি না মুখ করে রয়েছি। তারপর কাজলের পালা—

'দিদিমণি শোন, ছাত্রীর আবদার শোন,
পরীক্ষা পাশ করি যেন, আর মোর সাধ নেই কোন।
আমরা চেঁচাব যত খুশি
ক্লাসে যদি না যাই, না যাব,
হেসে দেব অকারণে হাসি,
কোনোদিন বই নাহি ছোঁব।
তবু যদি পরীক্ষা হয়,
পাশ করে দিও নিশ্চয়।'

আবার চটাপট হাততালির পালা। ততক্ষণে মেয়েদের উৎসাহ আর সাহস বেড়েছে।

দুরু দুরু বক্ষে আমি শুরু করলাম এবার—

'পরীক্ষা যদি কিছু না থাকিত আর,
সবগুলো বার যদি হত রবিবার,
গল্পের বই যদি সব বই হত,
হতেন খেলার সাথী শিক্ষিকা যত,
স্কুল বা কলেজ কিছু না থাকিত দেশে
তাহলে কি মজা হত, ভাবি বসে বসে!'

বীণার কবিতার—দু লাইন কেবল মনে আছে—

'দয়া করে তুমি হে Examiner

আমাকে পাশ করিও,
ভুল করে যদি ভুল লিখে ফেলি
নম্বর তবু দিও।'

বুলু কবির ওপর কেরদানি করে প্যারডি লিখেছিল—

'রেখো গো আমারে মনে, এ মিনতি করি পদে।
পরীক্ষা করিতে পাশ
গলে যদি লাগে ফাঁস
ভুলিয়া যেও না মোরে স্ফীত হয়ে গর্বপদে!'.....

সভার কাজ চলতে লাগলো। প্রথমে ভয়ে ভয়ে শুরু করলেও, দিদিদের উৎসাহে সাহস পেয়ে একে একে সব কটি মেয়ে কবিতা পড়ে ফেলল। কবিতা পড়তে পড়তে কখন যে অতগুলো ভাল ভাল খাবার খেয়ে শেষ করে ফেললাম, নিজেরাই বুঝতে পারলাম না—মাঝরাতে যে অত খিদে পেতে পারে কে জানত!

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে দু-দুলাইন কবিতা সহ সম্পাদিকার রিপোর্ট দিয়ে শেষ হল :

'নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ নতুনই হয়েছে সৃষ্টি।
এর মধ্যেই করেছে সবার আর্কষণ সে দৃষ্টি!
খুবই ভাল লোক যিনি প্রেসিডেন্ট, কাকলি চক্রবর্তী
মুখটি যেমন সদা হাসিমাখা, মনটিও স্নেহে ভর্তি
সহকারী তাঁর বুলুবুলী সেন, বলব কি বেশি আর,
রূপে, গুণে, কাজে কোনো ত্রুটি নাই, মানুষ, চমৎকার
ট্রেজারার যিনি লোক বড় ভাল, নাম তাঁর টুলু বোস।
রূপেও যেমন, কাজেও তেমন, নাই তাঁর কোনো দোষ।
মন্দ নেহাৎ নন সেক্রেটারি মালবি' মজুমদার
(নিজমুখে নিজ গুণগান করা শোভা পায় না তাঁর)
মেম্বার যাঁরা আছেন তাঁদের একে একে দিই লিষ্টি
মোটের ওপর সকলেই তাঁরা লোক অতিশয় মিষ্টি।'

সভানেত্রীর অনুমতি নিয়ে অণিমাদি উঠে দাঁড়িয়ে টিচারদের পক্ষ থেকে কবিতা-সংঘকে অভিনন্দন জানালেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন মণিকাদি—ও বাবা, বকবেন নাকি? আমরা ভয়ে ভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

মণিকাদি শুধু বললেন—'আজকের সভা এখানেই শেষ হোক—যাও, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড় দেখি।'

আর কি আমরা দাঁড়াই সেখানে?

এরপর কয়েকদিন আমাদের কি যে ভয়ে ভয়ে কাটল কি বলব! কিভাবে আমাদের গোপন সভার কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল সেটা আজ পর্যন্ত জানি না। হয়তো কেষ্টদাসী আড়ি পেতে শুনে দিদিদের বলে দিয়েছিল; কিন্তু হয়তো অণিমাদি পাশের বারান্ডা দিয়ে যেতে যেতে আমাদের কথা শুনে ফেলেছিলেন—প্রথমে আমরা যা চেঁচাচ্ছিলাম!

আমাদের বিস্কুট-পেয়ারা চিনেবাদামের কি গতি হয়েছিল তাও জানতে পারিনি। আমরা তো সেগুলি খাবার ঘরের মেঝেতেই ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম। হয়তো কেষ্টদাসী, পাঁচির মা, ওদের ছেলেপিলেরা তুলে নিয়ে থাকবে। আমাদের কি আর সে সব ভাববার অবসর ছিল? কখন টিচারদের ঘরে ডাক পড়বে, কত না জানি বকুনি খেতে হবে,—তার জন্যই আমরা দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিলাম। কি না জানি শাস্তি পাব সেই ভয়তেই আমরা তখন অস্থির!

টিচারদের ঘরে ডাক অবশ্য পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্তি দূরে থাক, বকুনিও খেলাম না। মাঝরাতের সভার নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করলেন না। কেবল আলোচনা হল সাহিত্য সভার উপযুক্ত সময় কিভাবে পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক হল যে এর পরের সপ্তাহ থেকেই সোম-মঙ্গল-বুধ এবং বৃহস্পতিবারে সকাল-সন্ধ্যা পড়ার ঘণ্টা পনের মিনিট করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর তার পরিবর্তে শুক্রবার সন্ধেবেলা পড়ার ঘণ্টা থাকবে না, তখন মেয়েদের সাহিত্যসভা, গানের আসর বা অভিনয়-জাতীয় কোনো কিছু হবে।

আবার অণিমাদি আমাদের লেখাগুলির প্রশংসা করলেন, আমরা যেন লেখার অভ্যাস না ছাড়ি একথা বারবার বললেন।

মণিকাদি মন্তব্য করলেন, 'অবশ্য, সব সময়েই পরীক্ষা-বিরোধী কবিতা লিখো না।'

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ফিসফিস করে কালু বলল, 'আমাদের দিদিদের মতন ভাল টিচার কি কোনো স্কুলে আছেন?'

উৎসাহ উজ্জ্বল মুখে মালু বলল, 'তাঁদের মুখ রাখতে হবে। সাহিত্য সভাকে ভাল করে গড়ে তুলতে হবে।'

সত্যিই আজকাল আমাদের সাহিত্য সংঘ যা জমজমাট হয়েছে কি বলব। সপ্তাহে সপ্তাহে অধিবেশন হয়, একটা হাতে লেখা পত্রিকাও বেরিয়েছে। ক্লাসের সব মেয়েরা যোগ দিয়েছে। সকলেরই লেখার আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে—তবে, বিশেষ করে গন্ডালু দলের!

(চৈত্র, ১৩৭০)

RABINDRACHITRAVALI

Paintings of Rabindranath Tagore

যে বই
ঘরে না থাকলে
আপনার রবীন্দ্র-সংগ্রহ অসম্পূর্ণ

সারা বিশ্বে প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ২০০০-এর বেশি ছবি
নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশিত সর্বকালের সেরা বই

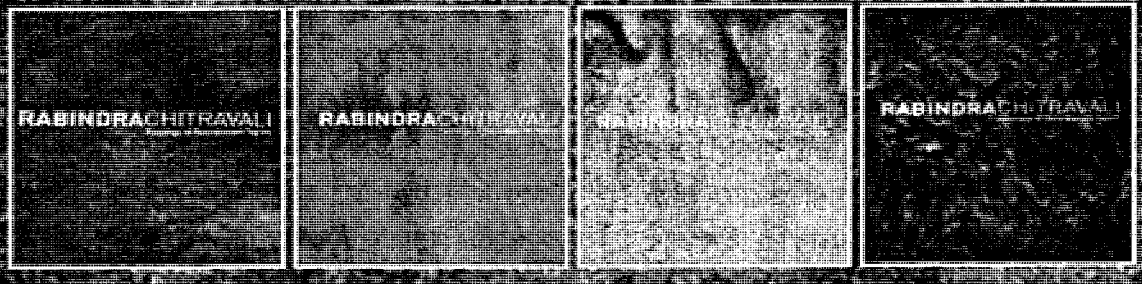

বইমেলার আগে বিশেষ ছাড়
২টি স্লিভ বক্সে চারটি খণ্ড + ১টি ক্যাটালগ ২০০০০ টাকা দাম
১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত ৮০০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে

প্রতিক্ষণ

নভেম্বরের শেষাশেষি।

বেটুদা বুধবার অফিস থেকে ফিরলেন। প্যান্ট-সার্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে হাত-মুখ ধুয়ে, চা জলখাবার খেলেন। তারপর শোয়ার ঘরের খাটের নিচ থেকে খবরের কাগজে জড়ানো ক্রিকেট বুট দুটো টেনে বার করলেন।

এখনো বলতে আসে নি কেউ, তবে কানে এসেছে সামনের রোববার খেলা। বলবে ঠিকই। যদি হয়—সীজন-এর প্রথম ম্যাচ—একটু ফিটফাট হযে মাঠে নামা উচিত।

মিনিট পনেরো বাদে বেটুদার স্ত্রী মিনু বৌদি শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলেন, মেঝেতে বাবু হয়ে বসে বেটুদা। তাঁর বাঁ হাতে একখানা ক্রিকেট বুট। ডান হাতে ভেজা ন্যাকড়া। সামনের বাটিতে চকখড়ি গোলা। একমনে বুটে রং লাগাচ্ছেন।

বৌদি থমকে দাঁড়ালেন। বললেন— 'কি ব্যাপার?'

বেটুদা একটু থতমত খেয়ে মুখ তুলে বোকা বোকা হেসে বললেন, 'না মানে বড্ড ময়লা হয়েছিল।'

'বুঝেচি। এ বছরেও আবার। গেল বছর না শপথ করলে, আর নয় এই শেষ।'

'না না এখনো আসেনি কেউ ইনফর্ম করতে। আমি কোনও কথাই দিই নি।'

'দেবার জন্য তো তৈরি হয়ে বসে আছ। ডাকলেই ছুটবে। ঠিক আছে আমিও দেখে নেব।' দুম দুম করে মেঝে ঝাঁপিয়ে বৌদি সরবে বেরিয়ে গেলেন।

মনটা খিঁচড়ে গেল বেটুদার। ডান পায়ের বুটের ভোঁতা নাকটা সবে মাত্র কালি ফিরিয়ে ধবধবে হয়েছে। 'ধুততেরি'—বুট দুটো ছুঁড়ে দিলেন খাটের তলায়। খড়িগোলা জল দিলেন ফেলে। তারপর বারান্দায় গিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে।

মিনুবৌদির দোষ নেই। এর আগে পর পর দু-বছর বেটুদা প্রতিজ্ঞা করেও কথা রাখেনি। এটা থার্ড ইয়ার। দু-দুবার সীজন শেষে বেটুদা বাড়িতে ঘোষণা করেছেন—ব্যাস আর নয়। এবার রিটায়ার করব। কিন্তু ফের পরের শীতে খেলতে নেমেছেন।

বেটুদা ক্রিকেট পাগল। ক্রিকেট খেলতে ডাকলে আর থাকতে পারেন না। তেমন উঁচু দরের খেলোয়াড় হতে পারেননি। নিজের স্কুল এবং কলেজের হয়ে খেলেছিলেন

ক্রিকেট। কিছুদিন ময়দানে ঘোরাফেরা করেছিলেন বড় টীমে খেলা আশায়। সুবিধে হয়নি। একটা ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে খেলেছিলেন বটে দুবছর। তবে সীজন-এর অর্ধেকই বসিয়ে রাখত। সে এক যন্ত্রণা। অতঃপর উচ্চাশা ত্যাগ করে সাউথ-ক্যালকাটায় নিজের পাড়ার ক্লাব ইয়াং বেংগল স্পোটিংয়েই বরাবর খেলে আসছেন। ইয়াং বেংগল খেলে সেকেন্ড ডিভিশনে।

বড় প্লেয়ার হতে না পারার জন্য বেটুদার দুঃখ নেই। ক্রিকেট খেলেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু না, এবার একটা ফাইন্যাল ডিসিশন নিতেই হবে।

বেটুদার বয়স চৌত্রিশ বছর। সেটা ব্যাপারই নয়। বডি পারফেক্টলি ফিট্। গত বছরেও বেশ ভাল ফর্মে খেলেছেন। আসল ঝঞ্ঝাট বেধেছে সংসার নিয়ে। বাড়িতে তিনি একা পুরুষ। আর আছে স্ত্রী, মা এবং চার বছরের ছেলে বিল্টু। বিয়ে হয়েছে সাত বছর। প্রথম প্রথম মিনুবৌদি বেটুদার ক্রিকেট প্রীতি মেনে নিলেও ক্রমেই বেঁকে বসেছেন। কারণ ক্রিকেট সীজন পড়লেই ডিসেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল অবধি বেটুদাকে ছুটির দিনে কোনও কাজে পাওয়া যায় না।

বেটুদার ক্রিকেট নিয়ে বাড়িতে অভিযোগ সবারই। মিনুবৌদি বলেন—'শীত বসন্তই হচ্ছে বেড়াবার টাইম। শ্যামবাজার, মানিকতলা, সল্টলেক, বজবজ, সুখচর, বদ্যিবাটি ধারে কাছে আমাদের কত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব। কোথাও আমার যাওয়া হয় না। কি না মশায়ের ব্যাট-বল খেলা আছে। নেহাৎ ওরা যদি কেউ নিয়ে যায় দয়া করে। এই ভিড়ের বাসে ট্রেনে কি আমি একা একা ছেলে নিয়ে যাওয়া আসা করতে পারি।'

'গত বছর ডিসেম্বরে তোমার মামাতো ভাই শিবুর বিয়ে হল। দিন ফেলল রোববার। যাতে আত্মীয়রা সবাই সকাল সকাল আসতে পারে। আর তুমি কি না খেলা সেরে আমাদের নিয়ে হাজির হলে সন্ধ্যে ছটায়। লজ্জার একশেষ। আমোদটাই মাটি হল।'

'শীতকালে ছুটির দিনে মার্কেটে গিয়ে একটু দেখে শুনে কেনাকাটা করার উপায় নেই। কে নিয়ে যাবে?'

বিল্টুর অভিযোগ—গত শীতে বাবলু খুব চিড়িয়াখানা দেখেছে। গোটা দিন ধরে, ওর বাবা-মা নিয়ে গিছল। আর আমায় কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। বাবাকে এত করে ধরলাম, কিছুতেই নিয়ে গেল না। বলল, পরের শীতে ঠিক নিয়ে যাব।

পরপর দু-বছর ধরে মা বলছেন—জয়দেব কেঁদুলির মেলা দেখতে নিয়ে যাব পৌষ সংক্রান্তিতে। সংক্রান্তির দিন অজয় নদীতে স্নান ভারি পুণ্য কাজ। কি চমৎকার বাউল গান হয় মেলায়। বোলপুরে উঠব রাজুদার বাড়িতে। ওরা বারবার লিখছে আসতে। ওরাই দেখবার ঘোরবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। বক্রেশ্বরের গরম জলের কুণ্ডে চান করব। আমার বাতের ব্যাথার উপকার হবে। তুই শুধু আমায় পৌঁছে দিয়ে আয়—পরের হপ্তায় নিয়ে আসবিষ

কিন্তু ওই সময় ক্রিকেটের ফুল সীজন। ছুটির দিনে ম্যাচ। অন্যদিন সকালে জোর নেট প্র্যাক্টিস। সময় কই? বেটুদা তাই এড়িয়ে গেছেন—'এবার নয় পরের বছর।'

মা আক্ষেপ করেন, 'আর আমার যাওয়া হয়েছে।'

বেটুদা মানেন যে তিনজনের অভিযোগই খাঁটি। আত্মীয়স্বজন, শ্বশুর বাড়ির লোক, দূরের বন্ধুবান্ধব বিরক্ত। ডিসেম্বর টু মার্চ-এপ্রিল বেটুদার পাত্তা পাওয়া যায় না ছুটির দিন এলে—নিজে যাওয়া তো দূরে থাক। মনকে শক্ত করলেন বেটুদা। বুট জোড়া দিয়ে দেব তপনকে। ছেলেটা খাসা ব্যাট করে। ফিউচার আছে। বুট কিনতে পারে না। ফুটো কেড্স পরে খেলে। তবে কাউন্টি-ক্যাপটা রেখে দেব। হয়তো একদিন বিল্টু পরে মাঠে নামবে। বিল্টুকে নিজে হাতে ধরে খেলা শেখাব—এমনি কত কি ভাবনা আসে। হঠাৎ হাঁক শোনা গেল 'বেটুদা। ও বেটুদা। বেটুদা আছেন?' সার্টটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বেটুদা সদর দরজা খুলে বললেন, 'ও হাবুল।'

হাবলু তড়বড়িয়ে বলল, 'বেটুদা রোববার খেলা। বান্ধব সংঘের সঙ্গে। মন্টুদা বলে পাঠাল। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। বান্ধবের গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নটায়। আপনি ঠিক যাবেন।' বেটুদা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়লেন, 'নারে পারব না। বলে দিস।'

'না না খেলতেই হবে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বলে লাইটলি নেবেন না, মন্টুদা বলেছে। পরের হপ্তা থেকে লীগ ম্যাচ শুরু। আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ নেই। তাছাড়া বান্ধব গতবার আমাদের হারিয়েছিল। এবার বদলা চাই।' হাবুল বোঝায়।

গম্ভীর বিষন্ন মুখে আবার মাথা দোলায় বেটুদা, 'নারে, লীগ, ফ্রেন্ডলি কোনও ম্যাচই আর খেলব না। মন্টুকে বলে দিস, আমি রিটায়ার করেছি।'

হাবুল থ হয়ে খানিক চেয়ে থেকে বলল, 'কেন?'

'অসুবিধা হচ্ছে। বাড়িতে কাজ থাকে ছুটির দিনে।'

'কি কাজ?' হাবুলের বাড়িতে গাদা লোক। সে দেখে, বাবা কাকারা ছুটির দিনে বাইরে বাইরে থাকলেই বাড়ির মেয়েরা খুশি। কারণ ঘরে থাকলেই বারবার চা এবং নানান ফরমাস।

কি কি কাজের জন্য অসুবিধা তার লিস্টি দিতে যাচ্ছিলেন বেটুদা, হঠাৎ খেয়াল হল স্ত্রী হয়তো পাশের ঘরে কান খাড়া করে আছে। তাই সামলে গিয়ে বললেন, 'সে অনেক কাজ। আমি একা। মন্টুকে বলে দিস।'

হাবুল চলে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে এল ক্যাপ্টেন মন্টু স্বয়ং—'বেটুদা, কী ব্যাপার? খেলবেন না কেন?' বেটুদা বললেন, 'ভাই, রিটায়ার করলাম। অনেকদিন তো খেলছি।'

'তবে যে দুদিন নেট প্র্যাকটিস করলেন?'

বেটুদা লুকিয়ে দুদিন নেট প্র্যাকটিস করেছেন অন্যের কেড্‌স ধার করে। বাড়িতে জানে ননা। চট করে ঘরের দিকে একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেটুদা বললেন, 'ও এমনি। বডি ফিট রাখতে। এবার নতুনদের চান্স করে দিই। সীনিয়ারা সরে দাঁড়াই।'

মন্টু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত স্বরে বলল, 'নতুনরা নিজের জোরে চান্স পেতে হয় পাবে। আপনি ক্লাবের কথাটা একটু ভাবুন। আচ্ছা হাবুল বলছিল, আপনার বাড়ির কাজে কি সব অসুবিধা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। কাজটাজ থাকে। গোটা ক্রিকেট সীজনে ছুটির দিনগুলো বরবাদ হয়ে যায়।'

'কি কাজ?'

'সে অনেক। তোমরা বুঝবে না।'

মন্টু সত্যিই বোঝে না, সে এখনো বিয়ে থা করে নি। ঝাড়া হাত পা। চাকরি বাদে বাকি সময়টুকু খেলা নিয়েই মেতে থাকে। মন্টু বোঝায়, 'কেসটা আর একবার কনসিডার করুন বেটুদা।'

বেটুদা মাথা নাড়েন—'নাঃ'

হতাশ হয়ে চলে যায় মন্টু। পাছে ফের কেউ অনুরোধ জানাতে আসে, সেই ভয়ে বেটুদা বাজারের থলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বাজার সেরে ফেরার পথে গলির মোড়ে বেটুদাকে ধরলেন শ্যামানন্দবাবু। শ্যামানন্দবাবু ওরফে শ্যামবাবু ইয়াং-বেংগলের ক্রিকেট সেক্রেটারি। নিজের বাড়ির বাইরে রকে তিনি ওৎ পেতে বসেছিলেন।

শ্যামবাবু মানুষটি ছোটখাটো শুকনো চেহারা। অন্য সময় ধুতি পাঞ্জাবী পরলেও ম্যাচের দিন মাঠে গেলে ক্রিকেটের মর্যাদা রাখতে ধারণ করেন ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট, সার্ট, একটা ছাই রঙা কোট এবং পায়ে কালো বুট জুতো। সব কটি জিনিসই আদ্যিকালের । ভদ্রলোক হাতে কলমে ক্রিকেট কদ্দুর খেলেছেন বলা মুশকিল। তবে ক্রিকেট জগতের সমস্ত খবর তাঁর কণ্ঠস্থ। তারই জোরে ক্লাবের ক্রিকেট সেক্রেটারির পোস্টটা প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছেন। শ্যামবাবু বললেন, 'এই যে বেটু কি শুনছি, তুমি নাকি খেলা ছেড়ে দিচ্ছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকদিন তো খেললাম।'

'তোমার বয়স কত হে?' শ্যামবাবু চোখ পাকান।

'আজ্ঞে চৌত্রিশ পুরেছি।'

'ওনলি থার্টিফোর। জ্যাক হবস-এর নাম শুনেছ? ইংল্যান্ডের ফেমাস ক্রিকেটার। হব্‌স কদ্দিন অবধি টেস্ট খেলেছিলেন জান? আটচল্লিশ। আপ টু ফট্টি এইট ইয়ারস।'

বেটুদা মাথা চুলকোন।

শ্যামবাবু বললেন, 'মন্টু কি সব বলছিল। তোমার নাকি বাড়ির কাজে ডিফিকাল্টি হচ্চে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গোটা সীজন, একটাও ছুটির দিনে সময় দিতে পারি না। বাড়িতে কত কাজ থাকে।'

'তাই নিয়ম,' দার্শনিক ভাবে ঘোষণা করলেন শ্যামবাবু 'দশের কাজ করলে ঘরের কাজে একটু টান পড়েই। এই আমাকেই দেখ না। ক্রিকেট সেক্রেটারি, দুগ্গা পূজো আর রবীন্দ্র জয়ন্তী কমিটির মেমবার—এত সব সামলাতে গিয়ে ঘরের কাজে কি আর অবহেলা হয় না? খুব হয়। উপায় কি? পাবলিক ডিমান্ড।'

বেটুদা ভাবলেন, শ্যামবাবুর বিপুলকায়া গৃহিণী সংসার সামলাতে একাই যথেষ্ট। চাকরি করা ছাড়া শ্যাম বাবুর সংসারে আর কি কাজ? তবে মুখে বললেন, 'তা বটে। কিন্তু'—

'আর একবার দেখ ভেবে। এ সেকেন্ড থট্।'

'আজ্ঞে মাপ করবেন। আমি স্থির করে ফেলেছি।' বেটুদা দৃঢ়চিত্ত।

বেটুদা বৃহস্পতিবার অফিস গেলেন। বাড়ি ফিরলেন। পাড়ায় ঢুকে ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন না। চা-টা খেয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে বসলেন। সকালে সময় পাননি ভাল করে পড়ার। প্রথম পৃষ্ঠাটা সবে শুরু করেছেন, বাইরে ডাক শোনা গেল—'বেটুদা আছেন?'

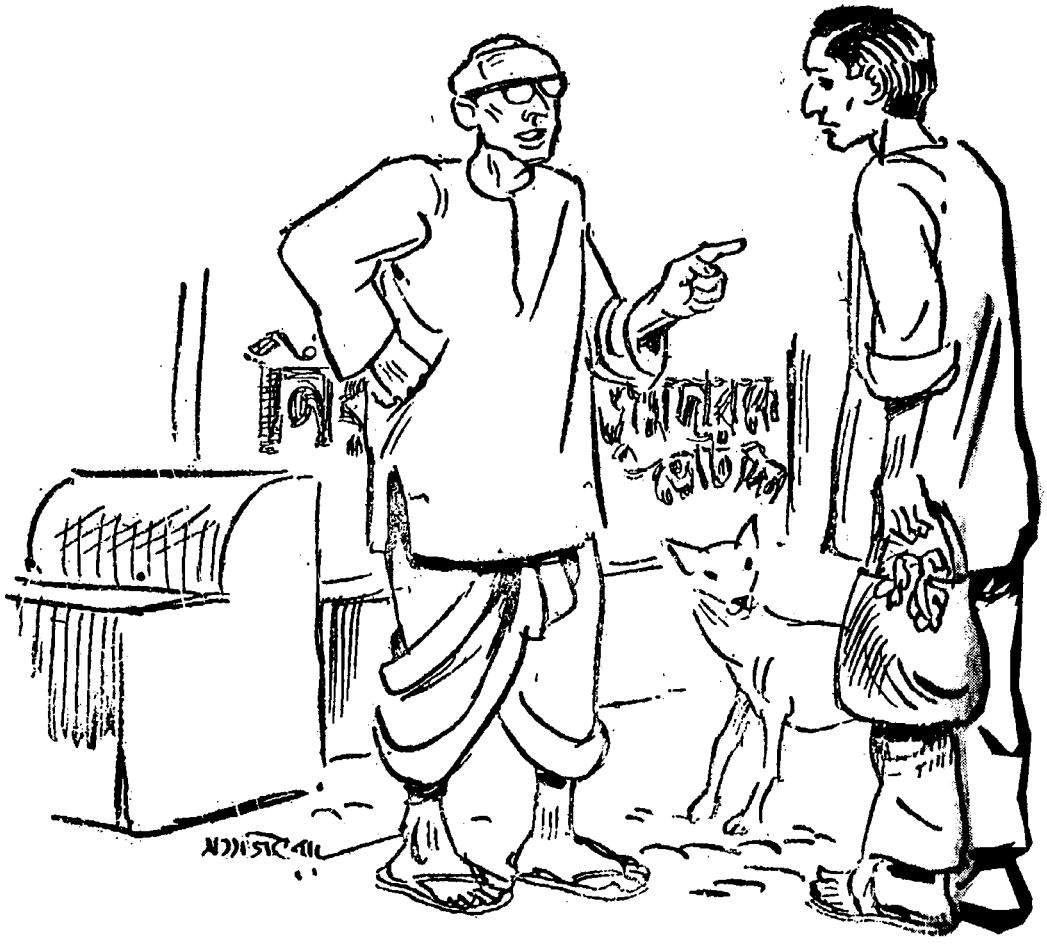

মন্টুর গলা। গম্ভীর মুখে বেটুদা দরজা খুললেন।

মন্টু ভজা এবং আরও দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে।

মন্টু বলল, 'বেটুদা, আমাদের কেসটা কিছু ভাবলেন?

বেটুদা ঘাড় নাড়লেন, 'বলেছি তো ভাই, আর খেলব না।'

'তাই হবে,' হাতের চেটো উল্টে হতাশ ভাবে বলল মন্টু, 'কিন্তু এই রোববার আপনাকে খেলতেই হবে। মানে ওটা হবে আপনার ফেয়ার ওয়েল ম্যাচ। আমরা এ্যারেঞ্জ করছি।'

'না না, ওসব কি দরকার?' বেটুদা আপত্তি তোলেন।

'কে বলল দরকার নেই? আলবৎ দরকার আছে,' ভজা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আপনি এদ্দিন সার্ভিস দিলেন আর ক্লাব আপনার জন্য এটুকু করবে না। আমরা সেক্রেটারি শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। উনি খুব এনকারেজ করেছেন। এই একটু সামান্য ঘটা। আমাদের সাধ্য মতো।'

মন্টু বলল, 'বান্ধবকে জানিয়ে দিয়েছি অকেশনটা। লাঞ্চটা যেন স্পেশাল দেয়। এবার ওদের লাঞ্চ দেওয়ার কথা। বাকি এ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের।'

বেটুদা অভিভূত হয়ে বললেন, 'বেশ তাই হবে। তোমরা বলছ যখন।'

মন্টুর দল ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। বেটুদা ক্রিকেট বুট জোড়া টেনে বের করে সযত্নে খড়ি লাগাতে বসলেন। শুক্র শনি নেটে যাবেন। একটু তৈরি হয়ে নামা ভাল। হাজার হোক ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। যা তা খেললে মান থাকবে না। গলা তুলে স্ত্রীর উদ্দেশে জানালেন, 'বলে গেল রবিবার খেলতেই হবে। সেদিন আমার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। ব্যাস্ দি এন্ড।'

ওপক্ষ থেকে কোনও সাড়াশব্দ এল না।

বেটুদা পাড়ায় বিশেষ ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। শুক্র শনি পাড়ায় বেরতেই নানান সম্ভাষণ জোটে—

'বেটুদা আপনি নাকি রিটায়ার করছেন? সত্যি এখনো

কিন্তু ফাস্টক্লাস ফর্মে ছিলেন।'

'কি হে বেটু, এবার নাকি খেলা ছাড়ছ? তা অনেক দিন চালালে বটে। ক্রেডিট আছে।'

পাড়ার গদাইদা আর বেটুদা সমবয়সী। একই সঙ্গে ক্রিকেট শুরু করেছিলেন। কিন্তু গদাইদা খেলা ছেড়েছেন পাঁচ বছর আগে।

দেখা হতেই গদাইদা বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশন বেটু। এ ওয়াইজ ডিসিশন। ঠিক সময় খেলা ছাড়া একটা মস্ত জাজমেন্ট। এই আমাকেই দেখ। এক্কেবারে কারেকট সময় রিটায়ার করেছি।'

ঘোড়ার ডিম করেছিস। মনে মনে ভাবলেন বেটুদা। ভুঁড়ি হয়ে গিছল। দৌড়তে পারতিস না। টিমে চান্স না পেয়ে বাধ্য হয়ে ছেড়েছিস। বেটার ভারি হিংসে। দেখা হলেই ফুট কাটত—'কিরে বেটু আর কদ্দিন চালাবি, শিং ভেঙে বাছুরের দলে?' এখন খুব খুশি।

যাহোক মুখে একটু হাসি টেনে বেটুদা বললেন 'মন্টুরা ছাড়ছিল না। কিন্তু বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। বাড়িতে আমি একা। কত কাজ। ছুটির দিনগুলো নষ্ট হয়।'

'কারেক্ট। আমরা এখন ফ্যামিলিম্যান। আমিও তো ঠিক এই জন্যেই ছাড়লুম।'

বেটুদা ভাবলেন, ফের গুল। বাড়িতে তুই কুটোটি নাড়িস না। স্রেফ খেয়ে ঘুমিয়ে দিন দিন মুটোচ্ছিস।

রবিবার। লেক মাঠে বান্ধব সংঘের গ্রাউন্ড। সকাল ন'টার মধ্যে দুই পক্ষই মাঠে হাজির। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় ম্যাচ শুরু হবে। দুদলই তিন ঘণ্টা করে ব্যাট করার সুযোগ পাবে। মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাঞ্চ ব্রেক। অবশ্য তিন ঘণ্টা ব্যাট করার আগেই কোনও দল অল-ডাউন হয়ে গেলে অন্য দল ব্যাট করতে নামবে। ঠিক হয়েছে যাদের মোট রান বেশি হবে তারাই জিতবে।

মাঠে বেশ ভিড়। প্রচুর দর্শক। বেটুদার পাড়ার অনেকে এসেছে, বান্ধবর সংঘেরও অনেক সভ্য। দুই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ইত্যাদি পদের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত। সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার নিচে সারি সারি ভাড়া-করা চেয়ার পাতা। একটা টেবিলও রয়েছে। তার ওপর একটা ঝকঝকে পিতলের ফুলদানি। এইখানেই খেলার পর ইয়াং-বেংগলের পক্ষ থেকে ফেয়ারওয়েল জানানো হবে বেটুদাকে। দু চারটে বক্তৃতা হবে! একটা প্রেজেনটেশনও নাকি দেওয়া হবে। ভজা খুব খাটছে। সে নিজে তেমন খেলে টেলে না। কিন্তু ইয়াং-বেংগলের সব চেয়ে উৎসাহী সভ্য। একটা হুজুগ পেলেই মেতে ওঠে।

ধোপদুরস্ত সাদা সার্টপ্যান্ট, ধবধবে বুট, নেভি-ব্লু ব্লেজার কোটে দারুণ স্মার্ট লাগছিল বেটুদাকে! ইয়াং বেংগলের অন্য প্লেয়াররাও আজ যথাসাধ্য ফিটফাট। শ্যামবাবুর জুতোয় তিন বছর বাদে পালিশ পড়েছে। বান্ধব সংঘের কয়েকজন হ্যান্ডসেক করে গেল বেটুদার সঙ্গে।

বান্ধবের ক্যাপ্টেন অভয় দত্ত বলল, 'বেটুদা আমি ছ'বছর খেলছি আপনার এগেনস্টে। এর পর মিস্ করব আপনাকে।'

বান্ধবের ক্রিকেট সেক্রেটারি শিবদাস মুখুজ্যে বললেন, 'বেটুবাবু ম্যাচ খেলা ছাড়ছেন বলে মাঠ ছাড়বেন না। বাচ্চাদের কোচিংএর ভার নিন। আমি বলি খেলার চেয়েও সেটা বড় কাজ।'

বেটুদা হাসি হাসি মুখে সবার হাতে হাত মেলাচ্ছেন। সবার কথা শুনছেন।

আম্পায়ার দু'জন মাঠে নামল, তারপর দুদলের দুই ক্যাপ্টেন। টস্ হল। বান্ধব টসে জিতে ব্যাটিং নিল। ইয়াং-বেংগলের ফিলডিং।

বোলিংয়ে বেটুদার বিশেষ সুনাম নেই। মোটামুটি অফস্পিন করতে পারেন। তবে লেন্থ থাকে না, তাই দু চার ওভারের বেশি বোলিং জোটে না। আজ কিন্তু বেটুদাকে দিয়ে অনেকক্ষণ বল করানো হল—ফেয়ারওয়েলের অনারে। আট ওভার বল করে একটা উইকেটও পেলেন। বেটুদাকে বল করতে ডাক দিতেই দর্শক হাততালি দিল। তার বলে একজন ক্যাচ আউট হতেই এমন হাততালি পড়ল যে বেটুদা নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

লাঞ্চ অবধি বান্ধব করল আট উইকেটে একশো বাহান্ন রান।

লাঞ্চের সময় বেটুদাকে মাঝখানে রেখে দু দলের প্লেয়াররা খেতে বসল। স্পেশাল গেস্ট হিসেবে বেটুদাকে জোর করে একটার বদলে দুটো কমলালেবু গছালেন বান্ধবের প্রেসিডেন্ট।

লাঞ্চের সময় বেটুদাকে মাঝখানে রেখে দু দলের

প্লেয়াররা খেতে বসল। স্পেশাল গেস্ট হিসেবে বেটুদাকে জোর করে একটার বদলে দুটো কমলালেবু গছালেন বান্ধবের প্রেসিডেন্ট।

লাঞ্চের পর ইয়াংবেংগল ব্যাট করতে নামল। পনেরো মিনিট বাদে তাদের প্রথম উইকেট পড়ল বারো রানে। এবার বেটুদার পালা।

পায়ে প্যাড, বাঁ বগলে ব্যাট, ডান হাতের মুঠোয় ধরা জোড়া ব্যাটিং গ্লাভস মাথায় গাঢ় লাল কাউন্টি ক্যাপ। একটু সামনে ঝুঁকে ভারিক্কি চালে হেঁটে বেটুদা মাঠে ঢুকতেই প্রবল হাততালি। বান্ধবসংঘের খেলোয়াড়রাও হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল বেটুদাকে।

বেটুদার মনটা হালকা। দুদিন ধরে নিজের খেলার প্রশংসা শুনতে শুনতে মনে বেশ আত্মবিশ্বাস। ইচ্ছে কয়েকটা স্ট্রোক দেখাই। একটা বড় স্কোর করতে পারলে চমৎকার হয়। মনে রাখবে লোকে। না করলেই বা কি? ডন ব্র্যাডম্যান তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে কত করেছিলেন? শূন্য। তাতে কি ব্র্যাডম্যানের খ্যাতি কিছু কমেছে? শুধু কি সেই স্কোরটাই মনে রেখেছে লোকে? তাঁর আগের খেলা ভুলে গেছে?

সতর্কভাবে গার্ড নিলেন বেটুদা। বল করছে বাদল সাহা। বেশ জোরে বল করে। বাদল ইচ্ছে করেই বলেই পেসটা একটু কমালো। ওভারের বাকি তিনটে বল করল অফস্টাম্পের খানিক বাইরে। যাতে বেটুদা চোখ সেট করকার সুযোগ পান। একটা ভদ্র গোছের রান পান বিদায় দিনে। বাদলের তৃতীয় বলে বেটুদা খাসা একখানা স্কোয়ারকাট্ মারলেন। সোজা চার। খুব হাততালি পড়ল।

দেখতে দেখতে বেটুদার স্কোর এগিয়ে চলে। বেটুদার স্কোর কুড়ি না পেরনো অবধি বান্ধবের প্লেয়াররা তাঁকে আউট করার মোটেই চেষ্টা করে নি। বরং নেহাত সাদামাটা বলই দিয়েছে। কিন্তু এরপর তারা শঙ্কিত হল। এ ব্যাপার চললে যে বান্ধব হারবে। হোক একজিবিশন ম্যাচ তাবলে ইয়াং-বেংগলের কাছে হারা চলে না। প্রেস্টিজ যাবে। বেটুদাকে ফেরত পাঠানো দরকার। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করে।

কিন্তু তখন বেটুদাকে রোখে কার সাধ্যি। জড়তা কেটে গেছে। ওইটাই বেটুদার দুর্বলতা। প্রথম দিকে বড্ড নার্ভাস থাকেন। ফলে প্রায়ই টপ্ করে আউট হয়ে যান। এখন হাত খুলে মারছেন। সামান্য লুজ বল পেলেই পিটুনি। একখানা ছয়ও হাঁকড়ালেন।

উল্লাসে ফেটে পড়ছে দর্শকরা। হাততালির ঝড় বইছে। বান্ধবের প্লেয়াররাও তারিফ জানাতে বাধ্য হয় বেটুদাকে। পঞ্চাশে পৌঁছে বেটুদা একটা চান্স দিলেন। তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে বল বুক সমান উঁচু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ফার্স্ট এবং সেকেন্ড স্লিপের মধ্য দিয়ে—বেশ জোরে। ফার্স্ট স্লিপ্ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্যাচটা রাখতে পারল না হাতে। বেটুদা তাতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না। যথারীতি খেলে চললেন। ইতিমধ্যে তিনবার পার্টনার বদলেছেন বেটুদা। অর্থাৎ ইয়াং-বেংগলের আরও তিনটে উইকেট পড়েছে। তবে বেটুদা অবিচল।

ইয়াং-বেংগলের পঞ্চম উইকেট পড়ল। এবার বেটুদা আউট—এল.বি. ডবলু। স্কোর বোর্ড দেখাল, লাস্ট ব্যাটসম্যান—৭৮। মোট রান তখন একশো সাঁইতিরিশ। আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে হাতে। অর্থাৎ ম্যাচ ইয়াং-বেংগলের হাতের মুঠোয়।

বেটুদা দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরে চললেন। তিনি উইকেট থেকে বাউন্ডারি লাইনে পৌঁছন অবধি বেজে চলল করতালি। টুপিতে হাত রেখে বেটুদা এই অভিনন্দনের উত্তর জানান। মাঠের বাইরে আসতেই আরও একদফা করমর্দন ও অভিনন্দন। প্যাড-ট্যাড খুলে রেখে এসে বেটুদা চেয়ারে বসে হাসি হাসি মুখে খেলা দেখতে লাগলেন। আর মাত্র দু ওভারে ষোল রান তুলে ফেলে ইয়াং-বেংগল ম্যাচ জিতে গেল।

খেলা শেষ হবার পর আধঘন্টা কেটে গেছে। বেটুদা বসে বসে গল্প করছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, তাঁর কাছাকাছি ইয়াং বেংগলের কেউ নেই। পাশে যারা রয়েছে সবাই বান্ধব সংঘের লোক। তিনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখেন, কিছু দূরে মন্টু, ভজা, শ্যামানন্দ বাবু এবং ইয়াং বেংগলের আরও সাত-আটজনের জটলা। হাতটাত নেড়ে ওরা কুব কথা বলছে।

বেটুদা ভাবলেন, নিশ্চয়ই আমার বিদায় সভা নিয়ে আলোচনা চলছে। আর দেরি না করে লাগিয়ে দিক। সভার পর চা-টা আছে। কতক্ষণ বক্তৃতা চলবে কে জানে? খিদে পেয়ে গেছে।

মিনিট পাঁচ বাদে মন্টু এসে ডাকল, 'বেটুদা একবার আসবেন। এই দিকে। একটু দরকার।'

বেটুদাকে নিয়ে মন্টু ইয়াং বেংগলের সেই জটলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি সবাই তাদের ঘিরে ধরল। মন্টু ঘুরে

দাঁড়িয়ে অতি বিনীতভাবে বলল, 'বেটুদা আমাদের একটা রিকোয়েস্ট মানে দাবিও বলতে পারেন, আপনার এখন রিটায়ার করা চলবে না।'

'মানে!' বেটুদা থ।

'মানে এবার আমাদের লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার খুব চান্স। আপনি না খেললে হবে না।'

'তোমরা যদ্দিন না চ্যাম্পিয়ান হবে তদ্দিন আমায় খেলে যেতে হবে? বলছ কি!' বেটুদা উত্তেজিত।

'না না তা বলছি না, কেবল এই সীজনটা। আর একটা বছর। প্লীজ।'

শ্যামবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'রাইট। বী রিজনেবল বেটুদা তোমার আর কি বা বয়স—ওনলি থার্টিফোর। মনে রেখ গ্রেট জ্যাক হবস্—'

'না না তা হয় না। লোকে কি ভাববে? এনাউন্স করে ফেলেছি। ফেয়ারওয়েল ম্যাচ অবধি হয়ে গেল।'

বেটুদার আর্তনাদকে থামিয়ে দিলেন শ্যামবাবু, 'কিস্সু ভাববে না। আমরা আবার এনাউন্স করে দিচ্ছি—তোমার রিটায়ারমেন্ট পোস্টপোন্ড। সামনের বছর ফের তোমার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ হবে। প্রেজেনটেশনটা তো রইলই। ইতিহাসে এমন ঢের হয়েছে।'

'লোকে যে হাসবে, বেটুদা খুঁত খুঁত করেন।

'তা বটে,' বেটুদাকে ক্ষীণ সমর্থন জানায় গদাইদা। এই একমাত্র সমর্থন পেলেন বেটুদা।

ভজা আস্তিন গুটিয়ে বলল, 'কোন বাপের বেটা হাসবে শুনি? দাঁত ছটকে দেব না। হাসবে নয় বেটুদা, কাঁদবে। আপনি এই সীজনে খেলছেন শুনলে ওই বান্ধবের চোখেই জল এসে যাবে। ভাবছিল আপনি না খেললে ওদের খুব মওকা। নির্ঘাৎ চ্যাম্পিয়ানসিপটা মেরে দেবে।'

'তা বটে।' গতিক বুঝে তৎক্ষনাৎ মত পালটালেন গদাইদা।

'তাছাড়া আমার যে আরও অনেক অসুবিধে। বাড়িতে কত কাজ। গোটা সীজন কিচ্ছু করতে পারি না।' বেটুদা প্রাণপণে বোঝান।

'দশের কাজ করলে ঘরের কাজে একটু টান পড়ে। আচ্ছা শুনি কি কি কাজ? তারপর না হয় ঠিক করা যাবে,' বললেন শ্যামবাবু।

'হ্যাঁ হ্যাঁ'—সবাই সায় দেয়।

বেটুদা মন্টুর দিকে তাকিয়ে রেগে বললেন, 'গোটা ক্রিকেট সীজন তোমাদের বৌদির কোথাও বেড়ানো হয় না। মারকেটিং হয় না। বজবজ সুখচর বদ্যিবাটি—কত জায়গায় তার যাবার সাধ। ছুটির দিন মানেই আমার খেলা। কে নিয়ে যাবে?'

'আমরা' উত্তর দিল ভজা, 'ননপ্লেয়িং মেমবাররা পালা করে ডিউটি দেব। বৌদিকে সব জায়গায় ঘুরিয়ে আনব। বজবজ বদ্যিবাটি কি? দিল্লী বোম্বে হলেও কুছপরোয়া নেই।'

'নেকস্ট?' শ্যামবাবুর গলা।

'বিল্টুকে চিড়িয়াখানা দেখাব বলেছি এই শীতে। সারাদিন কাটাবে। তার কি হবে?'

'যাবে আলবৎ যাবে। এই হাবুল এটা তোর ডিউটি। আসচে রোববারই প্রোগ্রাম কর। তোর ভাইপো দুটিকেও সঙ্গে নিবি। বিল্টুর ফ্রেন্ড।' সমাধান দিল ভজা।

শ্যামবাবু বললেন—'নেক্সট।'

'আর তোমাদের মাসীমা মানে আমার মাকে বোলপুর নিয়ে যাবে কে? জয়দেবের মেলা দেকবেন। দিয়ে আসতে এবং নিয়ে আসতে হবে।'

'আমি,' নিজের বুকে টোকা মেরে জানাল ভজা, 'বোলপুরের কাছেই শান্তিনিকেতনে আমার এক দাদা থাকে। ওসব রুট আমার চেনা।'

বেটুদার মুখে আর কথা সরে না।

'ব্যাস্, প্রবলেম সলভড্।' শ্যামবাবুর মন্তব্য।

'না না মন্টু, আগে আমার বাড়ি থেকে পারমিশন নিয়ে এস। তোমাদের বৌদিকে রাজি করাও। তবে ফাইনাল কথা দেব।' বেটুদা শেষ চেষ্টা করেন।

'ভজা মন্টু কুইক,' তাড়া দিলেন শ্যামবাবু, 'চট করে একটা, ট্যাকিস ধরে চলে যা। তোরা ফিরে এলেই টি-পার্টি শুরু হবে।'

আধঘন্টার মধ্যেই মন্টুরা ফিরে এল। মুখে একগাল হাসি। অর্থাৎ বেটুদার ফেয়ারওয়েল এ বছর হচ্ছে না।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

(শারদীয়া-১৩৯০)

গ্রামে ফিরে হারু দেখল ক'বছরে গ্রামের হাল অনেক বদলে গেছে। রাস্তাঘাট রাকা হয়েছে অনেক, অনেক নতুন বাড়ি উঠেছে। আবার অনেক পুরনো বাড়ি ধসেও পড়েছে। সে সব লোকজনরা যে কোথায় চলে গেছে কে জানে।

চার বছর বাদে গ্রামে ফিরল হারু। এ চার বছর ও জেলে ছিল। জেলে গেছিল, কুসুমডির মাধব বাবুর বাড়িতে চুরি করেছিল বলে। সোনায় দানায় টাকা পয়সায় অনেক মাল হাসিল করেছিল। কিন্তু ভাগ্যে সইল না, ধরা পড়ে পাক্কা চার বছরের জন্য ঘানি ঘুরিয়ে এসেছে সদর জেলে। জেলে অবশ্য আজকাল আর ঘানি ঘোরাতে হয় না। তবে জেল, জেলই। ওখানে একবার গেলেই সব মানুষের আলাদা পরিচয় হয়ে যায়। হারু তো এ নিয়ে চার চার বার ঘুরে এল ওখান থেকে। আগের মেয়াদগুলো অবশ্য তত বেশী দিনের ছিল না। তখন তো এত ঘাঘুও হয়ে ওঠেনি ও।

এখন ও পাকা চোর। চোর চক্কোত্তি। চারদিকে ওর বেশ নাম ডাক। থানার দারোগাবাবুরাও বেশ সমঝে বুঝে কথা বলেন আজকাল।

নিজের বাড়ির কাছে পৌঁছে মনটা বেশ খারাপই হয়ে গেল হারুর। বাড়ির চৌহদ্দির দেওয়াল ধসে পড়েছে। দেওয়ালের গায়ের দরজাটা কে বা কারা নিয়ে চলে গেছে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় পচে গলে খসে পড়েছে। সে সব জায়গায় বাঁশের কাঠামো হাঁ করে বার হয়ে পড়েছে। ঘরের লাগোয়া দাওয়ার মাটিও বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে দাওয়া এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে। ঘরের দরজাটা বন্ধই আছে। তবে তালাতে মরচে ধরে গেছে। ওটা আর খোলা যাবে কিনা কে জানে।

এই ওর বাড়ি। এ বাড়িতে ও জন্মেছে। এ বাড়িতেই ওর বাবা মা মরেছে। এ বাড়িই ও দুঃখে অভাবে মহাজন যতীন সাহার কাছে দশ কুড়ি টাকায় বাঁধা রেখেছে। প্রতিবার ভেবেছে রাতের আঁধারে বড় একটা ডাকা মেরে সে টাকাও শোধ করে দেবে। ডাকা ও মেরেছে, কিন্তু ধরা পড়ে জেলই খেটেছে শুধু! টাকা শোধ করা আর ওর হয়ে ওঠেনি। এবাড়ি থেকেই শেষ বার রাতে ও বার হয়েছিল কুসুমডির দিকে। আজ আবার চার বছর পরে ফিরছে পাকা দাগী চোর হয়ে। আজকাল কত ওর নাম ডাক। পাঁচখানা গাঁয়ের মানুষজন এখন ওর দেখা পেলেই হাতের কাছের যা কিছু জিনিস তা সামলায়। চোখের আড়াল করতে চায় না।

হ্যাঁ, আজ ও চোর। মানুষ নয়। আজ ওকে আর কেউ কাছে ডাকবে না, বসতে বলবে না, কাজ দেবে না, কথাও বলবে না। দেখা হলেই চেঁচাবে, 'ওরে কে কোথায় আছিস, একটু সাবধান হ বাপু।'

পাশের বাড়ি পবন কাকার। গ্রাম সম্পর্কে নয়, দূর সম্পর্কের। তার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। একটু কেশে গলা সাফ করে ডাকল, 'কাকা, বাড়ি আছেন, কাকা?' 'কে?' ভিতর থেকে বয়স্ক একজন উঁকি দিল। ভাল করে ঠাহর করে বলল, 'কে? হারু না? তা কি মনে করে?'

'আজ্ঞে কাকা, এই ছাড়া পেলাম, এই আসছি। ঘরের চাবিটা...'

'আমার কাছে নেই। ও আছে যতীন সাহার কাছে। সে-ই এখন পঞ্চায়েত প্রধান। তার কাছে যা। আমাকে জ্বালাস না।' দরজাটা মুখের উপর বন্ধ করে দিল কাকা।

সাহাবাবুর বাড়ি বড় পুকুরের ধারে। সে দিকেই গাঁয়ের বেশী বাড়িঘর। বেলা পড়ে এসেছে, এখনই চাবি না পেলে দিনের বাকি সময়ের মধ্যে ঘরদোর সাফ করতে পারবে না ও তারপর তো রান্নাখাওয়ার কথা।

লজ্জাসরম আজকাল আর হারুর তত নেই। ও জানে ওকে সবাই চেনে। জানে, সুযোগ পেলেই ফের ও চুরি করবে। চুরি না করলে ও খাবে কি? পাঁচ দশ বিঘা জমি কি ওর আছে, যে হাল চালিয়ে ধান ছিটিয়ে দেবে আর বসে বসে খাবে। আর জনমজুরের কাজ, তা হয়ত চেষ্টা করলে ও আগে পেত। এখন, এখন আর ওকে কাজ দিয়ে বিশ্বাস করবে কে?

মোড়ের মাথায় বুদ্ধুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল ওর। থলি হাতে কি নিয়ে যেন ও আসছিল। মুখোমুখি হতেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলল, 'ফিরেছেন, ফিরেছেন, চোর চক্কোত্তি ফিরেছেন, দেখবে এসো গো সবাই, দেখবে এসো ...'

ওর চিৎকারে এদিক ওদিক দু'চারখানা বাড়ির জানলা দরজা খুলে গেল। ক'জন উঁকিঝুঁকিও দিল। শেষে হারুকে দেখে আবার যে যার কাজে চলে গেল। বুদ্ধু বেশ খুশি হয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'এবারে ক'দিন ফের দেশে থাকবে গো হারুদা? তোমার তো আবার বাইরের ভাত রোচে না।'

ওসব কথায় কান না দিয়ে সাহাবাবুর সদরে এসে থামল হারু। দেখল ওর আগেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাল ময়লা ছেলে। দশ বারো বছর বয়স হবে তার। গায়ে ধুলোময়লা মাখা। পরনে একটা ছেঁড়া তালি-মারা পেন্টু।

ওকে পাশে দাঁড়াতে দেখে ছেলেটা মুখ তুলে তাকাল। ওর চোখের চাহনিতে কেমন যেন ভয় মাখান।

দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল হারু। একবার ভাবল ভিতরে ঢুকবে কি না। না ঢোকাই ঠিক করে কেশে গলা সাফ করে ডাক দিল, 'যোতিদা, যোতিদা বাড়ি আছ?' কেউ সাড়া দিল না সে ডাকের। বাড়িতে যে কেউ আছে তেমনও মনে হল না ওর। সদর দরজার পর বড় বাগান জমি, তার পরেই সাহাদের মাঠকোঠা। ও ভাবল হয়ত ডাক ওর কেউ শুনতে পায়নি। আবার কেশে, গলা সাফ করে বেশ জোরেই ও ডাক দিল আবার।

ছেলেটা বড় বড় চোখ করে ওর দিকে দেখছিল বেশ ভয় মেশান দৃষ্টিতে। দু'বার ডেকেও ও সাড়া পেল না দেখে যেন একটু সাহস পেল ও। বোধহয় ভাবল এ লোকটাও ওরই মত কেউ হবে। নখ দিয়ে দেওয়ালে খুঁটতে খুঁটতে ও তখন কিনকিনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'মা—আ—আ—গো—ও—ও, দুটো রুটী দেবে মা? দু'দিন কিছু খাইনি।'

'কে রে?' ভিতর থেকে বেশ ভারী গলায় কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই? দাঁড়াও আসছি।'

দরজার পাশে যতীন সাহা নিজেই এসে দাঁড়ালেন। এ ক'বছরে আরও বেশ মোটাসোটা নাদুসনুদুস হয়েছেন উনি। হারুর দিকে না তাকিয়েই রোগা কালো ছেলেটাকে ধমকে উঠলেন, 'ভাগ, ভাগ, ভাগ বলছি। যত সব হাঙরের দল। জ্বালিয়ে মারলে। গেলি?'

ছেলেটা বকা শুনেই ক'পা পিছিয়ে গেছিল। বড় চোখ করে সেখান থেকেই বাকী কথাটুকু শুনে, আস্তে আস্তে হাঁটা দিল অন্য দিকে। ওর দিকে আর না দেখে যতীন সাহা মুখ তুলে তাকাল হারুর দিকে। সামনে ওকে দেখেই মুখের ভাব আরও কঠিন হল। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে তুমি। তা কি মনে করে?'

হারু দু'হাত জোড় করে বলল, 'পেন্নাম দাদা। আজই ছাড়া পেলাম। ঘরের চাবিটা দিন। ঘর দোর তো সাফ করতে হবে। নইলে থাকব কোথায়?'

'চাবি? কিসের চাবি?' অবাক হয়ে বললেন যতীন সাহা, 'ও বাড়ি তো আমার দখলে কবেই এসে গেছে। ফিরেছিস, ভালই হল, একদিন আদালতে গিয়ে দলিলে টিপছাপ দিবি তা হলেই সব পাকা হবে। তা কবে নাগাদ যাবি?'

'আজ্ঞে বাপ-পিতেমোর ভিটে। ও আমি বেচব না। আপনার পাওনা গন্ডা আমি আদায় দেব। আমাকে ক'টা দিন সময় দিন।'

'টাকা আদায় দিবি?' অবাক হলেন যতীন সাহা, 'আমাকে তুই আর গপ্পো কথা শোনাস না। টাকা পাবি কোথায় যে আদায় দিবি? ওতো কম টাকা নয়।'

'আজ্ঞে দিনমজুর খাটব, বোঝা তুলব। তা সে যে করে পারি ও-টাকা আমি আদায় দেব। চাবিটা দেন আজ্ঞে। বেলা পড়ে এল। কখন ঘরদোর সাফ করব, কখন দুমুঠো ফোটাব!'

'ও চাবি কোথায় রেখেছি তা আর এখন মনে পড়ছে না। তালা ভাঙ্গতে তুইতো ওস্তাদ, ও তালা ভেঙ্গে ফেলগে যা। তাতে তো তোকে আর ফের জেলে যেতে হবে না।' হেসে বললেন যতীন সাহা, 'তবে মনে রাখিস, ক'দিন মাত্র

সময় দেব আমি। তারপর ও বাড়ি আমার।'

'সে তো নিশ্চয়ই,' বলল হারু, 'তবে দাদা আমি আর জেলে যাব না। ও রোগ আমার সেরে গেছে।'

'তাই নাকি?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবাবু, 'ঘরে চুপচাপ বসে থাকলে মন ছোক ছোক করবে না? হাত শুলোবে না? দেখ, চেষ্টা কর। তবে যা করিস না করিস, গ্রাম বাদ দিয়ে। আর রোজ রোজ আমার কাছে সন্ধ্যে বেলা হাজিরা দিবি। না দিলে আমি কিন্তু থানায় এত্তেলা দেব বলে দিলাম।'

মাথা নীচু করে ওখান থেকে ফিরল হারু। মনে তখন ওর একটাই চিন্তা, এত দিন পরের বাড়ির দরজা জানলা ভেঙ্গেছে ও, আজ ভাঙ্গবে নিজের বাড়ির। কিন্তু ঘরের দরজা খুলে কি দেখবে ও? ঘরে যা কিছু রেখে গেছিল তার কি কিছু বাকী আছে? জেলে কাজ করে কটা আর টাকা পেয়েছে, চাল ডাল হাঁড়িকুড়ি, বিছানাপত্র—সবই যদি আবার ওকে কিনতে হয়, সে টাকায় ক'দিন চলবে?

বাড়ির সামনে ফিরে এল ও। তাকিয়ে দেখল দরজাটা সত্যিই নড়বড়ে হয়ে গেছে। আংটাগুলোয় মরচে ধরে প্রায় ক্ষয়ে গেছে। একটু জোরে ধাক্কা দিতেই ঘটাং করে আওয়াজ তুলে আংটা ভেঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। একটা বদ্ধ ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল ওর। আবছা অন্ধকারে ঘরের ভিতর দিকে তাকাল ও। বাক্স প্যাটরা, হাঁড়ি বালতি, বিছানাপত্র সবই তো সেই বাপ-দাদার আমল থেকে ছিল ওর। সে সব কি আর আছে! একটু অস্বস্তি নিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিতে গিয়েই 'বাপরে' বলে চেঁচিয়ে উঠে এক লাফে দাওয়ার নীচে নেমে পড়ল ও। ইয়া বিশাল এক কাল কেউটে ভীষণ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চৌকাঠ পার হয়ে পাশের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। খুব বেঁচে গেছে।

হাততালি দিয়ে শব্দ করে সাবধানে ঘরের মধ্যে ঢুকল হারু। তাকিয়ে দেখল, ঘরের চালের খড় পড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় আকাশ দেখা যাচ্ছে। কুলুঙ্গীতে মাকড়সার জাল। ঘরের এক কোণে একটা মাটির কলসি কাত হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। চোর হারাধনের যা কিছু ছিল, সবই কোন সাধুরা এসে তুলে নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনাল যখন, মেটে হাঁড়িতে চালে ডালে খিচুড়ি চড়িয়ে দিল ও। এর মধ্যে পাড়ার অনেকেই এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেছে। সবার এক কথা, এবার ক'দিন থাকবে ও!

গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে একটা মাদুর কিনেছে ও। কিনেছে হাঁড়ি কলসি চাল ডাল পেঁয়াজ নুন। খবর নিতে যারা এসেছিলেন দয়া করে এপথে, তাদের সবাইকেই বলেছে

হারু, ও জনমজুর খাটতে চায় ক্ষেতে। ক্ষেতখামারের কাজ নিয়েই থাকতে চায় বাকী জীবন। রাতারাতি বড়লোক হবার ইচ্ছা আর ওর নেই। সবাই হেসেছে ওর কথা শুনে, কেউই বিশ্বাস করেনি ওকে।

পকেটে সামান্য যা কিছু ছিল ওর, তা দিয়ে এটা ওটা কিনতেই সব খরচ হয়ে গেছে। চালে ডালে চলবে দুদিন। তারপর...?

খিচুড়ির হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে বসে সে সেকথাই ভাবছিল হারু। ভুল ও জীবনে একবারই করেছিল, সেই প্রথম বার। যেবার ও রাতারাতি বড়লোক হবার জন্য ভুতোর দলে ভিড়ে কালু শেখের বাড়িতে রাতের আঁধারে ঢুকেছিল। সে বাবদ আড়াই বছর জেল খেটে বাড়ি ফিরে নাক কান মলেছিল আপন হাতে। ও আর নয়। কিন্তু কেউ ওকে কাজ দেয়নি। যতীন সাহা তার উপরে তাগাদায় পর তাগাদা দিয়ে পাগল করে তুলেছিল। ভূতো বলেছিল, 'মরবি, মরবি, না খেয়ে মরবি। আরে, আমায় দেখিস না? হাল বলদ জমি জায়গা সবই তো ওই রাতের কামাইয়ে। তোরও হবে।' তারপর এক বছর ফাটকে ছিল ও। তারপর একটানা আড়াই বছর। সেবারই ফিরে দেখেছিল, ছেঁড়া কানি পরে ভুতো বাস স্ট্যান্ডে ভিক্ষে করছে। তারপর সোজা চার বছর একটানা। এই সবে সে মেয়াদ থেকে আজ ভোরে ছাড়া পেয়েছে। আর নয়, এখনও গা গতরে ক্ষমতা আছে। তা গেলে তো ওই ভূতোর হাল হবে। গাঁয়ে গঞ্জে কাজ পায় তো ভাল। তা না হলে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। চোর হারাধন তো গাঁয়েই চোর। বিদেশে তো নয়, সেখানে কে আর ওকে চিনতে যাচ্ছে। গতরে খেটে আবার ও মানুষ হবে। মানুষ, সাধারণ মানুষ, রাম শ্যাম যদু মধুর মত। যাদের দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, আর আছে ক্ষিদে, অথচ যাকে সবাই বিশ্বাস করে।

দাওয়ায় ওদিকে হঠাৎ যেন কেমন একটা শব্দ হল। যেন কেউ কাশল। মানুষ, না কি ভাম! না কি অন্য কোনও জানোয়ার। চার পাশের ঝোপজঙ্গল তো এখনও কেটে সাফ্ করতে পারেনি। ভাম, বেজী না হয়ে যদি সাপখোপ হয়। তাড়াতাড়ি নতুন কেনা লম্ফটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে, অন্য হাতে নতুন তৈরি লাঠিটা বাগিয়ে মোড় ঘুরে দাওয়ায় ওদিকে এসে থমকে দাঁড়াল ও। ভাম বেজী সাপখোপ কিছু নয়। ছেঁড়া পেন্টু-পরা সেই কালো ময়লা ছেলেটা বড় বড় চোখ করে ওর হাতের লাঠিটার দিকে তাকিয়ে আছে।

রাতে শোবার জন্য ও বোধহয় এই পোড়ো বাড়িটাই বেছে নিয়েছিল। ও তো ভাবেনি, এমনি করে হঠাৎ কেউ এসে ওর সামনে দাঁড়াবে!

'তুই, তুই এখানে কেন?' জিজ্ঞাসা করল হারু।

কোনও উত্তর না দিয়ে ছেলেটা শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। ওর দুচোখে সে কি ভয়, সে কি আতঙ্ক ওর চাহনিতে! ও বোধহয় ভেবেছে, পাগলা কুকুর মারার মত ওকে মারা হবে!

ওর মুখের ভাব দেখে হাসি পেল হারুর। তবুও মজা করবে বলেই বলল, 'কি রে, কি মতলবে এসেছিস এখানে?' যেন ওর ঘর-ভরা বহুত ধনরত্ন আছে। তা হাসিল করবে বলেই মতলববাজরা ফিরছে চার দিকে, ওর যথাসর্বস্ব লুট করে নেবে বলে। যেমন লোক ও নিজে, তেমন ভাবনা ওর। হেসেই ফেলল আপন মনে হারু। জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, কথা বলছিস না যে?'

নিজেই ভাবল, জিজ্ঞাসা তো করল ও, কিন্তু তার কি উত্তর দিতে পারে ছেলেটা? কি কথা বলবে ও? কানে ওর আবার যেন বেজে উঠল সেই কিনকিনে চিৎকার, 'মা গো, দুটো রুটি দেন না মা, দুদিন কিছু খাইনি।' ওই তো রোগা লিকলিকে চেহারা, কোটরে বসা চোখ, ছেঁড়া তালি মারা পেন্টু পরা। মা বাপ নেই, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। থাকলে এতটুকু ছেলেকে কি কেউ ভিক্ষে মাগতে পাঠায়। দু'দিন খায়নি কিছু বলছিল, তাও তো সেই বিকালে। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে তো মনে হল না ওর জুটেছে কিছু। জুটবে না। কে দেবে ওকে খেতে? হারু চোরের মা মরল যখন, তখন কত বয়স ছিল তার? না না, তখন তো সে চোর হারু ছিল না। হয়ত ওর মত অত ছোট ছিল না, চোদ্দ পনের বছর বয়স হবে। ভিক্ষে মেগে খেতনা হারুর মা। বাবুভাইদের বাড়িতে গতর খেটে রোজগার করত। সেই বাবু ভাইরাই তো সুযোগ বুঝে হারুকে বিনা মাইনার কেনা গোলাম করতে চেয়েছিল। দু'বেলা দু'মুঠো খোরাকের বদলে দিনভোর দশ জনের কাজ। সঙ্গে গালি গালাজ, জুতো লাথি। সে কারণেই তো রাতারাতি বড়লোক হতে চেয়েছিল হারু। বড়লোক আর হয়নি সে, হয়েছে ছোটলোক, হারু চোর।

'কি নাম তোর? বলবি তো কিছু কথা?'

তবুও ওর মুখে কোনও কথা নেই।

'তোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রঙ্গ করার সময় আমার নেই।' বলল হারু, 'ওদিকে খিচুড়ির তলা ধরে যাবে। আয়, উঠে আয় ওখান থেকে। এ দিকটা এখনও সাফসুতরা করা হয়নি। সাপখোপ বার হতে পারে।'

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে পড়ল।

হারু হেসে বলল, 'রাতে থাকবি, তা দেখেশুনে জায়গা ঠিক করবি তো? ঘুম তোর কাল ঘুম হয়ে যেত, আমি না থাকলে। আয় আমার সঙ্গে , আয় বলছি।'

দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়াল ছেলেটা। কিন্তু এক পাও এগোলো না।

হারু ভাবল, কি জানি, ও হয়ত ওর কোন কথাই বিশ্বাস করতে পারছে না। এ গাঁয়ে ও হয়ত বেশ ক'দিন থেকে ভিক্ষে মাগছে। হারুর চোরের নাম বোধহয় শোনা হয়ে গেছে ওর, তাই অবিশ্বাস। কিন্তু বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন কথাটা চলেছে ও? তেমন কিছুই তো বলেনি ও।

যা খুশি তাই করুক ও, ওকে নিয়ে সময় কাটাবার মত অত সময় ওর নেই। ওদিকে খিচুড়ির গন্ধ বার হতে আরম্ভ করেছে। আর দেরী করলে ধরে যাবে।

ছেলেটা তেমনি করেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তেমনি ভয় মেশান কেমন যেন দৃষ্টি ওর চোখে। মুখের ভাব এমন, যেন বোবা কালা। মরুক গে যাক, হারু ফিরে এল রান্নার জায়গায়।

হাঁড়ির মুখের সরা নামিয়ে কাঠি দিয়ে খিচুড়ি খুঁটে দিল। একটু তুলে দেখল সিদ্ধ হয়েছে কিনা। আরও একটু বাকি আছে। তাই সরাটা আবার চাপা দিয়ে দিল হারু। সরার তলা দিয়ে ওঠা বাষ্পের দিকে তাকিয়ে ওর মনে পড়ল মার কথা। ওর মাও এমনি করে এখানে এই দাওয়ায় বসে রাঁধত কত কি। না, ওরা বড় মানুষ ছিল না। ওর বাবা ছিল সামান্য চাষী। কষ্টেই দিন চলত ওদের। বাবা অসুখে পড়ল। সামান্য জমি যা ছিল গেল মহাজনের খপ্পরে। মা হল ওর বাবুভাইদের বাড়িতে খেটে-খাওয়া দাসী। সেই মাও কদিনের অসুখে গেল, যতীন সাহার কাছে বাঁধা পড়ল বসত বাড়ি। তারপর একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হারু। ভুরভুর করে ওঠা বাষ্পের মাঝ দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল, কখন সেই কালো ময়লা

ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে ওদিকে। ওর চোখে মুখে তখনও সেই ভাব।

দাওয়ার এক পাশ দেখিয়ে হারু বলল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস ওখানে।'

কোনও কথা না বলেই ছেলেটা গিয়ে বসল সেখানে। ব্যাপার যে কি তা বুঝল হারু। ভয় অবিশ্বাস দুটোর কোনটাই যায়নি ওর। কিন্তু এমন ভুরভুরে গন্ধে ও আর ঠিক থাকতে পারেনি। লাথি ঝাঁটা সে তো খায়ই ও, তবুও দেখতে এসেছে ভাগ্যে ফের কি আছে ওর। আহা রে!

'নাম বলবি তো?' ধমকেই জিজ্ঞাসা করল হারু।

কোনও উত্তর দিল না ছেলেটা। শুধু পাশের খুঁটোটা জড়িয়ে ধরে বসল। যেন এখানেই ও বসে থাকতে চায়।

'তোর হয়েছে কি রে?' খিচুড়িতে কাঠি নাড়তে নাড়তে বলল, 'রা কাড়ছিস না। অমন করে বসে থাকলে কি বুঝব আমি, বল? খিদে পেয়েছে?'

এতক্ষণে এই কথাটাই যেন কানে গেল ওর। চোখ থেকে সেই ভয় ভাবটা চলে গেল। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তা। মুখের কোণে একটু যেন হাসির ভাবও লাগল। আস্তে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

মনের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল হারুর। আহারে, খিদের চোটে কথা নেই ওর মুখে। দু'খানা বাসি রুটিও কেউ দেয়নি ওকে। এমনিই বটে এ গাঁয়ের মানুষগুলো। একটু যদি দেখত, একটু যদি পাশে দাঁড়াত, তাহলে বাপ মা মরা পাড়ার ছেলে হারাধন পাল আজ আর এমন পাকা চোর হত না। এ ছেলেটার তো আরও বয়স কম। এ বয়সেই বাপ মাকে খেয়ে বসেছে। এ-ও কি তবে একদিন ওরই মত পাকা চোর হবে? চোর কালোমানিক? না, না, ভগবান, আর সব শাস্তি তুমি দাও গরীব গুরবো মানুষগুলোকে, কিন্তু দোহাই তোমার, হারাধনের মত পাকা চোর করে তুলনা কাউকে। কারও গায়ে যেন আর কোনও মানুষ কোন দিন থুতু দিতে না পারে।

'বোস বোস, গরম গরম দেব তোকে। দাঁড়া, আগে দুটো কলাপাতা কেটে আনি গিয়ে।' বলল হারু!

'আমি আনব?' অন্ধকারের ভিতর থেকে হঠাৎ ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল। খুঁটো ছেড়ে ততক্ষণে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে।

'তুই আনবি?' বেজায় খুশিতে হারু জিজ্ঞাসা করল, 'যা আনগে যা। কিন্তু পাতা কাটবি কি দিয়ে?'

'বেড়ার চাঁচড়ি খুলে নিয়ে যাচ্ছি। তা দিয়ে কাটব।' মহা উৎসাহে বলল ছেলেটা।

'যা, তাই আন গে।' খিচুড়ির হাঁড়ি নামাতে নামাতে বলল হারু, 'খিচুড়ি হয়ে গিয়েছে।'

সত্যি ছেলেটার বাপ মা নেই। নেই আর কোনও আপনজন। এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরে ভিক্ষা করেই খায়। কোনও দিন জোটে, কোনও দিন জোটে না।

কোথায় দূরে দক্ষিণ চাপড়াতে সরকারি কারখানা বসছে। সেখানে মাটি কাটছে, দেওয়াল গাঁথছে হাজার লোকে। সেখানে রোজ দিয়ে লোক নেয় কোম্পানীর বাবুরা। ও গেছিল, নেয়নি ও ছোট বলে। বড় হলে সেখানে ও কাজ করতে যাবে। তখন ও আর ভিক্ষে মাগবে না। তবে বড় হতে ওর তো এখনও দেরী আছে। সে কদিন এমনি করেই চলবে।

মাদুরে হারুর খুব কাছ ঘেঁষে শুয়ে আপন মনে বকেই চলেছে ছেলেটা। কে বলবে কতক্ষণ আগে ওর মুখে রা ছিল না। এসব কথা এমন করে শুনতেও বেশ লাগছিল হারুর। যেন ও কত আপনজন, কত কাছের। কথা বলতে বলতে ছেলেটা বলল, 'এমন খাওয়া অনেকদিন খাইনি গো। তুমি খুব ভাল। ভিখ মেগে যা পয়সা পাব, তোমাকে দেব। আমাকে থাকতে দেবে তোমার কাছে?'

হু হু করে উঠল হারুর মনের ভিতরটা। চোর ছ্যাঁচোর দাগী আসামী হারু। ভাল মানুষ, কিছু জানে না ছেলেটা একদম বোকা ও। নিজেকে সামলে নিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, 'আর যদি পয়সা না পাস, তাহলে?'

তাহলে যে কি করবে ও তা জানে না। এমন প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল। দেশ গাঁয়ে আর পয়সা দেয় কে? কেউ কিছুই দেয় না। আজ শুধু এই লোকটা ওকে ডেকে খিচুড়ি খেতে দিয়েছে, অমনি অমনি। আজ দিয়েছে। কালও দেবে, তা ও ভাবল কি করে।

'কি রে, পয়সা না পেলে কি করবি, তা তো বললি না?' ফের জিজ্ঞাসা করল হারু।

'চলে যাব।' কেমন করে যেন উত্তর দিল ও।

'কোথায়?'

এর আর কোনও উত্তর দিল না ছেলেটা।

পয়সা না থাকলে যে কি হবে সে তো হারুরও চিন্তা। আজ তো খুব নবাবি করে নতুন মেটে হাঁড়িতে খিচুড়ি খেল ও। কাল পরশুও হয়ত দু'বেলা চলবে। তারপর নিজে ও কি খাবে তার ঠিক নেই, তার উপরে ছেলেটা।

মাথার উপরের চালের ফুটো দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। ওই ফুটোই বা ও কি করে মেরামত করবে? এ গাঁয়ে কেউ আর ওকে কোনও কাজে ডাকবে না। মুখে যে যাই বলুক, সময়কালে মাথা চুলকাবে। দু দিন আশায় আশায় তবুও স্বপ্ন দেখবে ও। তারপর পেটের জ্বালায়, আবার রাতের আঁধারে ধান্দায় বার হতে হবে ওকে। আবার ধরা পড়বে, আবার জেল খাটবে। আরও দূর দূর করবে মানুষ জন।

ঘাঘু চোর হারাধন, তোর আর ছাড়ান ছোড়ন নেই।

পাপচক্রে ঘুরে ঘুরে সেই নরকবাসী হতেই হবে তোকে, এ জীবনভর। বাপ-পিতেমোর এ ভিটেতে তোর ঘুঘু চরবে। শেষে একদিন যতীন সাহার মাঠ কোঠা দালান উঠবে। বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হারু।

'পালানপুর রেল ইসটিসনে রেল বাবুদের মাল তুললে বাবুরা পয়সা দেয়। মাল তুলে এনে দেব তোমাকে। আমাকে তাহলে চলে যেতে বলবে না তো?' ছেলেটা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল।

'পালানপুর ইসটিশন? সে তো দু কোশ পথ।' অবাক হারু বলল, 'তাছাড়া সেখানে তো লাল জামা পরা কোম্পানীর লোক আছে। মাল তুলে তারা বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করেক। তোকে মাল তুলতে দেবে কেন?'

'হ্যাঁ, মাল তুললে ভীষণ মারে। পয়সা কেড়ে নেয়। আমি লুকিয়ে করব। সব পয়সা তোমাকে দেব। স—অব। আমাকে থাকতে দেবে?'

হা হা করে হেসে উঠল হারু। সে হাসি যেন কান্নার মত শোনাল। বলল, 'ওরে বোকা ছেলে, তুই আমাকে জানিস না। আমি হারাধন পাল, চোর চক্কোত্তি। আশপাশের দশ খানা গাঁয়ের মানুষ আমাকে চেনে। দূর দূর করে। কাছে গেলে ঘরের দোর দেয়। চার চারটে বছর জেলে ঘানি ঘুরিয়ে এই ছাড়া পেলাম। আমার কাছে তুই থাকবি কি রে!'

'আমার কেউ নেই।'

'আমারও নেই। কিন্তু তাতে কি? আমি আজ নয় কালকের রাতে ঢুকে পড়ব কারও বাড়িতে। সেখানে বাঁচলে, ফের আর একদিন আর কারও বাড়ি। সেখানেও বাঁচলে আর এক বাড়িতে। তারপর ধরা পড়ে চোরের মার খেয়ে যদি বাঁচি তো জেলেই ফের ঘানি ঘোরাব। আমার ভাবনা কি? আমার খোরাক মাপা আছে সরকারি জেলে। বুঝলি কিছু তুই?'

ছেলেটা কি বুঝলে কে জানে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'দক্ষিণ চাপড়াতে কাজ করবে তুমি? তাহলে আর কেউ তোমাকে চোর বলবে না। ওখানে তো কত লোক কাজ করে।'

হ্যাঁ, বাপ পিতেমোর ভিটে ছেড়ে আমি এখন যাই সেই কোথায় জন মজুর খাটতে। ভাল বললি তুই। নে, ঘুমো এখন। কালের কথা কালই ভাবা যাবে।'

একথা বলল বটে হারু, কিন্তু তখুনি ওর মনে হল, এ ভিটে কি আর ওর নিজের আছে? যতীন সাহা কাঁচা লোক নয়। অমনি অমনি সে অত টাকা ধার দেয়নি। সে জানে হারাধন আর তার জীবনে ও টাকা শোধ করতে পারবে না। এবারে ঢুকতে দিয়েছে বটে, কিন্তু আগামী বারে দেবে কি?

'আমি কাল চলে যাব।' বলল ছেলেটা গলায় ওর অভিমানের সুর।

'কোথায় যাবি?' অবাক হারু জিজ্ঞাসা করল।

'আর কোথাও। এ গাঁয়ে কেউ ভিক্ষে দেয় না।'

'এই যে বললি তুই থাকবি আমার সঙ্গে?'

'না, থাকব না।'

'কেন রে?'

'তুমি তো জেলে যাবে। সে তো খারাপ জায়গা, খারাপ লোকরা যায়। খারাপ লোকের সঙ্গে কেউ থাকে?'

একথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল হারু। হ্যাঁ, ওতো খারাপ লোকই, সন্দেহ কি তাতে। কিন্তু...

বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসটা চাপা দিতে পারল না ও। উদাস গলায় বলল, 'হ্যাঁ রে, আমি খারাপ লোক। কেউ তাই আমাকে চায় না। যাস, চলে যাস কাল সকালে। এখন তো ঘুমো।'

ছেলেটা কিন্তু ঘুমাল না। বার কতক এপাশ ওপাশ করে হঠাৎ বলল, 'তুমি তো ভাল, তুমি জেলে যাবে কেন? দক্ষিণ চাপড়াতে তো কাজ হচ্ছে। কত লোক কাজ করছে, তুমি করবে না কেন? আমিও বড় হলে করব। চল না সেখানে! তোমার বাবা মা নেই, আমারও নেই। আমরা এক সঙ্গে থাকব।'

ঘুম ছুটে গেল যেন হারুর চোখ থেকে। ও উঠে বসল মাদুরের উপরে। বলে কি ছেলেটা! দুজনে এক! আর থাকতে না পেরে হারু জিজ্ঞাসা করল, 'তুই গেছিস সেখানে?'

'হ্যাঁ, বাবুর হাতে পায়ে ধরেছি। ছোট বলে কাজ দিল না। তুমি তো বড়, তোমাকে দেখলেই কাজ দেবে। মাটি কাটার কাজ, জল টানার কাজ, কত কাজ। বড় বড় তাঁবুতে থাকে সবাই। রাতে কত আলো জ্বলে চারদিকে! দিনের মত হয়ে যায়। তখন যাদের ছুটি, তারা খাটিয়ায় শুয়ে রাডিও শোনে। খুব সুন্দর বিলিতি গান হয়। আমি দূর থেকে শুনেছি। তুমিও শুনতে পাবে। চল না সেখানে!'

ছটফট করে উঠল হারু। রোডিওর গান তো ও শুনেছে, সে-ও কত দূর থেকে। সদর জেলে ও তো জেলরবাবুর বাগানে কাজ করত। মাটি কাটত, গাছ লাগাত, ঝোপ জঙ্গল

সাফ করত। কত কাজ। কত ফুল গাছই না লাগিয়েছিল ও। ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকত বাগান। গন্ধে ম ম করত চার দিক। ভোরে শিশির ভেজা মাঠে টলতে টলতে ছুটে আসত আর একটা জিয়ন্ত ফুল, জেলরসাহেবের দু আড়াই বছরের নাতনী, বাগানের ফোটা ফুলের মত সুন্দর। আধো আধো গলায় ডাকত, 'এই চোর, চোর, আমাকে লাল ফুল দেবে না?'

তখন দূরে বাবুদের ঘরে কোথায় যেন রাডিও বাজত। কি সুনদ্র সে গান! ওর জন্যই তো অত ফুল ফোটাত হারু চোর, জেলরবাবুর বাগানে। কিন্তু কি হয়ে গেল কে জানে, হারু চোর করল চুরি করে পাপ, ভগবান তাকে নিয়ে গেল। রাডিও আর বাজত না বাবুর বাড়িতে। বাগানেও আর কাজ করতে ভাল লাগত না হারুর।

সেই রাডিওর গান ফের শুনতে যেতে বলছে ও! আবার কি তাহলে বাগানে ফুল ফোটাতে পারবে হারু চোর? লাল ফুল, হলদে ফুল, ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে চার দিক। মৌমাছি আসবে মধুর লোভে। রংবেরঙের প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াবে চারদিকে। খোলা মেলায় হাত পা ছড়িয়ে খাটিয়ায় শুয়ে থাকবে ও সারা দিনের কাজের শেষে। রাডিওতে গান বাজবে, বিলিতি গান। আর তা শুনবে ও নিশ্চিন্তে বসে!

দক্ষিণ চাপড়া কত দূরে, কোন দিকে? কত রাত আর বাকি? ভোর হবে না কি আর?

ছেলেটা বলল, 'তুমি কাজ করবে, আমি বাস এস্ট্যান্ডে বাবুদের মাল তুলব। সরকারি রোজ কত লোক আসে সেখানে। সব পয়সা আমি তোমাকে এনে দেব। তখন তো অনেক পয়সা হবে। আর তা হলে তোমাকে জেলে যেতে হবে না। আমরা দুজনে এত সঙ্গে থাকব। আমাকে তুমি আর তাড়িয়ে দেবে না তো সকালে?'

রাত অনেক বাকি। ছাদের ফুটো দিয়ে অন্ধকার আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাইরে, নিঝুম দস দিক। রাত জাগা শকুন ছানাও কাঁদছে না। ছেলেটার গায়ে আস্তে হাত রেখে হারু বলল, 'নে, ঘুমো এখন। ভোর ভোর উঠতে হবে। দক্ষিণ চাপড়া যেতে হবে তো। রোদ উঠলে কষ্ট হবে খুব।'

এক গাল হেসে ছেলেটা পাশ ফিরে শুল নিশ্চিন্তে।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

(শারদীয়া-১৩৯০)

শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সুখচর পঞ্চমের ক্ষুদেদের অভিনয়

ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়

মিতুর প্রতিজ্ঞা যে সে আর কোনোদিন তার খুড়তুতো বোন ইনুর কথায় ভুলে তার সঙ্গে একা কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাবে না। একবার গিয়েই তার যা শিক্ষা হয়েছে! কি শিক্ষা? সেই গল্পই তো বলছি।

সেবার গরমের ছুটিতে ইনু এসে ধরলে 'চল না মিতুদা আমায় নিয়ে ছোট মামার বাড়ি। কতদিন ওখানে থেকে স্কুলে পড়লাম, আর এখন নিয়ে যাবার লোকের অভাবে একবার যেতে পাই না। জ্যাঠাইমা ভয় পান বলে তোমারও তো বেশী কোথাও যাওয়া হয় না। তা আমার সঙ্গে গেলে জ্যাঠাইমাও নিশ্চিন্ত হবেন আর তোমরা দেখো ওখানে খুব ভাল লাগবে। তুমি যা ভালবাস সব পাবে—ছোটমামার কত যে ঐতিহাসিক জিনিসের সংগ্রহ আছে,—কত কয়েন—আলেকজান্ডার মিনানডার'—এই শুনেই মিতু মজেছিল। ইতিহাসে আগ্রহ তার সত্যিকারের। আর ইনুর ছোটোমামা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিতুর মোটের উপর পরিচয়ও আছে। তবে বাবা মার এক ছেলে বলে সে খাওয়া-পরা, ওঠাবসায় একটু বেশী সুখী—তা ইনু যখন সঙ্গে যাচ্ছে তখন ও-ই সব ম্যানেজ করে নেবে।

অতএব একদিন দুজনে বোলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে রিক্সা করে প্রায় আড়াই মাইল পথ নিদারুণ রোদে ও ধূলায় জর্জরিত হয়ে থামল এসে ছোটমামার ছোট একতলা বাড়ির সামনে। বাড়িটা অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না। সামনের বেড়ার গায়ে একটা মধুমালতী লতা, অজস্র সাদা গোলাপী ও

লাল ফুল নিয়ে ও তার পিছনে একটা গোলোক চাঁপা গাছ বড় বড় পাতা দিয়ে সব ঢেকে রেখেছে। তবে ভিতর থেকে 'লেঃ লেঃ' করে বিশ্রী চীৎকার একটা শোনা যাচ্ছিল। একটু পরেই ক্যাঁচ্ করে ছোট কাঠের গেটটা খুলে গেল। একটা এগার বার বছরের ছেলে, খোঁচা খোঁচা চুল, মনে হল তেল মাখা অবস্থা, কাঁধে গামছা, খালি গা, খালি পা, পরনে একটা ঢল্‌ঢলে খাকী প্যান্ট, বেরিয়ে এল। তার 'লেঃ লেঃ' কে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি বিড়াল না ক্ষুদে বাঘ বোঝা শক্ত। আর রিক্সার পাশ দিয়ে যে জীবটি মরি-বাঁচি করে ছুটে পালাল সেটি হচ্ছে একটি হাড়সার বেচারীর মত কুকুর। ইনু ছেলেটিকে দেখেই বলে উঠল, 'আরে ভোম্বল, কত বড় হয়েছিস্! হুলুয়াকে লেলিয়ে দিচ্ছিস্ বুঝি আমাদের ওপর!' ছেলেটা একটুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়াল, তারপর হাত পা ছুঁড়ে প্রায় নাচতে নাচতে ভিতরে ছুটল, 'ওমা দেখবে এসো ইনুদি আর মিতুদা এসেছে। ও দিদি দেখবে এসো', ইত্যাদি চেঁচাতে চেঁচাতে। মাসীমা তাঁর মেয়ে বুড়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের আদর যত্নে মিতু পথের কষ্ট এবং এ বাড়ির প্রথম সংবর্ধনার কথা ভুলে গেল কয়েক মিনিটে।

একটু ঠান্ডা হয়ে সে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখল। বাড়ির মাঝখানে একটি মেটে উঠোন। তার এক পাশে পাকা বাড়ি, অপর পাশে একটি খড়ের চালওলা মাটির ঘর। উঠোন থেকে দুটি সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠতে হয়। বাড়ির ডান দিকে একটুকরো জমিতে ফুলের কাছ কিছু, বাঁ দিকে টিনের চালায় ঢাকা স্নানের ঘরের পিছনে কলা, পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি কিছু ফলের গাছ দেখা যাচ্ছে। চারদিক বেশ পরিষ্কার দেখে মিতুর ভালই লাগল। ইনুর তো সবই চেনা কাজেই সে স্নানের জোগাড় করতে করতে সমানে বুড়ুর সঙ্গে বকছিল— 'হ্যাঁরে অমুক মেয়ে কোথায়?' 'ওমা বিয়ে হয়ে গেছে!' 'অমুকের ছেলে কি করছে?' 'ও বাবা, ডাক্তারী পড়তে কলকাতায় চলে গেছে!' 'ডাক্তার মাসীমাদের আম গাছটায় এবার ফল ধরেছে?' ইস্ আজ বিকালেই যাব 'সুগতদাদের জামগাছটায় বড় বড় জাম'—'ওমা ওঁরা উঠে গেছেন ওখান থেকে?—তবে কি করে জাম খাব!' ইত্যাদি, এর শেষ লিখতে গেলে গল্প ফেল হয়ে যাবে। ভোম্বল ইতিমধ্যে কাছের কোনো পুকুরে স্নান সেরে এসেছিল। হাতে তার কেরাশ কি সব গাছের পাতা, গায়ে জল, চুলগুলো কপালে লেপটে গেছে, এবং তার থেকে টস্ টস্ করে জল ঝরছে। মাসীমা ছেলেকে ধরে বকতে বকতে একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মোছাবার চেষ্টা করছিলেন, আর ভোম্বল চেঁচাচ্ছিল, 'আরে, আরে আমার লেবু পাতা, আকন্দ পাতা সব পড়ে যাচ্ছে যে! উড়ে চলে গেলে আমার গুটিরা কী খাবে!' বুড়ু বলে উঠল— 'গুটিরা সকাল থেকে অনেক খেয়েছে—এখন তুই নিজে খেতে আয়। বাবা এখনই অফিস থেকে ফিরবেন, এত বেলা অবধি নাওয়া-খাওয়া হয়নি দেখলেই বকবেন।' এখানে অফিস, স্কুল সব ভোরে বসে, দুপুরে খাবার ছুটি হয়, আবার বিকালে বসে চারটের আগে পর্যন্ত। ভোম্বলদের স্কুলে এখন গরমের ছুটি চলছে—তাই তার তাড়া নেই। তাকে শাসিয়ে বুড়ু বললে 'আর দেখ; তোমার ঐ ন্যাদব্যাদে গুটি পোকাদের শোবার ঘরের সামনে এনে খেতে দেবে না খর্বদার। একটি যদি ঘরে ঢুকে যায় তবে দেখবে! সেবার জান ইনুদি, আমার সবুজ শাড়ীকে গাছ মনে করে বোধ হয় আমার গায়ে উঠেছিল! উঃ বাবারে!' বুড়ু শিউরে উঠল। মিতুর গা-টাও শির শির করে উঠল। সেও পোকা-মাকড় দেখতে পারে না। তার ভীষণ ঘৃণা। কুকুর বিড়ালও তার পছন্দ নয়।

ছোটমামা অফিস থেকে ফিরে এদের দেখে ভারী খুসি! বিশেষ করে মিতুর তাঁর সংগ্রহগুলি দেখবার খুব আগ্রহ আছে শুনে। স্নান ও খাওয়া শেষ হলে, আবার অফিসে যাবার আগে তিনি যেটুকু সময় পেলেন তার মধ্যেই মিতুকে কয়েকটা মূল্যবান কয়েন দেখিয়ে দিলেন! বিকালে ফিরে এসে আরও কিছু দেখাবেন আশ্বাস দিয়ে তিনি বেরিয়ে যাবার পর গরম হাওয়ার সন্য দরজা জানালা বন্ধ অন্ধকার ঘরে সকলে শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে গেল। ভোম্বলকে মামীমা খানিকক্ষণ জোর করে পাশে শুইয়ে রাখলেন, কিন্তু তাঁর তন্দ্রা আসতেই সে উঠে দরজা খুলে পালাল। মামীমা জেগে গিয়ে বললেন— 'ওর দুপুরে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার সময় কোথায়, গাছে গাছে আম জাম পেকেছে, বাসায় বাসায় পাখী ডিম পেড়েছে, ঝোপে-ঝাড়ে ফড়িং প্রজাপতি, গুটিপোকা। ওই যে মাটির ঘরটা, ওটাতে আমি আর এখন রান্না করি না। তাই ওটা ভোম্বলের মিউজিয়ম হয়েছে, কত কি যে সংগ্রহ হয়েছে ওটায় দেখো।' মিতুর, ভোম্বলের মিউজিয়ম দেখবার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সে মিউজিয়ম না দেখতে চাইলে কি হবে। মিউজিয়ম নিজে বাইরে এসে তাকে দর্শন দিলেন!

বিকালের দিকে আকাশে মেঘ করাতে গরম হাওয়াটা কিছু ঠান্ডা হয়েছে দেখে ইনু মাসীমার ভাঁড়ার থেকে এক প্লেট আমের আচার জোগাড় করে, সবাইকে ডেকে নিয়ে গোলকচাঁপা গাছের ছায়ায় মোড়া পেতে বসল। ভোম্বল ডাক শুনে এলো বটে কিন্তু বসল না, একটা কাঁচা কসুটে পেয়ারা কামড়াতে কামড়াতে ওদের আশে পাশে ঘুরতে লাগল। মাটির ঘরটার সামনেই ওরা বসে, কাজেই ওর ইচ্ছা—মিতু উঠে এসে ওর সংগ্রহগুলি দেখে। মিতু বড় ছেলে, কলেজে পড়ছে, সে দেখে যদি তার মিউজিয়মের প্রশংসা করে তবে নিশ্চয়ই তার মূল্য আছে। সে একবার বলেও ফেললে—'মিতুদা একবার এই ঘরটায় এসো, দেখো কত কি আছে।' অমনি তার নিজের দিদি সর্দারী করে বলে উঠল—'না মিতুদা কক্ষনো যেও না ও ঘরে। ও সব পোকা-মাকড় মিতুদা দেখতে পারে না ওর বমি আসে। ও যাবে না।' ভোম্বল কিছু না বলে শুধু কটমট করে বুড়ুর দিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে এদের গল্প, আচার খাওয়ার সংগে যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন ভোম্বল তার ঘর থেকে প্রকান্ড মোটা একটা বোতল বাইরে এনে সন্তর্পণে উঠোনের মাটিতে নামাল। হাসি হাসি মুখে সে বললে 'এতে কি আছে জান মিতুদা—পোকা-মাকড় নয়—ব্যাঙ্, এখানের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ কি রকম কায়দা করে বোতলে পুরেছি।' সে বোতলের ঢাকনা ঘুরিয়ে আলগা করে দিলে, মিতুকে দেখাবে বলে। মিতু এদিকে মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, ভয় ও ঘৃণা মেশান স্বরে সে বলে উঠল,—'ব্যাঙ্? জ্যান্ত?' জ্যান্ত কিনা তার প্রমাণ দেবার জন্যই বোধহয় হঠাৎ ফড়াং করে বোতলের ঢাকনাটা শূন্যে ছিটকে উঠল, আর তার তলা থেকে যিনি বেরিয়ে এসে থপাস্ করে ওদের মোড়ার খুব কাছে পড়ে, স্থির হয়ে বসলেন তাঁর চেহারা দেখে মিতু লাফিয়ে পিছনে সরে গেল! আর বুড়ু 'ও মাগো!' বলে চীৎকার করে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, ইনুকে ধাক্কা মেরে, মোড়া উল্টে, আচারের প্লেট ফেলে, দুটো সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে একেবারে বাড়ির উঁচু বারান্দায় উঠে পড়ল। ইনুও খানিক পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘাসের উপর প্লেটের অবশিষ্ট আচারটার উপর নজর পড়তেই সে একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—'কি যে করিস্ বুড়ু! অতখানি আচার নষ্ট করলি!' ব্যাঙ্ বাবু হট্টোগোল দেখে আবার একলাফ দিয়ে মধু মালতীর ঝোপের তলায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন। তখন এরা সকলে মিলে ভোম্বলকে আক্রমণ করলে। ভোম্বল কিছুমাত্র অনুতপ্ত না হয়ে বরং রেগে বল্‌লে—'দিদি যে কী! চেঁচিয়ে লাফিয়ে আমার ব্যাঙটাকে এমন ভয় পাইয়ে দিলে যে ওটা ঝেচাপের মধ্যে ঢুকে গেল, এখন ওকে বের করব কি করে! কত কষ্ট করে ধরেছিলুম!' বুড়ু ইতিমধ্যে নেমে এসেছিল বারান্দা থেকে, সে বলে উঠল—'অ্যাঁ ঐ মূর্তির আবার ভয়! ওকে দেখে আমার বুকের মধ্যে এখনও ধড়াস্ ধড়াস্ করছে! উনি খালি ব্যাঙের ভয় দেখছেন, আমাদের ভয়টা চোখে পড়ে না!' ভোম্বল আরও রেগে বল্‌লে 'তোমাদের ভয় হবেই বা কেন! ব্যাঙ্ কি তোমাদের কামড়াবে? ব্যাঙ্ মানুষ খায়? মানুষই বরং ব্যাঙ্ খায়!' ইনু শুনে হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে 'ঠিক বলেছিস্ ভোম্বল, মানুষই ব্যাঙ্ খায়, মানুষকে ব্যাঙ্ খায় না। অতএব বুড়ু তোমার ভয় পাওয়া অন্যায় হয়েছে এবং শাস্তিসরূপ তুমি আর একটু আচার নিয়ে আসবে।' মিতু বিরক্ত ভাবে বল্‌লে—'তোমরা বোসো, আমি এখানে বসে আর কিছু খেতে পারব না।'

ছোট মামা এ সময়ে বাড়ি ফেরাতে সকলেই উঠে পড়ল। তিনি মিতুকে এমন সব জিনিস দেখাতে বসলেন, আলোচনা, তর্ক তাঁর সঙ্গে এমন জমে উঠল যে মিতু, ভোম্বল ও তার ব্যাঙের কথা সাময়িক ভাবে ভুলেই গেল।

তারপর রোদ পড়লে শালবন ও খোয়াই যাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া উঠলে তিনজনে ছুটে বাড়ি আসা, বড় বড় গাছ মুচড়ে প্রচন্ড ঝড়, আকাশ ফালি ফালি করে ফাটিয়ে বিদ্যুৎ ও বাজ, বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম জল পাওয়া শুকনো মাটির সোঁদা গন্ধ সবই সহুরে মিতুর মন জয় করে নিল। কিন্তু রাত্রিটা বড় বিশ্রী গেল। ঝড়ে গাছ পড়ে কোথাও ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে যাওয়াতে আলো জ্বলল না। লণ্ঠনেরক আলোয় ইনু ও বুড়ুকে নিয়ে মামীমা রাত্রের খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করছিলেন বেশ হাসি গল্পর সঙ্গে। মামা কোথায় যেন বক্তৃতা শুনতে গেছেন। ভোম্বল লণ্ঠনের আলো-অন্ধকারে তার 'হুলুয়ার' সঙ্গে খেলা করছিল। খুব গরমের পর এই রকম ঠান্ডা বাতাস বইলে হুলুয়ার নাকি খুব খেলা পায়। মিতু শুধু মন খারাপ করে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে বাইরে গাছের মাথার ঘন অন্ধকার দেখছিল আর ব্যাঙ্ ও ঝিঁঝির একটানা ডাক শুনছিল। হুলুয়া এসে তার পায়ের উপর লাফিয়ে পড়তেই সে চম্‌কে যেই দাঁড়িয়ে উঠেছে অমনি ভোম্বল 'হেঃ হেঃ' করে বিশ্রী রকম হেসে

উঠে বল্‌লে—'ভয় পেয়ে গেলে নাকি মিতুদা, ও কামড়াবে না, শুধু খেলছে।' তার তাচ্ছিল্য ভাব ও মুরুব্বীয়ানা দেখে মিতুর এত রাগ হল যে ইচ্ছা করল ছেলেটাকে ধরে তার গালে টেনে একটা চড় কষায়, তার বিরক্তি বাড়ল মামা ও মামীমার ব্যবহারেও। রাত দুপুরে প্রকান্ড এক ইঁদুর ধরে এনে হুলুয়া বারান্দা নোংরা করে বসে বসে খেলে, তাতে মামীমা তো কিছু বল্‌লেনই না, বরং খাওয়া শেষে সে যখন 'ম্যাও ম্যাও' করে ডাকলে তখন, মিতু এ ঘর থেকে শুনতে পেল মামীমা নিজেদের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে, রান্নাঘর থেকে ভাত এনে তাকে খেতে দিলেন। মাংস খাবার পর নাকি তার চাট্টি ভাত খাবার দরকার হয়। মামার ব্যবহার আরও চমৎকার! মিতুর শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর ঘরেই। একে বই বোঝাই ছোটো ঘরে গরমে তার ঘুম আসছিল না, তার উপর মাঝ রাত্তিরে একটা 'অ্যাঁক্ উঁক' ধরনের ডাক ও বই কাগজের মধ্যে খস্ খস্ শব্দ! কি ব্যাপার বুঝতে না বুঝতেই, ছোটো মাা জেগে উঠে, ধড় মড় করে বিছানা ছেড়ে ঘরের দরজা খুলতে খুলতে বললেন, 'দাঁড়া দাঁড়া খুলে দিচ্ছি, উঃ জ্বালালে! সন্ধ্যাবেলাই তো বেরিয়ে যাস্। আজ বোধহয় বেশী লোক জন দেখে বেরুতে পারেনি, নেঃ যাঃ!' খোলা দরজা দিয়ে কে বেরিয়ে গেল দেখবার প্রবৃত্তি মিতুর ছিল না, সে শুধু মনে মনে ভাবলে 'বাবা যদি গরে ব্যাঙ্ পোষেন, তবে ছেলে কেন তার মিউজিয়মে পুষবে না!' মামা ফিরে আসলে সে শুধু জিজ্ঞাসা করবে—'ঘরের ভেতর ব্যাঙ থাকে এতে ঘরে সাপ আসবে না?' সে ভেবেছিল এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে যদি অন্যমনস্ক মামার একটু জ্ঞান হয়। কোথায় কি। মামা হেসে বললেন—'আরে আসবে কি—এসে তো ছিল! সে দিন একটা খোলোস পেয়েছি এধারের বইয়ের র‍্যাকটার তলায়, তা ব্যাঙ ব্যাটা তবু ছাড়বে না, চরে এসে রোজ ভোরবেলা এইখানেই ঢুকবে। পুবদিকের দরজা বন্ধ করে দিলে, সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঐ দরজা দিয়ে ঢুকবে এমনি বুদ্ধি! বুড়ুরা অনেক চেষ্টা করেছে ওকে তাড়াবার, কিন্তু পারেনি! মিতুর বিরক্তি চরমে উঠল যখন পরদিন সকালে জলখাবার পর ছোটমামা অফিসে বেরুবার সময় মামীমাকে হেঁকে বল্‌লেন—'ওগো, রুটি টুটি কিছু থাকে তো দাও, কালী খোকাকে নিয়ে এসেছে।' ভোম্বল 'এই যে ওদের খাবার আমি তৈরী রেখেছি'—বলে মুড়ি রুটি আর কি সব নিয়ে এসে উঠোনে অপেক্ষমান দুটি কুকুরকে দিলে। একটা বড় কাল রঙের, আর অপরটা, তার চেয়ে সামান্য ছোট, বাদামী রংয়ের। বাদামীটার পিছনের পা দুটো কি করে যেন জখম হয়েছে। তাই সে সামনের পা দুটো কালোটার পিঠে তুলে, সে চল্‌লে, খোঁড়া পা দুটো ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে তার সঙ্গে এসেছে। বোঝা গেল বড়টা কালী, আর বাদামীটা খোকা, কালীর বাচ্ছা। এখন প্রায় তার সমান লম্বা হলেও, খোঁড়া বলে কালী তাকে এই ভাবে চলতে সাহায্য করে। বেড়ালটা ওদের দেখে বারান্দার এককোণে পিঠ বেঁকিয়ে, লেজ ফুলিয়ে 'গোঁ গোঁ' করছিল। ভোম্বল তাকে শাসালে 'এই হুলুয়া, ওকী হচ্ছে! জানিস তো এরা আমাদের লোক!' মিতু আর থাকতে পারল না বলে ফেলল, 'কে তোমাদের লোক নয়? পোকা মাকড়, সাপ ব্যাঙ, কুকুর, বিড়অল সবাই তো তোমাদের!' মামা বেরিয়ে যেতে যেতে কথাটা শুনতে পেয়ে হেসে বললেন 'ওহে রাগ করছ কেন, এখন তো সহাবস্থানের যুগ বা হুজুগ চলেছে। আমরা শুধু মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করব কেন, প্রকৃতির অন্য প্রাণীগুলোর সঙ্গেও তো করা উচিত। এই ভোম্বল, তাড়া ওদের, মিতুদার ভাল লাগছে না।'

বিকালে মিতু, ইনু, বুড়ু আর বিমান বলে পাড়ার ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় তারা যখন ভাঙ্গা নীলকুটির পাশের রাস্তা দিয়ে ফিরছিল তখন হঠাৎ ইনু দাঁড়িয়ে পড়ে বল্‌লে—'দেখ্ বুড়ু, ভোম্বল না? ঠিক ঐরকম নীল সার্ট পরা একটা ছোট ছেলে যেন আমাদের দেখে চট্ করে ওই মোটা ভাঙ্গা থামটার পিছনে লুকিয়ে পড়ল।' বুড়ু বলে উঠল—'হাঁ হাঁ ভোম্বলই তো, ঐ তো কাঁটা ঝোপ আর ভাঙ্গা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে যাচ্ছে, ভাবছে আমরা দেখতে পাব না। পাজী সাপ ধরবার মতলবে চীফকুঠিতে আসে, বাবা মা কতবার বারণ করেছেন, কুঠিবাড়িটাও সাপের আড্ডা। এই ভোমলা, শীগ্‌গির চলে আয়, আবার ওখানে গেছিস্ দাঁড়া আজ বাবাকে বলে দেবই।' মিতু অবাক হয়ে বললে 'ও সাপ ধরতে যায় আর তোমরা ওকে আটকাও না? এইভাবে একদিন তো তাহলে ও মারা পড়বে। সাপের সঙ্গে সহাবস্থান তো চলবে না—বারণ যখন শোনে না তখন তোমাদের উচিত ওর কড়া রকমের শাস্তির ব্যবস্থা করা—যাতে আর কোনদিন অবাধ্য না হয়। আমি আজ ছোটমামাকে বলব।' ভোম্বল ততক্ষণে এসে ধরা-পড়ে-যাওয়া বোকা বোকা হাসিমুখে কাঁটা ফোটা

খালি পা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ওদের সঙ্গে হাঁটতে সুরু করেছিল। মিতুর শেষ কথাটা কানে যেতেই সে বলে উঠল, 'বাবাকে বোলো না মিতুদা, আর কোনদিন যাব না ওখানে। সত্যি বলছি মিতুদা। দেখো আর কক্‌খোনো যাব না।' মিতু তার কথার উত্তর দিল না। বিমানের সঙ্গে কলেজের গল্প করতে করতে চলল। রাত্রে শোবার পর যখন ছোটমামা এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসের নাম করতে গিয়ে নীলকুঠির কথা তুললেন তখন মিতুর সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ে গেল! সে খুব গুরুগম্ভীরভাবে মামাকে, ভোম্বলের যাতে কুঠিবাড়ি যাওয়া বন্ধ হয় তার চেষ্টা করতে বললে। তার বলার ভঙ্গীতে সত্যকার আশঙ্কা প্রকাশ পাওয়ায় মামা কথাটা খুবই মনে নিলেন এবং ভীষণ রেগে বললেন 'দাঁড়াও কাল আমি ওকে দেখ্‌ছি—কতদিন বারণ করেছি, কিছুতে কথা শোনে না। সেবার কাঁকড়া বিছে ধরতে গিয়ে কি কান্ড! তবু কি শিক্ষা হয়!'

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভোম্বল তিন চারটে ফুটোওলা হরলিক্‌সের বাক্স ও জুতোর বাক্স নিয়ে তার গুটি পোকাদের পরিষ্কার করা, খাওয়ান প্রভৃতি সেবা করছিল উঠোনে বসে। ছোটমামা ঘুম ভেঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়েই এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে তাকে এসে ধরলেন। রগচটা মানুষ তিনি—তাই মারতো হলই ভালরকম, সব চেয়ে বড় শাস্তি হল ভোম্বলের সবকটা কাগজের বাক্স গুটিসমেত টান মেরে ছোটমামা জঞ্জাল ফেলার জায়গায় ফেলে দিলেন এবং মেটে ঘরটার দরজায় শিকল তুলে দিয়ে একটা তালা এঁটে দিলেন। ভোম্বল নিঃশব্দে মার খেল, কিন্তু যখন তার গুটি পোকাদের ফেলে দিলেন, তখন একবার ফুঁপিয়ে উঠেই ঠোঁট কামড়ে চুপ করে চেয়ে রইল। ইনু চুপি চুপি বলে উঠল—'ইস্! ছোটমামা ওগুলো ফেলে না দিলেই পারতেন! বেচারা কত কষ্ট করে সংগ্রহ করে, কত যত্ন করে। কাল একটা মস্ত প্রজাপতি হয়েছিল, আমায় দেখিয়েছে।' মামা অফিসে বেরিয়ে যাবার পর মামীমা ছেলেকে হাত মুখ ধুইয়ে দিলেন, তারপর পড়তেও বসালেন। ভোম্বল প্রতিবাদ না করে খেল, এবং বই নিয়ে পড়তেও বসল খানিকক্ষণ, তারপর কারও সঙ্গে কথা না বলে বেরিয়ে গেল। শুধু যাবার সময় কঠিনভাবে মিতুর দিকে চেয়ে চলে গেল। বুড়ু হেসে বল্‌লে— 'বাপরে, কি চটান চটেছে ভোমলা!' ইনু কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না, সে বল্‌লে—'মিতুদা, নিজেরাই ওকে শাসন করলে ভাল হতো, মামীমা ওকে বুঝিয়ে বারণ করলে অনেক সময় ও তাঁর কথা শোনে। ছোটমামাকে বলাটা অন্যায় হল, উনি কী রকম করে বেচারার গুটিপোকার বাকসগুলো ফেলে দিলেন! কেউ যদি ছোটমামার কয়েনের বাকসটা ঐরকম করে ফেলে দেয় বা হারিয়ে দেয় তবে তাঁর কেমন লাগবে!' মিতু বল্‌লে—'কয়েন তো মানুষকে কামড়ায় না, কিন্তু সাপ যে কামনায় ইনু, সেটা যে ধরতে যাবে বিনা ট্রেনিংয়ে তাকে যেমন করে হোক আটকান ঠিক মনে করি।'

দুপুরে মামার ফিরতে সেদিন দেরী হবে জেনে, বুড়ুও ইনু নিজেদের খাবার আয়োজন করছিল বারান্দার উপর। ভোম্বল তখনও ফেরেনি। মিতু স্নান করে এসে, তার জন্য পাতা সুন্দর কারুকার্য করা আসনটি দেখছিল কাছে বসে আর বলছিল 'এমন সুন্দর সুন্দর আসন পেতে বসতে দিলে, আমার আর টেবল চেয়ারের দরকার হয় না।' এ সময় হঠাৎ কোথা থেকে হন্ত দন্ত হয়ে ভোম্বল ফিরল এবং সোজা বারান্দায় উঠে আসছে দেখে বুড়ু চেঁচিয়ে উঠল—'এই ভোম্বল এক পা ধুলো নিয়ে এখানে উঠবি না। আগে পা ধুয়ে আয়।' ভোম্বল সে কথা কানেও নিলে না। পায়ের ওপর পর্যন্ত তার ধুলোয় লাল হয়ে আছে, প্যান্টেও লাল ধুলো, কপাল বেয়ে দর্‌দর্ করে ঘাম ঝরছে, ঘামে গায়ে সার্ট লেপ্‌টে গেছে। দুইহাতে নিজের পাশের একটা পকেটে কী যেন চেপে ধরে সে কিরকম সন্দেহজনকভাবে সোজা মিতুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মিতুও একটা অজানা আশঙ্কায় দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে—'কী চাই?' ভোম্বল কোনো উত্তর দিল না, শুধু নিজের পকেট থেকে কি যেন বের করে, মিতু বোঝবার আগেই বিদ্যুৎবেগে ওর পাঞ্জাবীর পাশের পকেটে ঢুকিয়ে দিলে, তারপর এক লাফে বারান্দা থেকে উঠোনে পড়ে হাওয়া! বুড়ু ও ইনু হক্‌চকিয়ে চেয়ে রইল। মিতু শুধু বুঝতে পারল তার পকেট থেকে সড়্‌সড়্ করে একটা জীবন্ত কিছু বেরিয়ে আসছে, সেটা যখন তার পা বেয়ে নামছিল তখন একটা অমানুষিক চীৎকার করে সে লাফিয়ে একেবারে উঠোনে পড়ে গেল। গোলমাল শুনে মামীমা রান্না ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখেন মিতু উঠোনে বসে পড়েছে আর তার কিছু দূরে একটা মাঝারি গোছের হেলে সাপ বাগানের দিকে পালাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি এসে মিতুকে ধরলেন; বোনেরাও ছুটে এল।

চোখে মুখে জল দিয়ে, কাপড় জামা বদলিয়ে মিতুকে যখন মামীমা ঘরে পাখার তলায় একটা ইজি চেয়ারে বসেয়ে

দিলেন তখন বললেন—'ভোম্বলকে আমি দেখে নেব। কিন্তু এবার তুমি একটু কিছু খাও, একটু সরবৎ করে দিই,— ভাত এখন খেতে পারবে না, বেলায় খেও। কিন্তু অতক্ষণ না খেয়ে থাকলে পিত্ত পড়ে যাবে!' মিতু তখন সোজা হয়ে বসে কঠিনস্বরে বল্‌লে—'আমি আর কিছুই খাব না ছোটমামীমা, শুধু আমার সুটকেশটা গুছিয়ে নিয়ে রিক্‌সা করে স্টেশনে চলে যাব। ইনু—চট্ করে তৈরী হয়ে নাও!' ইনু তার দাদাকে চিনত, তাই কোনো প্রতিবাদ না করে বললে—'আমি তৈরীই আছি মিতুদা, কিন্তু এখন তো কোনো ট্রেন নেই কলকাতায় যাবার, বিকাল চারটেয় ট্রেন, তিনটে নাগাৎ বেরুলেই হবে, তুমি এখন একটু বিশ্রাম করে নাও।' খানিক পরে কোনো মতে একটু ভাত খেয়ে ইনু, বুড়ুর করা এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে মিতুর ঘরে গেল একলা। সে আস্তে আস্তে বল্‌লে 'মিতুদা, ভোম্বল খুবই অন্যায় কাজ করেছে। কিন্তু ছোটমামা, ছোটমামীমা তো তোমায় যথাসাধ্য আদরযত্ন করেছেন, তাঁদের তুমি কেন শাস্তি দিচ্ছ? এরকম করে হঠাৎ চলে গেলে ছোটমামা ভোম্বলকে যে কী করবেন, তা ভাবতেই পারছি না। কালকে যেও লক্ষ্মীটি! আর একটি কথা, ছোটমামাকে কিছু বোলো না। তা হলে তিনি এত রেগে যাবেন যে—' বাধা দিয়ে মিতু বলে উঠল—'যে ভোম্বলকে মেরেই ফেলবেন! এই তো? খুব ভাল বিচার তোমার ইনু! মামাতো ভাইয়ের দিকটাই দেখছ, —আর সে যে তোমার জ্যাঠ্‌তুতো ভাইয়ের জীবন নাশ করবার চেষ্টা করলে সে দিকে নজর নেই। আমার প্রাণের কোনো দাম নেই তোমার কাছে!'

ইনু, মিতুর হাত চেপে ধরে বল্‌লে—'ছিঃ ছিঃ মিতুদা তুমি বুঝি তাই ভাবছ! তুমি এখানে থাকনা তাই জান না, আর সাপটাপ বেশী দেখও নি তাই চেনো না। ওটা হেলে সাপ মিতুদা, ওর একেবারে বিষ নেই। কাউকে কামড়ায় না বলে এখানকার ছেলেগুলো প্রায়ই ওগুলোকে ধরে। তুমি বুঝি ভাবছ ভোম্বল তোমায় সাপের কামড় খাইয়ে, মেরে ফেলতে চেয়েছিল। বিশ্বাস কর ও সত্যি অত খারাপ নয়, ওর মাথায় অত ভাবনা আসেও নি। ছেলেরা যেমন ভয় দেখায় তেমনি করতে চেয়েছিল। আমি যখন এখানকার স্কুলে পড়তাম তখন কতদিন ক্লাশের দুষ্টু ছেলেগুলো ভয় দেখাবার জন্য আমাদের মেয়েদের দলের মাঝখানে হেলে সাপ ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। কিছুদিন এখানে থাকলে তুমিও ওটা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে যেত।' মিতু যেন খানিকটা আশ্বস্ত হল কিন্তু গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—'তোমাদের এখানকার ঠাট্টা তামাসাটা রপ্ত হতে আমার সময় যাবে। তার দরকার নেই—যাক্, বেশ কালই যাব।' ইনু আরো খানিকক্ষণ বুঝিয়ে মিতুকে একটু ঠান্ডা করে তাকে ভাতও খেতে বসাল এবং ছোটমামা যাতে কিছু জানতে না পারেন, সে ব্যবস্থা আপনি হয়ে গেল। বিকালে একজন বড় ঐতিহাসিক বন্ধু আসবেন ছোটমামার সংগ্রহ দেখতে, এই খবর নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন অনেকটা বেলায়। কোনমতে স্নানাহার সেরে তিনি মিতুকে ডেকে নিয়ে তাঁর মূল্যবান সংগ্রহগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে বসলেন। মিতুর পরামর্শ মতই অনেক জিনিস সাজান হল—সে এই নিয়ে এত মেতে গেল যে ভোম্বলের ব্যাপার আপনিই চাপা পড়ে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা, তাকে সব দেখান মিতু একান্ত উৎসাহের সঙ্গেই করলে। এত বড় একজন ঐতিহাসিকের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে ইতিহাস প্রিয় মিতু ভারী খুসিও হয়েছিল। চা ও জলযোগের পর তিনি চলে গেলে ইনু ভেবেছিল মিতু বোধহয় কাল যাবে না। কিন্তু জেদী মিতুর কথা ফিরল না। কাল চলে যাবে শুনে রাত্রে ছোটমামা ক্ষুন্ন হয়ে বললেন—'সে কী কালই চলে যাবে? আমাদের এখানে মিতুর ভাল লাগছে না, বোধহয়! যা রুক্ষ্ম গরম, তার ওপর এই ছোট বাড়ি, কষ্ট হচ্ছে বড্ড না?' মিতু 'না না।' করে বললে যে বাড়িতে তার বিশেষ কাজ আছে, তাকে ফিরতেই হবে, ইনু থেকে যেতে পারে। পরে ওকে পৌঁছে দিলেই হবে। ভোম্বলের কথা কিছু বল্‌লে না। বল্‌তে গেলে যেন নিজেকে অনেক ছোট করে ফেলা হবে মনে হল।

পরদিন সকালে স্টেশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যখন দুজনে রিকসায় চড়ে বসেছে তখন সহসা মাঠের দিক থেকে ছুটে ভোম্বল এসে হাজির হল। ছোট, বড়, রঙিন, স্বচ্ছ, নিটোলগোল প্রভৃতি নানা রকমের এতগুলি নুড়ি পাথর এনে মিতুর কোলের উপর রেখে বল্‌লে 'দেখো খোয়াই থেকে তোমার জন্য নিয়ে এলাম মিতুদা, এগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখ, রাগ কোরো নামিতুদা, আর কক্‌খোনো ওরকম করব না।' কাল বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে ওরা ভোম্বলকে দেখেনি। সে কখন চুপি চুপি বাড়ি ফিরেছে। মামীমা তাকে কি বলেছেন, কিভাবে শাসন করেছেন, সে কখন খেয়েছে, কখন ঘুমিয়েছে এবং আজ কত ভোরে উঠে খোয়াই গেছে তা তারা

কিছুই জানতে পারেনি। রিকসা চলতে আরম্ভ করেছিল, ভোম্বল ছুটতে ছুটতে খানিক দূর গেল রিকসার পিছন পিছন এই বলতে বলতে,—'আবার এসো মিতুদা, আবার এসো ইনুদি, রাগ কোরো না, আর কক্‌খোনো করব না!' মিতু কাঠ হয়ে বসে রইল, এক রাস পাথর কোলের উপর ধরে, তার গলার কাছে কী যেন ঠেলে উঠে ব্যথা করছিল। আর ইনু চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলল। দুজনের কেউই ভোম্বলের কথার উত্তর দিতে পারল না।

(কার্তিক-১৩৮৬)

ছবি : দেবাশীষ দেব

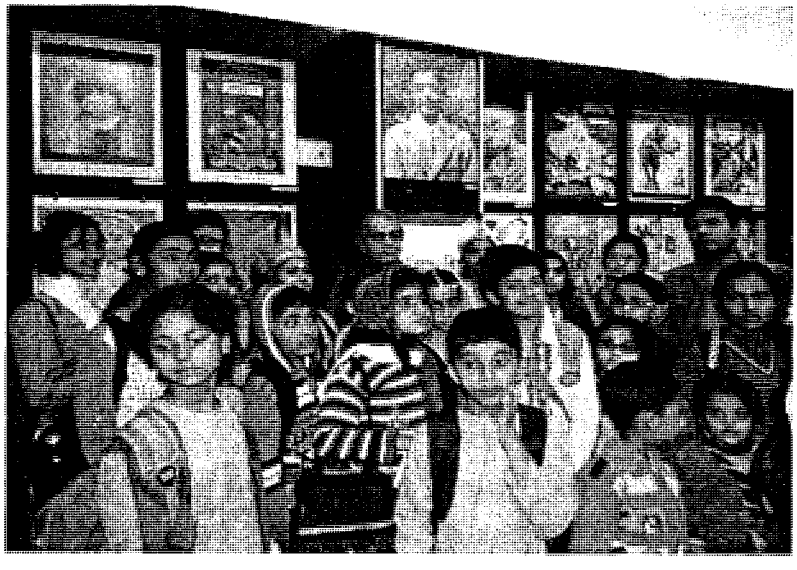

নন্দনে সন্দেশ-এর প্রদর্শনীতে সম্পাদকের সন্দেশীরা

মিত্র ও ঘোষ
প্রকাশিত
কিশোর সাহিত্য
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
mitraghoshpublishcrpvtltd@gmail.com
www.mitraandghosh.co.in

জ্ঞান বর্ধন

এ গল্প পাঠ করে নায়কের নাম কেউ যদি দেন ছত্র বর্ধন, আপত্তি করা যাবে না। জ্ঞান বর্ধন তাঁর আসল নাম, এ রকম একটা নাম অবশ্য সচরাচর দেখা যায় না।

ভদ্রলোকের নামের প্রথমাংশের পুরোটা যে কি, শ্যামব্রত না জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নাকি অন্য কিছু, সে বিষয়ে কোনও খোঁজখবর নিইনি। কারণ এখন তাঁকে ছত্র বর্ধন বলাই উচিত।

সে যা হোক, জ্ঞান বর্ধন এক ভদ্রলোকের পুরো নাম। ভদ্রলোক আবার জীবন যাপন করেন ছাতা সংগ্রহ করে। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম ছাতাটি উপহার পেয়েছিলেন তাঁর বিদায় সম্বর্ধনা সভায়। এবং দুঃখের বিষয়, সেই ছাতাটি তিনি সেই দিনই বাড়ি ফেরার পথে বাসে হারিয়ে ফেলেন।

তারপর থেকে জ্ঞানবাবু সর্বত্র তাঁর সেই হারান ছাতাটাকে খুঁজে যাচ্ছেন এবং এই কাজেই তাঁর অবসর জীবন ব্যয় করছেন।

অবশ্য হারানো ছাতাটি না পাওয়ায় সে স্থানে অন্য যে কোন ছাতাই, সম্ভব হলে, সংগ্রহ করা তাঁর এখন একমাত্র কাজ।

একটু পেছন থেকে বলি। জ্ঞান বর্ধন লেখাপড়া জানা লোক। কোলকাতায় কলেজে অধ্যাপনা করতেন তিনি, তাঁর বিষয় ছিল দর্শন শাস্ত্র। কিন্তু তাঁর ছাত্র সংখ্যা যখন কমতে কমতে প্রায় শূন্যে গিয়ে দাঁড়াল, তিনি অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিলেন, নেহাতই আত্মসম্মান বোধ থেকে।

এই ছাত্র কমতির ব্যাপারে জ্ঞানবাবুর ব্যক্তিগত কোন ত্রুটি ছিল না। বরং তিনি খুব মনোযোগী এবং ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। ফাঁকি-টাকি দেওয়া তিনি মোটে জানতেন না। ছাত্রদের ভালোবেসে তিনি পড়াতেন, ছাত্ররা তাঁকে ভালোবাসতো।

কিন্তু দেশ থেকে দর্শন পড়ার চল উঠে গেল। খারাপ-ভালো সব ছাত্র-ছাত্রীই এখন বিজ্ঞান পড়তে চায়। বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, নিদেন পক্ষে অর্থনীতি, পরিসংখ্যান বা রাষ্ট্রনীতি।

আগে তবু দু'চারজন করে ছাত্র হচ্ছিল ক্লাসে, কিন্তু শেষে একেবারে কমে গেল। জ্ঞানবাবুর অবশ্য পাকা চাকরি, ছাত্র না থাকলেও তাঁর চাকরি যেত না। কিন্তু জ্ঞানবাবু একটু

খামখেয়ালি মানুষ। দর্শনের অধ্যাপকেরাও এমন হয়। তিনি বিনা কাজের, বিনা পরিশ্রমের এই চাকরি একদিন ধুত্তোরি বলে ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁর সাতচল্লিশ বছর বয়েস।

এটা পাঁচ বছর আগের কথা। এখন জ্ঞানবাবুর বয়েস বাহান্ন। জ্ঞানবাবু বলেন, 'তিপ্পান্ন, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন।'

তা, অবসর গ্রহণ করার পরে, বিশেষত জীবনের প্রথম ছাতাটি প্রথম দিনেই হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর থেকে, যেন-তেন প্রকারে ছাতা সংগ্রহ করা প্রাক্তন অধ্যাপক জ্ঞান বর্ধনের জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

।। ২।।

খেপিপিসি

জ্ঞানবাবুর অবশ্য চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনও ঝুঁকি ছিল না। তিনি সংসারী মানুষ নন, বিয়ে-থা করেননি। তিন কুলে তাঁর একমাত্র বুড়ি পিসিমা ছাড়া কেউ নেই।

বুড়ি পিসির নাম খেপি। ছোটবেলা থেকেই তিনি খ্যাপাখ্যাপা। কবে নাবালিকা বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, কবে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে, মানে জ্ঞানবাবুদের এই কাঁকুড়গাছির পুরনো বাড়িতে, চলে এসেছিলেন সে সব ইতিহাসের বিষয়। তারপর দুটো মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। মন্বন্তর, দেশভাগ কত কি?

খেপিপিসি চার ভাইবোনের মধ্যে ছিলেন অগ্রজা। জ্ঞানবাবুর বাবা নগেন্দ্র বর্ধন খেপিপিসির থেকে মাত্র এক বছর ছোট ছিলেন। খেপিপিসি ছাড়া এখন আর কেউ বেঁচে নেই।

বছর তিরিশের আগে নগেনবাবু একবার কি একটা কাজে দিল্লি গিয়ে ছিলেন। সেখানেই তিনি এক পথ-দুর্ঘটনায় মারা যান।

এর অনেক আগেই অবশ্য জ্ঞানবাবুর মা মারা গিয়েছেন। বাবা-মা দুজনেই মারা যাওয়ার পরে একমাত্র ওই খেপিপিসি ছাড়া জ্ঞানবাবুর নিজের বলতে কেউ রইল না।

এদিকে হয়েছে কি, নগেনবাবু যে মারা গেছেন, এ কথা খেপিপিসি কোন দিনই বিশ্বাস করেননি। তিনি মনে করতেন, তাঁর ভাই নগেন এখনও বেঁচে আছেন।

সম্প্রতি বছর দশেক খেপিপিসি ভাইপো জ্ঞানকেই তাঁর ভাই নগেন বলে ভাবেন। জ্ঞানবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হলে পিসি তাঁকে 'নগেন' নামেই সম্বোধন করেন।

প্রথম প্রথম জ্ঞানবাবু পিসিকে অনেক রকম বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, 'পিসি আমি কিন্তু বাবা নই। আমি হলাম জ্ঞান, তোমার ভাইপো। বাবা ছিল নো জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞান নয়, নগেন।'

তারপর একটু থেমে পিসিকে বলেছেন, 'পিসি, তুমি ইংরেজি জানো তো? নো মানে জানো তো?'

খেপিপিসি হেসে ফেলেছেন, বলেছেন, 'তুই কি যে বলিস নগেন, আমি আর তুই এক সঙ্গে লিচুতলার ইস্কুলে পড়েছি, তোর মনে নেই? সেই যে শ্যাম মাস্টার, ইয়া গোঁফ, নাক ভর্তি নস্যি, মুখ ভর্তি দোক্তাপান।'

জ্ঞানবাবু প্রতিবাদ করেছেন, 'আমি তোমার ভাই নগেন নই। আমি কোন শ্যাম মাস্টারের কাছেও কখনও পড়িনি। আমি প্রথম থেকে হেয়ার স্কলে পড়েছি।'

খেপিপিসি বলেছেন, 'তোর কিছুই মনে নেই নগেন। এই তো সেই সেদিনের কথা। আমি, তুই, বিন্দু, মধু সবাই মিলে শেলেট-বই নিয়ে লিচুতলায় শ্যাম মাস্টারের ইস্কুলে যেতাম। ওই যে ইয়েস-নো কি বললি, তার চেয়ে অনেক বেশি — বি-এল-এ-ব্লে, সি-এল-এ ক্লে, তারপর বি-আই-টি-ই বাইট, সি-আই-টি-ই সাইট, কে-আই-টি-ই কাইট—কত কঠিন কঠিন ইংরেজি পড়েছি।'

এবার একটু ভেবে নিয়ে খেপিপিসি বললেন, 'সত্যি তোর কিছু মনে নেই নগেন? সব কিছু ভুলে গেছিস, আচ্ছা বলতো, 'রাস্তায় একটি খোঁড়া লোকের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল' ইংরেজি কী?'

জ্ঞানবাবু রেগে গেলেন, 'এসব আমি ঢের জানি। প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক, সেকেন্ড বুক আমিও পড়েছি। কিন্তু একটা কথা আমি শেষবারের মত তোমাকে বলছি, আমি তোমার ভাই নগেন নই। আমি জ্ঞান, তোমার ভাইপো।'

এ কথা শুনে খেপিপিসি হেসে ফেললেন, 'জ্ঞান আসবে কোথা থেকে? সে তো বিলেত গেছে মেম বিয়ে করার জন্যে।'

জ্ঞানবাবু রাগ করতে পারেন না। খেপিপিসির এ কথাটা অর্ধেক সত্যি। এম.এ. পাশ করার পরে ভালো স্কলারশিপ পেয়ে চার বছর বিলেতে গবেষণা করেছেন তিনি, কিন্তু মেম বিয়ে করেননি।

জ্ঞানবাবুর মনে আছে, তিনি যখন বিলেত থেকে ফিরছিলেন, তখন খেপিপিসি সান্নিপাতিক জ্বরে প্রলাপ বকছেন। তাঁর ফিরে আসার কথা খেপিপিসির স্মৃতিতে কোনো রকম দাগ কাটেনি।

সে যাই হোক, জ্ঞান-নগেনের অসম লড়াইতে বহুবার রণে ভঙ্গ ফিরে জ্ঞানবাবু খেপিপিসির কাছে আত্মসর্মপণ করেছেন। আজকাল আর পিসি তাঁকে 'নগেন' বলে ডাকলে তিনি বিশেষ প্রতিবাদ করেন না।

।। ৩ ।।

ছত্রবর্ধন

হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলে বা হয়ে গেলে অনেককে অসুবিধেয় পড়ে, আর্থিক টানাটানি দেখা দেয়। কিন্তু জ্ঞানবাবুর কোনও অসুবিধেই হয়নি। প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদিতে কলেজ থেকে কিছু নগদ টাকা পেয়েছিলেন। পেনশন পাননি, শুনেছেন পাবেন, অবশ্য তা নিয়ে জ্ঞানবাবু মোটেই মাথা ঘামান না।

কাঁকুরগাছিতে পুরনো বাংলা ইঁটের ভাঙা দেয়াল দিয়ে ঘেরা তাঁদের প্রাচীন বসতবাটি। সে বাড়িতে একতলা, দোতলায় সামনের দিকে ঘরে ঘরে ভাড়াটে। পেছনের দিকে দোতলায় জ্ঞানবাবু থাকেন, একতলায় থাকেন খেপিপিসি। সামনের দিকের আট-দশ ঘর ভাড়াটে কম-বেশি যা ভাড়া দেয় তাতেই পিসি-ভাইপোর মোটামুটি চলে যায়।

বাড়িটা পুরনোকালের। খাট পালঙ্ক, চেয়ার-আলমারিতে কাঁসা-পিতলের বাসনকোসন, বেলজিয়াম গ্লাসের দামি আয়না, এ সবও অনেক। কিন্তু সে সব ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে।

এ বাড়ির সামনে আর পিছনে কয়েকটা থাম বাঁধানো গাছ আছে। কয়েকটা সুপুরি গাছ, দুটো নারকেল গাছ। পুরনোকালের একটা আমলকি গাছ আকাশ ছাড়িয়ে উঠে গেছে।

এ সব ছাড়াও চিলেকোঠা ঘরে আছে খারাপ-ভালো, আস্ত-ভাঙা চৌত্রিশটা ছাতা। এর মধ্যে তেইশটা ছাতা পুরুষদের, যাকে বলে জেন্টস্ ছাতা। আটটা লেডিস্ ছাতা। আর তিনটে কমন ছাতা, পুরুষ-মহিলা যে কারও হতে পারে। এ সব ছাড়াও আরও গোটা পাঁচেক বেবি ছাতা আছে, রঙ-বেরঙের, যেগুলো এই হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি।

এত সব ছাতার মধ্যে একটা রয়েছে ট্রাফিক কনস্টেবলের ছাতা, উপরে সাদা, নিচে কালো, দু'রকম কাপড় লাগান আছে। এ ছাতাটি যখন সংগ্রহ করেন সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে জ্ঞানবাবুর। মাত্র দু'বছর আগের কথা।

চৈত্রের শেষ। গনগনে গরমে কলকাতা জ্বলছে। বাতাসে পিচ গলার গন্ধ। তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন জ্ঞানবাবু। পড়াশুনো করা যতটা উদ্দেশ্য তার চেয়ে বেশি উদ্দেশ্য হল ছাতা হাতানো।

ছাতা হাতানোর পক্ষে পাঠাগার, সভাকক্ষ, চায়ের দোকান খুব সুন্দর জায়গা। বৃষ্টির দিনে বিয়েবাড়ি বা শ্রাদ্ধবাসরেও উটকো ছাতা পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরি ঘর থেকে বিফল মনমরা হয়ে জ্ঞান বর্ধন বেরিয়ে এলেন। কি রকম সাংঘাতিক বুদ্ধি করেছে লাইব্রেরি, এখন আর ছাতা, ব্যাগ ইত্যাদি পাঠাগারের ভেতরে নিয়ে যাওয়া যায় না। গেটের পাশে দারোয়ানের ছোট কাঠের ঘরে জমা রেখে যেতে হয়, তার বদলে টোকেন দেয়, ফিরে যাওয়ার সময়ে টোকেন দিয়ে জিনিষপত্র ফেরত নিতে হয়।

অনেকক্ষণ লোলুপ দৃষ্টিতে দারোয়ানের ঘরের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন অধ্যাপক জ্ঞান বর্ধন। কত সুন্দর, কত বাহারি সব ছাতা। কিন্তু তাঁর নিজের কোনো টোকেন নেই, এই একটি ছাতাও তাঁর নয়।

রগচটা গরম ছিল সারাদিন। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে থিয়েটার রোডে তিনি দেখলেন আকাশ কেমন যেন আধা কালো। সূর্য কিংবা রোদ স্পষ্ট নয়, কিন্তু উত্তাপ এখনও খুব চড়া, কেমন ধোঁয়াটে চারধার, শীতের সকালের মত।

জ্ঞানবাবু অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি জানেন, এ হল ঝড়ের পূর্বাভাস। তিনি দ্রুতপথে পশ্চিম মুখে হাঁটতে লাগলেন। চৌরঙ্গী আর থিয়েটার রোডের মোড় পেরোলে বিড়লা তারাঘরের সামনে বাস স্টপ, সেখান থেকে কাঁকুরগাছির মিনিবাস পাওয়া যাবে। বাড়ি ফিরতে দেরি করলে চলবে না, সন্ধ্যা হয়ে গেলে খেপিপিসি উথাল পাতাল করেন।

বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ঝড়টা হৈ হৈ করে এসে গেল। প্রচণ্ড বেগে দমকা হাওয়া আর সেই সঙ্গে ধুলোবালি, ঝরা পাতা। ফুটপাথের পাশে পর পর কয়েকটা

বাদাম গাছ আছে, তারই আড়ালে আশ্রয় নিলেন জ্ঞানবাবু।

ঠিক এই সময়েই তিনি দেখলেন বিড়লা তারাঘরের সামনে ট্র্যাফিক স্ট্যান্ডের কনস্টেবলের ছাতাটা তাঁর হাত থেকে ছিটকিয়ে হাওয়ায় উড়ে মধ্য ময়দানের দিকে ভো-কাটা-ভো ঘুড়ির মত চলে গেল।

বাতাসের তোড় দেখে কনস্টেবল ভদ্রলোক ছাতাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়েই এই দুর্ঘটনা। প্রথমে তিনি টের পেলেন না ছাতাটি ঠিক কোন্ দিকে উড়ে গেল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

বাদাম গাছের আশ্রয় থেকে জ্ঞানবাবু কিন্তু ছাতাটাকে লক্ষ্য রাখছিলেন। কোনাকুনি ভাবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে ছাতাটা উড়ে যাচ্ছে।

আর দেরি করলেন না তিনি। ঝড়ের বেগ একটু কমে এসেছে। সামনে নালাটা এক লাফে পার হয়ে, এ বয়েসে ঝোড়ো হাওয়ায় যতটা জোরে ছোটা যায় ঠিক ততটা জোরে ছাতাটায় পশ্চাধাবন করলেন। খুব বেশি দূর যেতে হল না, দেখা গেল কিছু দূরে ছাতাটা মাঠের মধ্যে মুখ থুবড়িয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ছুটতে অসুবিধে হচ্ছিল, দুয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়েও গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাতাটা ধরতে পেরেছিলেন।

একটু পরে ঝর-ঝর করে বৃষ্টি এল, ছাতাটা পেয়ে জ্ঞানবাবুর খুবই উপকার হয়েছিল। ছাতাটা মাথায় দিয়ে রেড রোডে একবার হাত তুলতেই পর তিনটে ট্যাকিস দাঁড়িয়ে গেল, সবাই ভেবেছে তিনি কোন ট্র্যাফিক কনস্টেবল।

সে যাই হোক, প্রথম ট্যাকিস তে চড়ে তিনি যখন কাঁকুড়গাছি পৌঁছলেন সে বেচারি ট্যাকিসওলা কিছুতেই ভাড়া নিতে চায় না।

।। ৪ ।।

বিবরণী

জ্ঞানবাবুর সংগৃহীত প্রতিটি ছাতার পেছনে এই রকম রোমাঞ্চকর ইতিহাস আছে।

তিনি ছাতা সংগ্রহ করেননি এমন জায়গা এই শহরে বিরল। তিনি বৃষ্টি ভেজা বড়দিনের মধ্যরাতে সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রালের উপাসনাগৃহ থেকে ছাতা সরিয়েছেন। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকদের প্রবেশপথ থেকে, রাজভবনের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে, এমনকি লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান-কর্তার চেম্বারের সামনের অফিস ঘর থেকে ছাতা সংগ্রহ করেছেন।

প্রতিটি ছাতার গায়ে আলপিন দিয়ে ছোট-ছোট কাগজের স্লিপ লাগান আছে। সেই সব স্লিপগুলিতে কবে, কি ভাবে ছাতাগুলি সংগৃহীত হয়েছে এবং সম্ভব হলে পূর্বতন মালিকের নাম ঠিকানা ইত্যাদি লেখা আছে।

দুয়েকটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যাক,

(এক) তালিকা নং লেডিস-৭

লেডিস ছাতা। পুরনো বিলিতি জিনিস। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৬, রাত বারোটা সেন্ট পল্‌স ক্যাথেড্রাল থেকে সংগৃহীত। সম্ভবত কোনো বুড়ি মেমসাহেবের ছাতা।

(দুই) তালিকা নং জেন্টস্-২০

জেন্টস্ ছাতা, প্রায় নতুন, মাঝারি মানের। ২৭ শে মার্চ ১৯৯৬, দুপুর বেলা লালবাজার গোয়েন্দা দপ্তর থেকে সংগৃহীত। মালিক পিক-পকেট সেকশনের বড়বাবু।

এই রকম সব বিবরণ। এত সংক্ষেপে সব কিছু জানা যায় না, যেমন লালবাজার থেকে চুরি করে আনা ছাতাটি।

সেবার এক মাসের মধ্যে পর পর তিনবার পকেটমার গেল জ্ঞানবাবুর। দুপুরে খেয়ে দেয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন, ট্রামে, বাসে সারা শহরে চক্কর দেন। উদ্দেশ্য একটাই, যদি কেউ কখনও ভুলে গাড়ির মধ্যে ছাতা ফেলে নেমে যায় তবে তখনই সেটা হস্তগত করে পরের স্টপেজে নেমে যাওয়া।

কিন্তু সে বার ওই এক মাসে একটিও ছাতা সংগ্রহ করতে পারলেন না, অথচ তিনবার পকেট মারা গেল। শেষ বার যখন পকেট মারা গেল ঠিক লালবাজারে সামনে বাস থেকে নামার সময়, জ্ঞানবাবু সরাসরি লালবাজারের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

তারপর একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে, দুয়েকটা বাধা পেরিয়ে সরাসরি গোয়েন্দা প্রধানের ঘরে।

গোয়েন্দা প্রধান যখন শুনলেন যে জ্ঞানবাবু একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, তিনি তাঁকে যথেষ্ট খাতির করলেন। এবং যখন শুনলেন যে এক মাসের মধ্যে তিনবার পকেটমারি হয়েছে যথেষ্ট সহানুভূতি জানালেন, তারপর বেল বাজিয়ে সেপাইকে ডেকে বললেন, 'ওই যিনি পিকপকেট করেন, তাঁকে একটু

ডাকো।'

পিক পকেট করার লোক লালবাজারের মধ্যেই রয়েছে এটা জেনে জ্ঞানবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি অবস্থা হয়েছে দেশের!

একটু পরে প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট পরা এক মধ্যবয়েসি ভদ্রলোক এলেন। তিনিই পিকপকেট করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আশা পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা, ইনি পিকপকেট করেন মানে ইনি পিকপকেট শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

গোয়েন্দা প্রধান অফিসারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতেই জ্ঞানবাবু বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে, তাঁকে বলা হল পিকপকেট সেকশনে অপেক্ষা করতে।

সামনেই বড় ঘরের এক পাশ পিকপকেট সেকশন। ঘর প্রায় খালি, শুধু দরজার পাশে দুজন রোগা, কালো, সন্দেহজনক চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আর সামনের টেবিলের পাশে কাঠের আলমারির গায় একটা ছাতা দাঁড় করানো রয়েছে।

বিন্দুমাত্র বিচার বিবেচনা না করে ছাতাটি শক্ত করে বাগিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানবাবু।

চুলোয় যাক পকেটমার ধরা! সস্তার প্ল্যাস্টিকের মানিব্যাগে ছিল তো মোট পাঁচ টাকা ষাট পয়সা। তার চেয়ে এই ছাতা ঢের ভাল।

।। ৫ ।।

সমাধান

এই রকম সব ঘটনার ফিরিস্তি লম্বা করে লাভ নেই। সে খুব একঘেঁয়ে হয়ে যাবে।

আসল কথা এই যে, ছাতা সংগ্রহের রোমাঞ্চকর কাজটা ভালোই উপভোগ করছিলেন জ্ঞানবাবু। অবসরের দিনগুলি শুয়ে বসে না কাটিয়ে মোটামুটি উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি।

মাসে-দুমাসে একটা ছাতা সংগ্রহ করতে পারলেই হল। সব দিনেই ছাতা পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। চাকরিতেও তাই, মাসে একদিন মাইনা হয়, কিন্তু কাজ করতে হয় সব দিনই।

সে যা হোক, আজ বছর দুয়েক হল খুব মন্দা চলছে ছাতা সংগ্রহে।

লোকজন খুব সেয়ানা হয়ে গেছে। ছাতা ব্যাগের মধ্যে পুরে বাসে-মিনিবাসে যাতায়াত করে। শিশুরা বর্ষাতি পরে। তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে চকলেট দিয়ে ছাতা হাতাবার সুযোগ নেই।

আজকাল প্রাণপণ প্রয়াস করেও একটা ছাতা দখলে আনা যায় না।

এই তো সেদিন হাতের মধ্যে থেকে একটা ছাতা ফসকিয়ে গেল। সে আফসোস জ্ঞানবাবুর এখনও যায়নি।

ছাতার সন্ধানে সেদিন ফুলবাগানের মোড়ে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে চতুর্দিকে খেয়াল রাখছিলেন। এই সময়ে একটা প্রাইভেট বাস থেকে নামতে গিয়ে একটা ভীষণ মোটা-মতন লোক চিৎপটাং হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। তাঁর হাতে ধরা একটা ছাতা ছিটকিয়ে কয়েক হাত দূরে চলে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে তীব্র ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছাতাটি তুলে নিয়ে জ্ঞানবাবু সামনের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

কিন্তু কোন লাভ হল না। ওই রকম মোটা মানুষ, যে অমন দ্রুত ছুটতে পারেন সেটা ভাবা কঠিন। জনারণ্য ভেদ করে পর্বত প্রমাণ শরীর নিয়ে ভদ্রলোক ছুটে এসে জ্ঞানবাবুর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে এক ঝটকায় ছাতাটা কেড়ে নিলেন।

জ্ঞানবাবুর সেই প্রথম ধরা পড়া। এর পর থেকে তিনি মনমরা হয়ে আছেন। ছাতা সংগ্রহে উৎসাহ পাচ্ছেন না।

এদিকে কি করে অবসর জীবনের নিষ্কর্মা দিনগুলি কাটাবেন সেটা যেমন একটা বড় সমস্যা, তেমনিই আবার এই কয় বছরে ছাতা হাতানো একটা নেশার মত হয়ে গেছে। অবশেষে অনেক ভেবে একটা সমাধান বের করেছেন জ্ঞানবাবু।

ছাতা সংগ্রহের কাজ এখনও চলবে। তবে বাড়ির বাইরে নয়। তাই বলে ভাড়াটেদের ছাতায় হাত দেবেন না। ধরা পড়লে, সে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

এখন সম্বল খেপিপিসি। জ্ঞানবাবু খেপিপিসিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছাতা ছাড়া কষ্ট হয় না?'

পিসি অবাক, 'আমি তো বাড়ির মধ্যে থাকি। আমি ছাতা দিয়ে কি করব?'

জ্ঞানবাবু বললেন, 'আজকালকার লোকে বাড়ির মধ্যেও ছাতা ব্যবহার করে, অনেক বাড়ির ছাদ দিয়ে এত জল পড়ে। আমাদেরও তো পুরনো বাড়ি। আমি তোমাকে একটা ছাতা

কিনে দেব।'

পিসি বললেন, 'তোর দোতলায় জল পড়তে পারে, আমার একতলায় তো জল পড়বে না। তা তুই যখন বলছিস, দিস। একটা ছাতা কিনে দিস।'

বাজার থেকে ছাতা কিনে এনে পিসিকে দিয়ে জ্ঞানবাবু বললেন, 'খুব সাবধান! আজকাল চারদিকে খুব ছাতা চোর হঠাৎ নিয়ে না চলে যায়।'

ছাতা পেয়ে খেপিপিসি খুব খুশি। বললেন, 'আমার কাছ থেকে ছাতা চুরি করবে এমন চোর এখনও জন্মায়নি।' তারপর ছাতাটা খুলে জ্ঞানবাবু পিসির হাতে দিতে তিনি সেটা মাথায় দিয়ে বললেন, 'কি ভালো লাগছে ছাতা মাথায় দিয়ে, মনে হচ্ছে শ্যামমাস্টারের ইস্কুলে যাচ্ছি। আচ্ছা নগেন, তুই বলত ছাতার ইংরেজি কী?'

জ্ঞানবাবু যথারীতি প্রতিবাদ করলেন, 'আমি নগেন নই। আমি শ্যামমাস্টারের কাছে পড়িনি। আমি পড়েছি হেয়ার স্কুলে।'

খেপিপিসি এখন আনন্দে ছাতা মাথায় দিয়ে উঠোনে পাক খাচ্ছেন, আর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে জ্ঞান বর্ধন মনে মনে কৌশল করতে লাগলেন কত তাড়াতাড়ি পিসির ছাতা হস্তগত করা যায়। অবশ্য জ্ঞানবাবু ভালো লোক। পিসিকে বঞ্চিত রাখবেন না। একটা ছাতা সরাতে পারলেই, তাঁকে আরেকটা ছাতা কিনে দেবেন।

ছবি : দেবাশীষ দেব

(শারদীয়া-১৪০৭)

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা চামুণ্ডার ছবি

সন্দেশ-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য থীমা-র বই

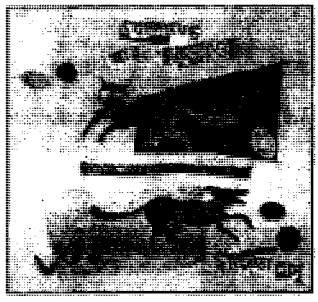

দেখি শুনি পড়ি লিখি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ২৫০ টাকা।
যে-ভাষার চর্চায় ও নবনির্মাণে তাঁর আজীবন কীর্তি, জীবনের শেষ রচনায় তারই প্রাথমিক শিক্ষার আশ্চর্য মৌলিক পাঠ্যবই। দৃক্-এর সহযোগিতায় সুচিত্রিত প্রকাশ।
রচনাসংগ্রহ ১/২/৩। সুখলতা রাও। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ। সচিত্র। ২০০/১৫০/২৫০ টাকা।
ছোটোদের সচিত্র কৃত্তিবাস। কল্যাণী দত্ত সংকলিত। জয়নুল আবেদিন চিত্রিত। ৭৫ টাকা।
ডাকাতে কাহিনী। মহাশ্বেতা দেবী। চিত্রিত। ৫০ টাকা।
রাজা। মহাশ্বেতা দেবী। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ৭৫ টাকা।
আঠারো-উনিশ শতকের বাংলায় জনদরদি ডাকাতদের গল্পে অন্য এক ইতিহাসের চালচিত্র—যা কেবল মহাশ্বেতা দেবীই আঁকতে পারেন।
ভালো রাক্ষসের বই। জয়া মিত্র। ৭০ টাকা।
রূপুলি বেতের ঝাঁপি। জয়া মিত্র। ৭৫ টাকা।
প্রচলিত রূপকথার আদলে তরতাজা নতুন রূপকথায় রূপকথার আমেজেই আজকের দিনের কথাও—এর মধ্যে একাধিক গল্প নাট্যায়িত ও অভিনীত, তার মধ্যে দুটি পরিচালনা করেছেন কৌশিক সেন ও রানী কর্ণা।
খোকাঘেউ আর খুকুম্যাও। নন্দিতা বসু। অমৃতা সেন চিত্রিত। ৭০ টাকা।
কলকাতা শহরের পাড়া থেকে পাড়ায় ঘোরাঘুরি, অ্যাডভেনচার-এ, হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের টানাপোড়েনে তৈরি এক বিচিত্র বন্ধুত্বের কাহিনি।

Illustrated Indian Children's Classics in Translation

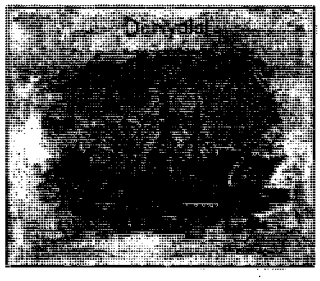

Dariyalal. GUNVANTRAI ACHARYA. *Translated by* KAMAL SANYAL. Rs 100.
A tale of slaves, pirates and mariners, set in a Gujarati settlement in Zanzibar in the late eighteenth and nineteenth centuries, revealing a little known piece of history.

Lal Kalo [The Red and the Black]. GIRINDRASEKHAR BOSE. *Translated by* MADHUCHHANDA KARLEKAR and SUNANDINI BANERJEE. Rs 40.

Majantali & Co. UPENDRAKISOR RAYCHAUDHURI. *Translated by* MADHUCHHANDA KARLEKAR. Rs 30.

Father Gabriel's Crypt. SHIRSHENDU MUKHOPADHYAY. *Translated by* ANANYA BANERJEE. Rs 40.

Writing by Children

Dia's Scrapbook. DEEPIKA DUTTA. Rs 75.

Launching a new series of readers with step-by-step workbooks, with colourful illustrations (for 5-8 years olds)

Earth Water Sky 1
MINAKSHI BASU. Rs 100.

থীমা | ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬, দূরভাষ: ৬৫৪৫-৭১৬০/২৪৬৬-৭৭৯৪
e-mail: themabooks@yahoo.com / www.themabooks.com

ক্যাপ্টেন মুকুন্দরাম

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

মুকুন্দরাম ছিল দাদার ক্রিকেট টিমের মেজাজী ক্যাপ্টেন। ওর তাড়নায় খেলার মাঠে গল্পগুজব করবার উপায় ছিল না। ও বলত, ম্যাচের দিনের মাঠে নেবে খেলার সময় বল ফস্কে যাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে অন্যমনস্কতা। নেট প্র্যাকটিস ব্যাট করবার সময়ও এধার ওধার তাকালে তার কাছে প্লেয়ারদের ধমক খেতে হত। সে ম্যাচের দিনে বেজায় গম্ভীর হয়ে যেত। ভাবখানা যেন মরণ বাঁচন যুদ্ধের সেনাপতি। যতক্ষণ না খেলায় জিত হচ্ছে কেউ তার মুখে হাসি দেখত না। আর হার হলে সে সারা সপ্তাহ মন মরা হয়ে থাকত।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। বয়সের অনুপাতে দেখতে বড় ছিলাম বলে দাদাদের ক্লাবে তরুণ সভ্যদের মধ্যে ভিড়ে যেতাম। প্র্যাকটিসের সময় দূরে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং বা বড় জোর বল করতে পেতাম, ব্যাট করার সৌভাগ্য হয়নি কোনও দিন। ম্যাচ খেলার চান্স পাওয়া ছিল স্বপ্নমাত্র।

একবার একটা বড় ম্যাচ। খেলার দিন মাঠে গিয়ে দেখি মুকুন্দরাম পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। শুনলাম শেষ মুহূর্তে খবর এসেছে যে দুজন বড় খেলোয়াড় আগের রাত্রে বিয়ের ভোজ খেয়ে অসুস্থ। আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমার সাদা সার্ট প্যান্ট পরা ছিল বলে ক্যাপ্টেনের সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম যদি ফিল্ডিং-এ বদলি হিসেবে সুনজরে পড়ি।

টসে জিতে মুকুন্দরামের মনে একটু ভরসা এল। সে বিপক্ষ দলকে ব্যাট করতে পাঠাবে মনস্থ করে আমাকে জুতো বদল করে আসতে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'ফাজল্ মহম্মদ আসা পর্যন্ত সাবস্টিট্যুট খাট।'

আমি তো সেইটুকু সৌভাগ্যেই কৃতার্থ। বুঝলাম প্র্যাকটিসের সময় বেগার খাটা বৃথা হয়নি।

বিপক্ষদল দুই উইকেটে হারিয়ে নব্বুই রান তুলে ফেলল। মুকুন্দরামের মেজাজ তিরিক্ষি। পরপর দুটো বাই বাউন্ড্রি হয়ে যেতে উইকেট রক্ষক জোর ধমক খেল। মাটিং-এর নিচে এক জায়গায় কিছু একটা ছিল যে জন্যে এক একটা বল গড়াচ্ছিল বা লাফাচ্ছিল। একটা ফাস্ট বল হঠাৎ লাফাতেই উইকেট কিপারের ভুরু কেটে রক্তারক্তি। তার বদলে আর কেউ উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে রাজি হচ্ছে না দেখে আমি ভরসা করে ক্যাপ্টেনকে জানালাম যে স্কুলের টিমে আমি নিয়মিত উইকেট কিপিং করে থাকি। মুকুন্দরাম নিজের খেলোয়াড়দের ওপর চটে থাকবে। বলে ফেলল, 'সাবা, দেখো হুশিয়ার সে—'। যা আশা করেছিলাম তাই হল। ও ভুলে গিয়েই থাকবে যে এবার আমাকে বাধ্য হয়ে ব্যাটিং করতে দিতে হবে। উইকেট কিপারের সাবস্টিট্যুট হয় না। প্যাড-গ্লাভ্‌স্ পরিয়ে দিল পাঁচ জন। মন্দ বল আটকালাম না। একটা ক্যাচও ধরলাম।

ওরা ঘণ্টা তিনেক খেলে নয় উইকেটে ২১৫ রান তুলল। তারপর লাঞ্চ। দুজন বদলির একজন ত ভাগ্যগুণে কায়েমী হয়ে গেল। বিরতির পর মুকুন্দ-এর খামখেয়ালে দশজন ফিল্ডিং করতে লাগলাম।

আমাদের দলে মুকুন্দ আর আবদুল মজিদ ছিল সেনচুরি ব্যাটসম্যান। তাছাড়া আরও তিন-চার জন মোটামুটি ভাল ব্যাট করে। যে দুজন আসতে পারেনি তাদের একজন ভাল মারিয়ে খেলোয়াড়। অন্যজন বোলার। একদিনের খেলাতে সে এখন না এলেও চলে।

যাই হোক লাঞ্চের পর ওরা ২১৭ রানে আউট হয়ে গেল। এমন কিছু বেশি রান নয়। কিন্তু মুকুন্দরাম আর ক্লাবের অন্য চাঁইরা দুশ্চিন্তায় পড়ল কারণ ব্যাট চালানেওয়ালা ত ঐ নয় জন। আমি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ি না। আর অসুস্থ ভাল ব্যাটসম্যানের কোন খবর নেই।

এরা কেউ জানে না আমি মোম্বাসায় থাকতে স্কুলের টিমের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান তুলতাম। বাবা নাইরোবিতে বদলি হয়ে আসা পর্যন্ত আমি খেলা দেখাবার সুযোগ পাইনি।

সেদিন ঘণ্টাখানেক খেলার পর সকলের মুখ চুণ হয়ে গেল। মুকুন্দরাম ও মজিদ দুজনেই আউট। বোর্ডে রান সংখ্যা চার উইকেটে মাত্র সত্তর। মুকুন্দ দশ নম্বরে আমার নাম লিখে তার সাইকেলটায় চড়ে ফজল্ মহম্মদকে তুলে আনতে গেল। নব্বুই রানে সাত উইকেট। আমি প্যাড পরলাম। তখনও মুকুন্দরামের দেখা নাই। গুজব শুনলাম ক্লাবের সেক্রেটারি মুলজিভাইর কাছে খবর এসেছে যে সে নাকি মোহন সিং নামে একজন শিখ মিলিটারি ঘোড়ার ডাক্তারকে পাঠাচ্ছে। ভাল ব্যাট করে। সে আমার আগে ব্যাট করতে নামবে। ততক্ষণে যে কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়। আট উইকেটে হল একশ দশ। আমি মাঠে নামবার সময় দেখি উল্কা বেগে একটা সাইকেল আসছে। আরোহীর পরণে সাদা প্যান্ট, মাথায় পাগড়ি। পা চালিয়ে ক্রিসে গিয়ে তাড়াতাড়ি গার্ড নিলাম।

ওভারের বাকি বলের দুটোকে ঠেকিয়ে তৃতীয়টিকে লেককাট করে বাউন্ড্রির বাইরে পাঠিয়ে দিলাম এবং শেষ বলটাকে লাফাতে দেখে হুক করে চার রান। আমার এই হঠকারিতায় ভিন্ন দিকের ব্যাটসম্যানের চক্ষুতো ছানাবড়া। বোধকরি তারই জোরে সে পরের ওভারের প্রথম বলটাই উঁচু ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিল। আমি দিক বদল করে নিলাম।

দেখি একজন দাড়িওয়ালা অচেনা শিখ ব্যাট হাতে একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে ক্রিজে আসছে কিন্তু কোন রানার নেয়নি। আর একটা মাত্র উইকেট বাকি। ফিল্ডাররা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। ফাস্ট বোলারকে সরিয়ে ওদের সেরা স্পিন-বোলারকে আনা হল। আমি এগিয়ে সোজা ড্রাইভ করে প্রথম বলটাকে বাউন্ড্রির বাইরে পাঠিয়ে দিতে হর্ষধ্বনি উঠল। কিন্তু নবাগত শিখ খেলোয়াড় সে মার তারিফ না করে এগিয়ে এসে বললে, 'স্টেডি'। হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এল। মদ খেয়ে এসেছে নাকি? তাছাড়া চোখেমুখে যেন কর্তৃত্বের ভাব।

ওকে আগ্রহ করে লেগ গ্লান্স আর লেটকাট মেরে আরও ছয় রান করে স্কয়্যার বাউন্ড্রির দিকে একটু উঁচু ক্যাচ তুলে দিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে ফিল্ডার ছিল না। অনায়াসে তিনটে রান হয়ে যেত কিন্তু সর্দারজী দুটোর বেশি নিল না। বুঝলাম যে পরের ওভারটা সে নিজে খেলার মতলবে আছে। ওদের ফিল্ডাররা নতুন লোককে নার্ভাস করে দেবার মতলবে কাছাকাছি ঘিরে দাঁড়াল। খোঁড়া লোকের ফুট-ওয়ার্ক দেখে আমি ত অবাক। লাফ দিয়ে এসে প্রথম

বলটাকে ব্রেকের মুখে উড়িয়ে ফেলল প্যাভিলিয়নের মাথায়। পরের মার কভার ড্রাইভ বুলেটের গতিতে। তখনও হার অবশ্যম্ভাবী কিন্তু প্যাভিলিয়ন যেন উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল। ভাবলাম তাড়ুহিটার —দু চার বার লম্ফঝম্পের পর তে-কাঠি ছত্রাকারে ফাঁক হয়ে যাবে। এদিকে চড়চড় করে রান উঠছে দেখে বিপক্ষ দলের ক্যাপ্টেন মরিয়া হয়ে নিজের হাতে বল তুলে নিল। সে ওভারে সর্দারজী আরও গোটাদুই বাউন্ড্রি মেরে শেষের বলটাকে ফাইন লেগে ঘুরিয়ে দিয়ে একটা রান নেবার মতলবে ছিল, কিন্তু আমি গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে তার পায়ে ব্যথা। সে যেন দাঁত খিঁচিয়ে কি বললে। আমি কোন গ্রাহ্য না করে নিজের মত খেলে গেলাম। সে ওভারে দশ রান বাড়ল। তারপর সর্দারজীর পালা। আমি তার খেলার কায়দা দেখে মুগ্ধ। পায়ের আঘাত ভুলে সে নেচে নেচে প্রতিটি বলকে ফিল্ডারদের ব্যূহ ভেদ করে বাউন্ড্রি পার করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। পাঁচ বলে বার রান করে শট রান নিয়ে আমার দিকে আসতে চাইল। কিন্তু আমি নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু নাথিং। বললাম, 'নো রিস্ক'। ও আমার মুণ্ড পাত করল বলে মনে হল। রান ক্রমে বাড়তে বাড়তে একশো আশির কোঠায় উঠে যেতে আমাদের ক্লাবের কর্তাব্যক্তিদের বোধ করি নার্ভাস ব্রেক ডাউন হবার উপক্রম হয়েছিল কারণ দূর থেকে দেখতে পেলাম ছেলে ছোকরাদের লাফালাফি চেঁচামেচি করতে বারণ করা হচ্ছে।

বিপক্ষদল রান বাঁচাবার চেষ্টায় ফিল্ডার দূরে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার মারে তেমন জোর নেই দেখে একজন বোলার লোপ্পা লোপ্পা ব্রেক ফেলতে শুরু করল। প্রথম দুটো ছেড়ে দিয়ে তৃতীয়টাকে শট পিচ দেখে ঘুরিয়ে দিলাম স্কয়্যার লেগে। ব্যাটের ঠিক জায়গায় লাগেনি। দেখি বল আকাশে উড়ছে আর সর্দারজী একেবারে আমার নাকের ডগায় এসে গর্জন ছাড়ছে, 'রান রান—বুড়বাক্, হি মে মিস ইট।' সে আমাকে এক রকম টেনে তার নিজের উইকেটে পাঠিয়ে দিল। তারপরই তুমুল হর্ষধ্বনির বলটা ফিল্ডারের আঙুল বাঁচিয়ে বাউন্ড্রির ওপারে গিয়ে পড়ল। বড় মাঠে সেই আমার প্রথম ছক্কা। ক্রস করে ফিরে আসবার সময় সর্দারজী আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ফিস ফিস করে বললে, 'নো মোর হিটিং—ওয়ান বাই ওয়ান।'

বললাম, 'তোমার পা—'

ও বললে, 'ভুল্ যাও—' এরপর দুই দুই করে চার রান করলাম। প্যাভিলিয়ন তখন নিস্তব্ধ। উত্তেজনায় আশঙ্কায় আমারও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। মাত্র ছ'টা রান বাকি। ফিল্ডাররা আবার কাছে এগিয়ে এল। আমি তড়পে লাফ দিয়ে লেগে ঘোরাতে গিয়ে মিস করে ক্রীস্ থেকে বেরিয়ে যেতে দশজনের কণ্ঠে নির্ঘোষ শুনলাম, 'হাউস দ্যাট—' দেখি উইকেট ভাঙ্গা। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইলাম। সর্দারজী দেখি উত্তেজনায় এক খামচা দাড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে আর অবাক হয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। তার পিছনের আম্পায়ার দেখি বাই বাউন্ড্রি সিগন্যাল দিচ্ছে। আরও দেখি সর্দারজী ছেঁড়া দাড়ি ধরা মুঠোটা পকেটে পুরল। আর ভুল করিনি। শ্রেষ্ঠ মার হল কভার ড্রাইভ।

এলোমেলো নানা কথার মধ্যে মনে পড়ে সর্দারজী আনন্দের চোটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার মুখে মদের গন্ধ ছাড়া লক্ষ্য করেছিলাম বুকময় ছেঁড়া দাড়ি।

জয়ের উল্লাস ও হুল্লোড়ের মধ্যে কখন মোহন সিং সরে পড়ল এবং মুকুন্দরাম হাজির হল কেউ খেয়াল করেনি। মুকুন্দরামকে বলতে শুনলাম যে সে ফজলের জন্য ডাক্তার ডাকতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছিল তারপর হেঁটে আসে। সাইকেলটাকে নাকি মোহন সিং-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

আমি কিন্তু ড্রেসিংরুমে জুতো বদলাবার সময় দেখতে পাই মুকুন্দরামের কিট্ব্যাগ থেকে একটা হাল্কা নীল রঙের পাগড়ি উঁকি মারছে। ব্যাগ ফাঁক করে দেখি ভিতরে একরাশ ছেঁড়া চুল, তা থেকে ভুরভুর করে মদের গন্ধ বার হচ্ছে।

সর্দারজীকে আর কখনও দেখিনি। সে নাকি সেই রাতেই সুদূর উত্তরে সোমালি প্রদেশে চলে যায়।

সেই গন্ধটা কিন্তু মদের নয়। পরে জেনেছিলাম মেক-আপ স্পিরিট গামের ঐ রকম উগ্র গন্ধ হয়।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

(শারদীয়া-১৩৮১)

BENGALI LITERATURE IN ENGLISH TRANSLATION FROM SAHITYA AKADEMI

NOVEL

Arogyaniketan Rs. 110
By Tarashankar Bandyopadhyay
Tr. Enakshi Chatterjee

East-West Part I Rs. 400
(Purba-Paschim)
By Sunil Gangopadhyay
Tr. Enakshi Chatterjee

East-West Part II Rs. 275
(Purba-Paschim)
By Sunil Gangopadhyay
Tr. Enakshi Chatterjee

In and Around the Marketplace Rs. 60
(Haate Baazaare)
By Banophul (Balaichand Mukhopadhyay)
Tr. Shuma Raha

Mythical Man Rs. 100
(Aleek Manush — Award-winning)
By Syed Mustafa Siraj
Tr. Sudeshna Chakraborty

Perceptions Rs. 75
(Anubhav —Award-winning)
By Dibyendu Palit
Tr. Sohini Sen

Herbert (Award-winning) Rs. 60
By Nabarun Bhattacharya
Tr. Jyoti Panjwani

Poetry of the Day and Poetry of the Night
(Dibaratrir Kavya) Rs. 60
By Manik Bandyopadhyay
Tr. Dipendu Chakraborti

Rajnagar Rs. 150
(Award-winning)
By Amiyabhusan Majumdar
Tr. Kalpana Bardhan

The Belated Spring Rs. 75
(Asamay —Award-winning)
By Bimal Kar
Tr. Neeta Sen Samarth

The White Envelope Rs. 60
(Sada Kham —Award-winning)
By Moti Nandy
Tr. Suchandra Chakraborty

Possessions Rs. 130
(Kuberer Bishay Ashay)
By Shyamal Gangopadhyay
Tr. Kurchi Dasgupta

Sahitya Akademi

Head Office
Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road, New Delhi 110 001
Phone : 011-23386626 / 27 / 28, Fax : 091-011-23382428

Eastern Regional Office
4 D. L. Khan Road, Kolkata 700 025
Phone : (033) 2419 1683/1706, Fax : (033) 2419-1684

Books avilable at
Sahitya Akademi, Block 5B Rabindra Sarobar Stadium, Kolkata 700 029, Ph.2419 8109
Dey Book Store, Dey's Publishing, Usha Publishing, Balaka Book Store and Manisha Granthalay

Membership enrollment for Sahitya Akademi Eastern Regional Office Library (Kolkata) is going on. For details, kindly contact (033) 2419-1838.

R.N.I. 12007/ 64 SANDESH February -2014 Rs. 60/-

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন

ছেলে মেয়ের সমান অধিকার বাস্তবে তা হওয়া দরকার

বিয়ের ভাবনা আঠারোর আগে না

বয়ঃসন্ধিতে সঠিক পরামর্শ চাই পেতে হলে 'অন্বেষা ক্লিনিকে' যাই

সবুজ শাকসব্জী খাও সুস্থ জীবন খুঁজে নাও

প্রতি সপ্তাহে আই.এফ.এ খাও রক্তাল্পতাকে দুরে পাঠাও

ছয় মাসে একটি কৃমির বড়ি খাও কৃমি সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাও

হাত ধুয়ে খাই জীবাণুর অনুপ্রবেশ নাই

সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, সুস্থ পরিবেশ
এই তিনের সমন্বয়ে সুস্বাস্থ্য হয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Printed by : SBP Press Ltd., Kol.-15